রবিবাসর

প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ—১৩

—ঃ সম্পাদনা ঃ—

ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম. এ., ডি. লিট্
এম. বি., ডি. টি. এম্
সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর

সহকারী

শ্রীসন্তোষকুমার দে
সম্পাদক : রবিবাসর

নিবেদন

ঈশ্বরের অপার করুণায় রবিবাসর ৫১ বর্ষ পূর্ণ হয়ে ১৩৮৮ সালে ৫২ বর্ষে পদার্পণ করছে। যাঁদের প্রেরণায় চেষ্টায় ও যত্নে এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটি অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরে চলছে সেই সব পূর্বসূরী, বিশেষ করে অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রমুখ সকল সদস্য এবং প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষগণ রায় জলধর সেন বাহাদুর, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি নরেন্দ্র দেবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আর আমাদের বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর ৮৮ বৎসর বয়সেও প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে সুনিপুণ ভাবে সভার কার্যাবলী পরিচালনা করায় আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ। বস্তুত তাঁর কার্যকালেই রবিবাসরের অধিবেশন সর্বাধিক সংখ্যক, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে ২৮টি পর্যন্ত, করা সম্ভব হয়েছে।

রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বিগত ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮০ দেওঘরে পরলোক গমন করেছেন। সুদীর্ঘকাল তিনি কলকাতার বাইরে থাকলেও আমরা তাঁর কথা স্মরণ করে আনন্দ বাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা'-র লেখাতে তাঁর বিষয় উল্লেখ করতে বলেছিলাম। ফলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং আমরা রবিবাসরে তাঁর স্মরণসভা যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করি। এবারের সঙ্কলন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে যাওয়ায় এতে তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া গেল না। স্থির হয়েছে, পরবর্তী খণ্ডে নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীসহ রবিবাসরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশ করা হবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পঠিত প্রবন্ধাদি দ্বাদশখণ্ডেও সব স্থান সংকুলান না হওয়ায় বর্তমান খণ্ডটিতে বর্ধিত কলেবরে তা দেওয়া হল। রবিবাসরের তিন দিকপাল সদস্যের জন্মশত বার্ষিকীতে পঠিত প্রবন্ধাদিও এই খণ্ডে সংকলিত হল।

রবিবাসরের দুইজন সদস্য অল্পদিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করায় আমরা বিমূঢ় ও মর্মাহত। রবিবাসরের কোষাধ্যক্ষ স্বর্গত কবি কৃষ্ণ মিত্র সম্পর্কে বর্তমান সংখ্যাতেই কয়েকটি রচনা দেওয়া হল।

স্বর্গত কবি ও প্রাবন্ধিক সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়ে রচনা সময়াভাবে এবং স্থানাভাবে বর্তমান খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হল না, পরের খণ্ডে থাকবে। এই উভয় সদস্যের জন্যই পৃথক পৃথক স্মরণ সভায় আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

রবিবাসরের আর এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের সর্বাধ্যক্ষ মহোদয়ের একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী মালতী সেনগুপ্তার অকাল মৃত্যুতে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী বীর দীনেশ গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী, নিজেও ছিলেন তেজস্বিনী এবং অনুন্নত শ্রেণীর সেবায় উৎসর্গপ্রাণা। তিনি বস্তিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদ, মধ্যমান বিদ্যালয়, কিশোর গ্রন্থাগার ও 'বর্ণমালা বিদ্যালয়' এবং তাদের সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় শিক্ষার জন্য 'কড়ি ও কোমল' সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের মানসিক আনন্দ বিধানেরও ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র অসহায় সমাজের মধ্যে সূতা উল প্রভৃতি বিতরণ করে তাদের দিয়ে নানা শিল্প বস্তু তৈরী করিয়ে সেগুলি বিক্রয়ের জন্য কয়েকবার প্রদর্শনীব ব্যবস্থা করে তাদের আর্থিক সহায়তারও সুযোগ করে দেন। ঐ প্রদর্শনীতে বস্তীবাসী ছেলেমেয়েদের দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের নানা নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেও সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., বি, এড এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতশাস্ত্রে স্নাতক ছিলেন।

রবিবাসরের সদস্য না হয়েও নেপথ্যে থেকে কি ভাবে তিনি রবিবাসরের সদস্যবর্গকে সেবা করে গেছেন সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের গৃহে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভায় তার পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি। সমাজসেবী শিক্ষাব্রতী ও সঙ্গীত শিল্পী এই কল্যাণীয়া গৃহবধূর অকাল তিরোধানে স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত শোক প্রকাশ করেছে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

বহু মনীষীর স্নেহে পুষ্ট রবিবাসর চিরদিন বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকুক এই প্রার্থনা করি।

সন্তোষকুমার দে
সম্পাদক : রবিবাসর

৩০শে চৈত্র ১৩৮৭

সূচীপত্র

কবিতা

IN MEMORY OF POET K. MITRA

PRAYER, THAT WAS NOT ANSWERED ? OR WAS IT ???

I lived, your agony,
In my thoughts.
It became clear, each day.
You were suffering silently.
My soul shed silent tears,
I busied myself in work, but
The empty feeling will not leave me.
"Pray", said an inner voice.
And each day, I prayed.
God please,
Let him get over this.
Let him not suffer thus.
A glimmer of hope showed, when I left you.
And yet the empty feeling did not leave me.
I prayed anyway.
And, when the telephone rang ....
Some thing inside me broke ....
As I heard about your journey ....
A thought remained ... . Now,
As tears shimmer, drop, and roll.
I think, was my prayer answered ???
YOU,
Yes, YOU, made him join YOU.
But why ??? OH W H Y ??????

—Raja
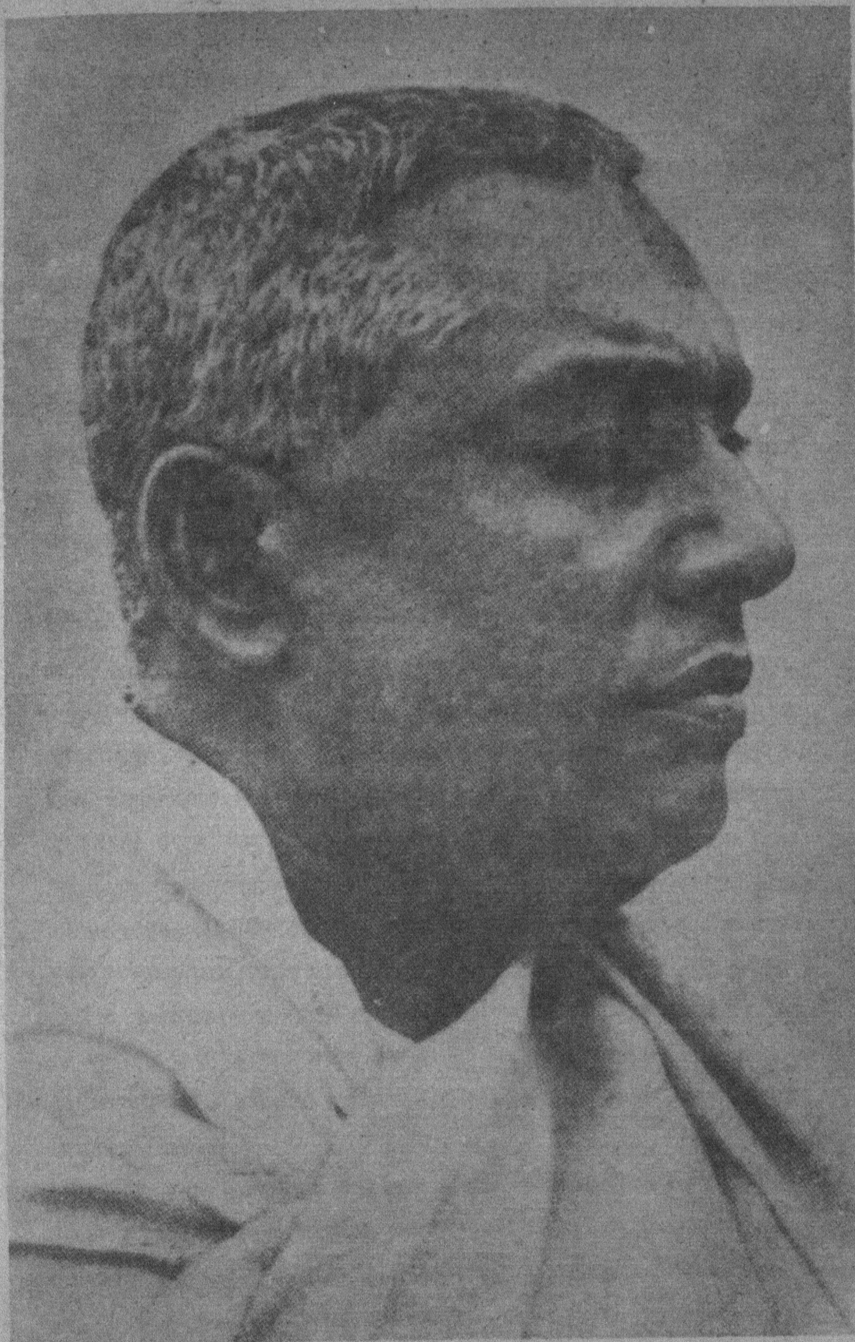
রবিবাসরের সদস্য
স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার

রবিবাসরে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে

পুলিনবিহারী সেন সম্বর্ধিত

১৩৮৭ সালের রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে রবিবাসর কেশবচন্দ্র গুপ্ত স্মারক অর্ঘ্য দিয়ে এবার শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে সম্বর্ধিত করা হয়। সভাটি বসেছিল সদস্যা শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীর গৃহে—যিনি ঐ শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে প্রতি বৎসর তাঁর পরলোকগত শ্বশুর মহাশয় রবিবাসরের প্রাক্তন সদস্য কেশবচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতি তর্পণ করে থাকেন। এবারের সভায় সদস্যগণ ব্যতীত বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বিশীর ভাষণটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ-সমৃদ্ধ ছিল। রবিবাসর যে সুদীর্ঘ ৫১ বৎসর কাল ধরে চলছে এই প্রতিষ্ঠানটির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লিখবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সম্পাদক সন্তোষকুমার দে 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ', 'রবিবাসরের আসরে' প্রভৃতি যা যা লিখেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে বিগত অর্ধ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস সংকলনের জন্যও অনুরোধ করেন। তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে সকলের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো—যাতে তাঁরা রবীন্দ্রতথ্যানুসন্ধানী প্রবীণ গবেষক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে উপযুক্ত সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করে স্বীকৃতি জানান।

এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন হতে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন শুভ কামনা জানিয়ে যে পত্র লেখেন তা এই সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বিশ্বভারতীর নব নির্বাচিত উপাচার্য ডঃ অম্লান দত্তও রবিবাসব সম্পাদককে একখানি পত্রে অনুষ্ঠা.নর সাফল্য কামনা করেন।

এই অনুষ্ঠানে রবিবাসরের পক্ষ হতে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে যে মানপত্র দেওয়া হয় তার লিখিতাংশ মুদ্রিত হল। পুলিনবিহারীর প্রত্যুত্তরও ছাপা হল। সব শেষে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ১৭ই মে ১৯৮০ তারিখে যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেটুকু উদ্ধার করে দিলাম—যা থেকে সমগ্র অনুষ্ঠানটির বিষয় মোটামুটি ভাবে জানা যাবে।

—সন্তোষকুমার দে

শুভ কামনা
প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলার ইতিহাসের একটা বিশেষ গৌরব এই যে, বাঙালি জাতির স্রষ্টা একজন কবি—কোনো ধর্মনায়ক বা অন্য প্রকার কর্মবীর নয়। এই হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি জাতি একটা অসাধারণ বিশিষ্টতার অধিকারী। রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি কর্মবীরেরা যা সৃষ্টি করে যান তা বিশেষ যুগের সীমা অতিক্রম করতে পারে না, কালান্তরে সে সৃষ্টি ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু কবির সৃষ্টি যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রভাব যে বাঙালির জীবনে গভীরতর ও ব্যাপকতর ভাবে সক্রিয় হয়েছে এবং হচ্ছে তা আজ বাস্তব সত্য, অনুমান-সাপেক্ষ তথ্য মাত্র নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের এই ক্রমবর্ধমান প্রবাহের মূলে আছে একদল নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রানুরাগীর নিত্য সক্রিয়তা। তাঁরাই রবীন্দ্রসাহিত্যকে সত্য রূপে উপস্থাপিত করছেন সমস্ত জাতির কাছে। করছেন নানাভাবে যথাযথ প্রকাশনা ও সম্পাদনা দ্বারা, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপনের দ্বারা এবং নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা। যাঁরা এই মহৎ কার্যে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দুইজন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন। অন্য সকলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলে আছে এই দুই জনের সক্রিয় নিষ্ঠা। পুলিনবিহারী সারা জীবন রবীন্দ্রসাহিত্যকে যথাযথ উপস্থাপন ও জনগ্রাহ্য করে তুলেছেন সনিষ্ঠ সুসম্পাদনার দ্বারা, বহু অপ্রাপ্য ও অজ্ঞাত রচনাকে তিনি দিনের পর দিন হাজির করে চলেছেন উৎসুক পাঠক সমাজের কাছে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁদের ঔৎসুক্যকে দিনের পর দিন জাগিয়ে ও বাড়িয়েই চলেছেন আজ পর্যন্ত। তা ছাড়া একটা গ্রন্থ প্রকাশনার দ্বারা তিনি পাঠকের মনে এখনও চমক লাগাতে পারছেন। সেটাও কম কথা নয়। প্রভাতকুমার বহু ব্যাপ্ত রবীন্দ্র সাহিত্যকে যে কালের বিস্তৃত পটের উপরে যথাযথ ভাবে সাজিয়ে তার তাৎপর্যকে সকলের মনেই স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন

তার মূলেও অনেকাংশেই রয়েছে পুলিনবিহারীর সুষ্ঠু প্রকাশনা ও সম্পাদনা। অন্য সব ব্যাখ্যাতা বা বিশ্লেষককেই নির্ভর করতে হয় এই দুই জনের কাজের উপরে।

পুলিনবিহারী এতদিন ছিলেন নেপথ্যবিহারী। নেপথ্য থেকে কাজ করতেই তিনি ভালবাসেন। কিন্তু তার প্রতি আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটা কর্তব্য আছে। তাঁকে যদি আমরা যথাযাথ ভাবে স্বীকৃতি না দিই তাহলে আমরা যে শুধু অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হব তা নয়, আমাদের রবীন্দ্রানুরাগও অনেকাংশে মূল্যহীন হয়ে যাবে। কলকাতার 'রবিবাসর' যে অগ্রণী হয়ে তাঁর কর্ম সাধনার স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন তাতে ওই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গৌরবময় ঐতিহ্য সুরক্ষিত হবে। তাতে আমি আন্তরিক আনন্দিত। কিন্তু উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকতে না পারলেও আমার মানসিক উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে। আর আশা করি উপস্থিত সদস্য, বক্তা ও শ্রোতারা সকলেই আমার মানসিক উপস্থিতি মেনে নিয়ে আমাকে সবার সমান আনন্দ-গৌরবে গৌরবান্বিত করবেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন

৬. ৫. ১৯৮০.

রবিবাসরের মানপত্র

[রবীন্দ্র জন্মোৎসব ১৩৮৭]

মনস্বী গবেষক

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন করকমলেষু

রবীন্দ্র-তথ্যবিদ্ হে জ্ঞানতাপস,

জীবনপ্রভাতে রবীন্দ্রচর্চার যে বীজ আপনি বপন করেছিলেন, সুদীর্ঘ কালের অবিশ্রাম অনুসন্ধান, অবিচল নিষ্ঠা ও সুগভীর গবেষণায় আজ তা এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বস্তুত একক সাধনায় আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা-বারিধির পথিকৃৎ কলম্বাস, রবীন্দ্রতথ্যের চলমান বিশ্বকোষ, আপনার সুগভীর গবেষণায় রবীন্দ্ররচনা বিষয়ে বহু নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বহু নূতন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। আপনাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্রনাথ যে রবিবাসরের অধিনায়ক ছিলেন সেই গৌরবময় সাহিত্য সভার ৫১-তম বর্ষের রবীন্দ্রজন্মোৎসবের পুণ্য লগ্নে রবিবাসরের স্বর্গত সদস্য কেশবচন্দ্র গুপ্তের স্মারক অর্ঘ্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি।

হে প্রবীণ রবীন্দ্র-সাধক, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ঈশ্বরের নিকট আপনার শান্তিপূর্ণ সুস্থ ও কর্মময় শতায়ু প্রার্থনা করি।

সন্তোষকুমার দে — সম্পাদক

শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত — সর্বাধ্যক্ষ

তাং কলিকাতা ২৮ বৈশাখ ১৩৮৭

প্রত্যভিভাষণ

শ্রী পুলিনবিহারী সেন

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদা যে প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক ছিলেন, সেই রবিবাসর আজ আমাকে যে-মর্যাদা দিলেন তাতে আমি বিশেষ ভাবে সম্মানিত বোধ করছি ও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ যে বলতেন বাংলা পলিমাটির দেশ, এখানে কোনো উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠান সুচিরস্থায়ী হয় না, সেই বাংলা দেশে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সাহিত্য সেবা করে আসছে। সে বিবেচনাতেও এই সম্মানের মহার্ঘতা।

আমি বিশেষ ভাবে অভিভূত হয়েছি যে, আজ আপনারা আমাকে-যে অর্ঘ্য দান করলেন ইতিপূর্বে তার প্রাপক আচার্য শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। এই তথ্যে আমার কাছে এই অর্ঘ্যের একটি বিশেষ মূল্য। জীবনের প্রথম বয়স থেকে এঁদের গুরু স্থানীয় বলে জেনে এসেছি। এঁদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য বলে নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না; বিদ্যার ক্ষেত্রে আমার নাম যে তাঁদের সঙ্গে উচ্চারিতও হতে পারে না, তাও বিশেষ ভাবেই জানি। এঁদের যে-পুরস্কার দিয়েছেন সেই পুরস্কার আমাকেও দিলেন এতে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। প্রভাতকুমার এবং প্রবোধচন্দ্র মহা মনীষার অধিকারী, আর সাহিত্যসংসারে আমার কাজ একান্তই দিন-শ্রমিকের কাজ, সেবার কাজ,—মনীষার দান নয়। সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণই অবহিত। সেই সেবা ও শ্রমেও যে কিছু মর্যাদা ও মূল্য থাকতে পারে আপনারা আমাকে পুরস্কৃত করে সে কথা স্বীকার করলেন। এতে আমি বিশেষ তৃপ্তি ও সার্থকতা বোধ ক'রে আপনাদের সকলকে আমার বিনীত নমস্কার নিবেদন করি।

১১ মে, ১৯৮০, শ্রী পুলিনবিহারী সেন

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

।। রবিবাসরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ।।

পুলিনবিহারী সেন সংবর্দ্ধিত

গত ২৮শে বৈশাখ চিত্রিতা দেবীর বালিগঞ্জের বাসভবনে রবিবাসরের ৫১-তম বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। কবিগুরুর নিজ কণ্ঠের গান "তবু মনে রেখো" বাজিয়ে সভা সুরু হয় এবং 'হে নূতন দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' গানটি শোনান মধুশ্রী দত্ত ও আরতি দত্ত। মৈনাক চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সম্পাদক সন্তোষকুমার দে রবিবাসরে যে যে সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন তার বিবরণ দেন এবং শরৎ চন্দ্রের গহে প্রদত্ত কবির ভাষণের কিছুটা পাঠ করেন। কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বেলা দেবী, নবনীতা দেব সেন, মনোমোহন ঘোষ, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, কৃষ্ণ মিত্র, অনিল ভট্টাচার্য ও প্রভাতকুমার হালদার। কবিতা সিংহ তাঁর রবীন্দ্র চর্চার স্মৃতিচারণ করেন। ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। কুমারেশ ঘোষ কিছু রবীন্দ্র সুভাষিত শোনান।

সর্বাধ্যক্ষ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবার বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক পুলিনবিহারী সেনকে রবিবাসরের পক্ষ হতে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁকে মাল্যভূষিত করবার পর একখানি মানপত্র এবং 'রবিবাসর' গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ উপহার দেন। রবিবাসরের স্বর্গত সদস্য কেশবচন্দ্র গুপ্তের স্মারক অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর পুত্র জয়দেব গুপ্তের পক্ষে কবি চিত্রিতা দেবী পুলিনবিহারী সেনকে সংবর্ধনা জানান। সম্পাদক সন্তোষকুমার দে এই উপলক্ষে প্রাপ্ত আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন এবং বিশ্বভারতীর নব নিযুক্ত উপাচার্য ডঃ অম্লান দত্তের দুখানি পত্র পাঠ করেন। উভয়েই পুলিনবিহারীর গবেষণার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

ভাষণ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশি বলেন, আজীবন বিশ্বভারতীর সেবা ও রবীন্দ্র গবেষণার জন্য পুলিনবিহারী সেনকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সাম্মানিক

উপাধিতে ভূষিত করা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রও পুলিন বিহারীর গবেষণার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ভাষণ দেন।

প্রত্যুত্তরে পুলিনবিহারী বলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে রবিবাসরের অধিনায়ক ছিলেন, সেখান হতে যে সম্মানার্ঘ্য ইতিপূর্বে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন এবং আচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়েছে, সেই কেশবচন্দ্র গুপ্ত স্মারক সম্মানার্ঘ্য পাওয়ায় তিনি অভিভূত।

সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরতি দত্ত। সভায় বহু বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

(17.5.1980)

হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

—অধ্যাপক শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু এম. এ. (অক্রুব)

৭ই আষাঢ়, ১৩২৯ তারিখে (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫৮ বছর আগে) রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখেছিলেন ঃ

"ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেছি—

'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে' এমন সময় সমুদ্র পার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানব-সংসারে আমার কাজ আছে—শুধু মেঘ মল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিলে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে, তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।"

এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানব-ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম বলে মনে করতেন।

গজদন্ত মিনার-বিলাসীদের মতো রবীন্দ্রনাথ এই অপ্রিয় প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাননি, এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

উক্ত চিঠিতে তিনি আরো লিখেছিলেনঃ "পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে, অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন, তাদের মন মধ্য যুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এই জন্যে অপর ধর্মাবলম্বীদের তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে মুসলমান-ধর্মাবলম্বীরা আধুনিক যুগের বাহন নয়, তাদের মন মধ্য যুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠিতেই বলেছেনঃ "হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের

স'ঙ্গ তাদের non-violent non-co-operation।......আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি।...

"ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে। ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে ? "

১৩৩০ বঙ্গাব্দে রচিত 'সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"আমাদের আরেকটি প্রধান সমস্যা হিন্দু মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচল ভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানব বিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাবে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়।...

"মানব জগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতি মাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক, হিন্দুর এই ব্যবস্থা, সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে, এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর বলে জানে ; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশী।... বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে—আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না; তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।"

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে।...

"পদ্মায় ঝড়ের সময়ে দেখেছি, কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে পাখা ঝট্‌পট্ করছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে ত ১ ট্ গ ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী

হয়েছে তার চেয়ে বহু দীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে।"

"বাংলা দেশ স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেন না, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহযোগ-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের কথা বলছেন, যার পুরোহিত ছিলেন দুই ভ্রাতা মহম্মদ আলি এবং শৌকৎ আলি। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

ইসলামী জগতের খলিফা ছিলেন তুর্কি সুলতান। তাঁর খলিফাগিরির দাপটে আরবের মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং তুর্কি দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সুযোগ এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, যখন তুর্কী সুলতান ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগ দিলেন। ইংরাজরা তখন স্বাভাবিক কারণেই তুর্কী নাগপাশ থেকে মুক্তিকামী আরবদের পক্ষে এগিয়ে এলেন এবং তাদের সুদক্ষ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পাঠিয়ে দিলেন ধুরন্ধর দুঃসাহসী কর্ণেল টি ই লরেন্সকে যিনি **'Lawrence of Arabia'** নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

আরব দেশে একাধিক বিদ্রোহী নেতার আবির্ভাব ঘটল, খিলাফত সম্পর্কে তাঁদের কিছু মাত্র আগ্রহ ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের দাসত্ব থেকে মুক্তি। এমন কি খলিফার খাস তালুকে অর্থাৎ তুরস্কেই তরুণ তুর্কীরা খলিফা সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। তারপর মুস্তাফা কামাল পাশা খিলাফতকেই বাতিল করে দিয়েছিলেন, এতো ইতিহাসের ব্যাপার।

ইসলামের খাস তালুকে যখন খিলাফতের এই হাল, তখন খিলাফত নিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের অমন মাথা ব্যথা হওয়ার ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ।

তা যাই হোক, আলি ভ্রাতৃদ্বয় ভারতীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগণকে এই বলে ক্ষেপিয়ে তুললেন যে তুর্কী সুলতানের খলিফাগিরি বা খিলাফত বিপন্ন মানেই ইসলাম বিপন্ন, এবং তুর্কী সুলতানের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভঙ্গ করে ইসলামকে বিপন্ন করছে ইংরেজ। মহম্মদ আলির নেতৃত্বে ১৯২০ সালের গোড়ায় ইংল্যাণ্ডে একদল প্রতিনিধি গেলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ তাঁদের সোজাসুজি বলে দিলেন তুর্কী সুলতান তাঁর খাস তুর্কী মুলুক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, তার ওপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু যা ন্যায়তঃ তার এক্তিয়ারের বাইরে, সেই আরব ভূখণ্ডের উপর তাঁকে আর খবরদারি করতে হবে না। অর্থাৎ মুসলিম

জাহানের উপর তাঁর খিলাফতী আধিপত্য আর চলবে না।

ইংল্যাণ্ড থেকে শূন্য হা.ত এবং ক্ষিপ্ত চিত্তে ফিরে এসে খিলাফত আন্দোলনকারী নেতারা গান্ধীজিকে তাদের দলে টানলেন। গান্ধীজি প্রবলভাবে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে হিন্দু জনগণকেও এর সামিল করলেন, এবং খিলাফতের সমর্থনে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর তৎকালীন অন্যতম সহচর শ্রী ইন্দু যাজ্ঞিক মন্তব্য করেছিলেন, "political circles were frankly perplexed and amazed at the increasing military tones and tactics of Gandhiji, who began really to surpass even the most orthodox mahomedan in his fanatical zeal for the cause of Islam."

গান্ধীজি সম্ভবতঃ আশা করেছিলেন যে, যে-আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুদের কোনো রকম সম্পর্ক নেই, শুধু মুসলমান ভ্রাতাদের মুখ চেয়েই সেই আন্দোলনে হিন্দুরা ঝাঁপিয়ে পড়লে মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

গান্ধীজির এই খিলাফতী উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। তিনি তাই লিখেছেন ঃ

"এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি। আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপ্‌টেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।"

খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে যোগদানের ফল— কলকাতা বেতারের ভাষায় 'ফলশ্রুতি'—যা মর্মান্তিক ভাবে ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে তারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন ঃ

"মালাবারে মোপলা-হিন্দুতে যে কুৎসীৎ কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ, তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমাণকে ঘৃণা করেছে, মোপ্‌লা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেস মঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটি-ক্যাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতার কথা বিশেষভাবে বলে গেছেন।

তাঁর 'সমস্যা' প্রবন্ধ থেকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করি ঃ

"হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্ম সমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধম সমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই:মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বি:শেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, তার প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় যে মুসলমামের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কি করে? ...সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। ...ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিস্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিস্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে।... ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"

আমার মনে হয় হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলে গেছেন, সারা ভারতের হিন্দুদের তা বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত প্রফুল্ল কুমার সরকারের কথা মনে পড়ছে, যিনি 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' নামে একটি বই লিখে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুদের সচেতন করবার চেষ্টা করেছিলেন। সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতে হিন্দুদের ক্ষয়িষ্ণুতা কমে নি। মুসলমানের বর্দ্ধিষ্ণুতা বেড়েছে এবং বাড়ছে; বিশেষ করে নিজেদের সংখ্যা যথাসম্ভব দ্রুত বেগে বৃদ্ধি করবার জন্য তারা সচেতন এবং ঐকান্তিক ভাবে সচেষ্ট, তাদের স্থির লক্ষ্য সংখ্যা গুরুত্বের দিকে। আগামী আদম সুমারীতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ

(দু-খানি পত্র ও অভিমত)

রবিবাসরের দ্বাদশ খণ্ড (১৩৮৬) সংকলনে সম্পাদক সন্তোষকুমার দে-র "বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি রবিবাসরে পঠিত হওয়ার পর প্রথমে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৮৪)-তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তখনই তা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবিষয়ে লেখক অনেক চিঠি পান, এখানে তার থেকে দুই খানি পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দেওয়া হল যাতে 'বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে কবিকুল সত্যই একটু সহানুভূতি-সম্পন্ন হন।

শান্তিনিকেতন থেকে বাংলা ছন্দ শাস্ত্রের পথিকৃৎ গবেষক মনীষী আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ৩. ৯. ৭৭ তারিখে লেখেন—

"পরম কল্যাণীয়েষু,

সন্তোষ, ইতিমধ্যে তোমাকে একটি চিঠি লিখেছি, তার পরেই পেলাম শ্রাবণ মাসের 'কথাসাহিত্য'। খুলেই দেখি তোমার প্রবন্ধ—'বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ'। পড়ে বিস্মিত, আনন্দিত, আশ্বস্ত হলাম। বিস্মিত,—কোনো অ-ছান্দসিক (?) যে এমন চমৎকার প্রবন্ধ লিখতে পারেন তা ছিল আমার প্রত্যাশার অতীত। অনেক পেশাদার ছান্দসিকও এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখতে পারেন না। আমি লিখতে পারলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। আনন্দিত,—অপূর্ব তথ্যনিষ্ঠতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা দেখে। যুক্তি যোজনায় তুলনা প্রসঙ্গগুলি (যেমন পপ্ সঙ, হিপি প্রসঙ্গ) চমৎকার। আশ্বস্ত,—আমার ছাত্রদের কাছে আমি ছন্দজ্ঞান ও ছন্দোময়তা প্রত্যাশা করি। কোনো ক্ষেত্রে সে প্রত্যাশা পূরণ হলেই আশ্বস্ত হই।—দুটি ভুল দেখলাম, এক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে ৬৫ বৎসর, হওয়া উচিত ৫৫ বৎসর। হয়তো ছাপার ভুল। আমি তো ১৫ বৎসর বয়সে ছন্দ-প্রবন্ধ লেখা শুরু করিনি। দুই, দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই আছে—'কাজের মাঝারে.........থেকানা কহে।' এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের নয়, বিচিত্রা সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলির। রবীন্দ্রনাথ এটি উদ্ধৃত করেছেন। উপেনবাবু আমাকেই

'বে-কানা' বলেছিলেন তর্কটাকে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য। উপেনবাবু 'বিগত দিন' বই-এ সে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।"

(প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সন্তোষকুমার দে কলেজ জীবনে (১৯৩৩-৩৭) আচার্য প্রবোধচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন, এবং গুরু শিষ্যের সেই নিবিড় যোগাযোগ গত ৪৮ বৎসর অক্ষুন্ন আছে।)

১৪. ৯. ৭৭ তারিখে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ('জরাসন্ধ') সন্তোষকুমারকে ঐ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে লেখেন—

"প্রীতিভাজনেষু—

'কথা সাহিত্যে'র শ্রাবণ সংখ্যায় তোমার ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়লাম। একেবারে হুবহু আমার মনের কথা, তবে আমি এমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারতাম না। তা ছাড়া তুমি যে সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করেছ তার বেশির ভাগ আমার পড়বার সুযোগ হয়নি। পড়লে লাভবান হতাম, দুঃখও পেতাম। কী ফল হল এত আলোচনা ও গবেষণার! পূর্বসূরীদের মূল্য দিচ্ছে এরা—এই গদ্য কবিতার আগাছার জঙ্গলে নিত্য গজিয়ে ওঠা অর্বাচীনের দল ?

রবীন্দ্রনাথ গদ্য ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ছন্দোবধের লাইসেন্স্ দিয়ে যাননি। কবিতা মিলহীন হতে পারে, তাই শুধু দেখিয়েছিলেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে ছন্দ রচনা করে গেছেন। কিন্তু ছন্দ ? ছন্দ ছাড়া পদ্য হয় কেমন করে ? আমরা যারা গদ্য লিখি তাদেরও একটা ছন্দ মেনে চলতে হয়। গদ্য ছন্দে তার অভাব হলে কানে লাগে। পদ্যের বেলায় তো কথাই নেই।

কিন্তু ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ঠিকই বলেছেন—এই সব 'কবিতা' যারা লেখে তারা 'বিকর্ণ'। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে 'কর্তিত কর্ণ' (প্রচলিত শব্দটা আর বললাম না)। তাই লজ্জা সরমের বালাই নেই।

তুমি 'দেশ' 'অমৃত' প্রভৃতি পত্রিকায় গদ্য কবিতার উল্লেখ করেছ। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে থাকবে। ও গুলোকে এক পাতায় একসঙ্গে জড়ো করে রাখা হয়—অর্থাৎ সম্পাদক যেন বলে দিচ্ছেন—Not for all. যার ইচ্ছা হয় পড়তে পারেন। আমি অনেক পাঠককে জানি যারা ঐ পাতাটি উল্টে চলে যায়।

আমার মনে হয় এই শ্রীছাঁদহীন বস্তুটির প্লাবন স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে। মিল ও ছন্দের মধ্যে একটা রীতি ও শৃঙ্খলা বন্ধন আছে, তার প্রয়োজনে কলমের মুখে বল্গা পরাতে হয়। কিন্তু আজকের এই উন্মার্গগামী জীবনধারায় কোথাও যখন বল্গার বালাই নেই, শুধু এক কবিতার বেলায় তার আশা করা যায় না।"

মনস্বী ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রের অভিমত

ছান্দসিক দেবতোষ বসুর 'বাংলা ছন্দের প্রগতি' গ্রন্থের ভূমিকায় "বাংলা ছন্দ চিন্তার প্রগতি" শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন "বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ" নামে সন্তোষকুমার দে-র লেখাসম্পর্কে উল্লেখ করে যা মন্তব্য করেছেন তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

"অল্পকাল পূর্বে চিন্তাশীল লেখক সন্তোষকুমার দে-ও "বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ" নামে প্রবন্ধে (কথা সাহিত্য ১৩৮৪ শ্রাবণ) আধুনিক কবিতার ছন্দোদৈন্য দেখে ক্ষুব্ধ চিত্তে কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন এবং কবি প্রভাত মোহনের মতো তিনিও এ জন্য রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। —"রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে যখন গদ্য কবিতার প্রবর্তন করলেন···তখন সাহিত্যে যেন গদ্য কবিতার প্লাবন দেখা দিল। এত দিনের ছন্দ চর্চা ও বিবিধ ছন্দের সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ সব সেই বানের জলে ভেসে গেল। সত্যই সে এক বানভাসী অবস্থা, তাতে কত যে ঘোলা জল বাংলা কবিতায় প্রবেশ করল তার আর ইয়ত্তা নেই।"—কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি থাকলেও সন্তোষকুমারের এই মন্তব্যকে মোটামুটি ভাবে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে। তিনি শুধু এটুকু বলেই নিরস্ত হননি, মনের আবেগে আরও কঠোর মন্তব্য করেছেন।— "কি কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে গদ্য ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন (বড় দুঃখেই তাকে 'কুক্ষণ' বলতে বাধ্য হচ্ছি), যার ফলে গদ্য ছন্দের মধ্যেও যে ছন্দ আছে সে বোধ অবধি বর্তমান কবিদের অনেকেরই লুপ্ত হয়ে গেছে।" লক্ষ্যণীয়, 'অনেকের' মনেই গদ্য ছন্দবোধেরও অভাব দেখা যায়, সকলের নয়। অনেকের এই ছন্দোবোধহীনতার জন্য কি রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায়? তাঁর গদ্য কবিতা তো ছন্দোহীন ছিল না। ভাবী কালে ছন্দোবোধহীন অকবির আবির্ভাব হতে পারে এই আশঙ্কার ফলে তিনি গদ্য কবিতা না লিখলেই কি ভাল হত? যে পথ যন্ত্রচালিত মোটর গাড়ির চলাচলের জন্য নির্মিত, সে পথে যদি গরুর গাড়ি চলে তার জন্যে কি পথ নির্মাতাকেই অপরাধী বলে গণ্য করতে হবে? বস্তুত সন্তোষকুমারের-ও যে তা অভিপ্রেত নয়, তিনি যে গদ্য

কবিতা মাত্রেরই প্রতি খড়্গহস্ত নন তার প্রমাণ আছে তার প্রবন্ধের শেষাংশে।— "বর্তমানে শ্রেষ্ঠ কবিকুলের অনেকেই যে ছন্দ ও মিলের সূক্ষ্মশিল্পেও তাঁদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করতে পারেন এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।··· তাঁরা গদ্য ছন্দে লিখুন ক্ষতি নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছন্দেরও অনুশীলন করুন। এই আমাদের বিনীত আবেদন।" দেখা যাচ্ছে তিনি গদ্য কবিতামাত্রেরই বিরোধী নন এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের ছন্দকুশলতায় আস্থাহীন নন। তবে বোধহয় ছন্দোহীন অকাব্য-কুকাব্যের অতি প্রাচুর্য তাঁর মনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।"

আচার্য প্রবোধচন্দ্র অন্যত্র আবার বলেছেন—

১৯৪০-উত্তর জাতক কবিদের অনেকেই 'বেকানা', হরপ্রসাদের (ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র) এই মন্তব্য মুখ্যতঃ এই পর্বের 'কবিতা'-লেখকদের পক্ষে প্রযোজ্য। আর, 'আমরা রবীন্দ্রকাব্যের অতুলনীয় ছন্দের ঐশ্বর্যে বুঝি কিছুটা বিরাগ অনুভব করি, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজকেও তাই কিছুটা অনুকম্পার চোখেই দেখি'—সন্তোষ কুমারের এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্য ভাষণটিও বর্তমান কালের চেয়ে উক্ত দ্বিতীয় পর্বের কবিতা-লেখক ও পাঠকদের পক্ষেই বেশী প্রযোজ্য।"

———

কলকাতায় মহাজাতি সদনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ (২ ভাদ্র ১৩৪৬, ১৯. ৮. ৪৯)

(রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও 'অনুশীলন বার্তার সৌজন্যে)

রাশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পত্র

রাশিয়া ১৯২১-২২ সালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়লে শ্রীমতী শোভনা গুপ্তের পত্রোত্তরে সেখানকার বিপন্নজনের সাহায্যার্থে ভারতীয় নারীজাতির প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্র লেখেন। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ রক্ষিত, ইন্দুভূষণ রক্ষিত ও 'অনুশীলন বার্তা'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

THE CLEANSER

(A free rendering from Bengali of Satyendranath Dutta's 'Scavenger'

by **RABINDRANATH TAGORE**

Why do they shun your touch, my friend
and call you unclean
Whom cleanliness follows at every step,
making the earth and air sweet
for dwelling and ever luring us
back from return to the world ?
You help us, like a mother her child,
into freshness, and uphold the truth
that disgust is never for man.
The holy stream of your ministry carries pollutions away
and ever remains pure.
Once Lord Shiva had saved the world from a
deluge of poison by taking it himself,
And you save it every day from filth with the same
divine sufferance.
Come friend, come my hero, give us courage to serve man,
even while bearing the brand of infamy from him.*

---

*From 'Harijan'—Vol I No. 1. Feb. 11, 1933

শরৎ প্রণাম

নজরুল ইসলাম

সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা
শরৎচন্দ্র তিলকে
শূন্য গগন বিষাদ-মগন
সে তিলক মুছে দিল কে।

অবমাননার অতল গহনে
যে মানুষ ছিল লুকায়ে,
শরৎ চাঁদের জ্যোৎস্না তাদের
দিল রাজপথ দেখায়ে
জগতে আজিকে চলে অভিযান
তাদেরই তীব্র আলোকে।

ভীরু গুণ্ঠনতলে যে শরীর
প্রাণশিখা ছিল নিভিয়া
স্তিমিত সে প্রাণ উঠিল জ্বলিয়া
সে চাঁদের জ্যোতি লভিয়া,
সে চাঁদ কোথায়, কোটি আঁখি দীপ
খুঁজিয়া ফিরিছে ত্রিলোকে।।

পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে
আলো তাঁর প্রতি ভবনে,
তেজ প্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে
নিভিবে না তাহা পবনে।
ঝরিবে তাহার রসধারা চির
অমরাবতীর শ্রীলোকে।।

---

*শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানে নজরুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

এপার ওপার

বেলা দেবী

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে পদ্মা নদী
এপারেতে রইলো প্রিয়া ওপারে নজরুল
মধ্যে শুধু কীর্তিনাশা ঢেউ ভাঙে দিন রাত
এই কবরে শিশির ঝরে সেই কবরে ফুল।
এক যুগেরও বেশি সময়—এই দু'জনের মাঝে
বয়ে যাচ্ছে মৃত্যু শীতল বিরহের এক নদী
এ দীর্ঘকাল বসে ছিলো দুই পাড়ে দুই জন
আশা ছিলো—দু'জনকে ফের মৃত্যু মিলায় যদি।
এপার বাংলার মাটির তলায় ওপার বাংলার মেয়ে
ঘুমিয়ে আছে কবিপ্রিয়া শীতল বিছানায়
এপার বাংলার দামাল কবি বিদ্রোহী নজরুল
চিরশয়ন পাতলো ওপার সমাধি শয্যায়।
কি দুঃসহ এ বিরহ—আশা ছিলো মনে
প্রথম শুভরাত্রির সেই ফুল শয্যার মতো
আবার শোবে পাশাপাশি কবি কবিপ্রিয়া
শেষ শয়নে সে আশা আজ সুদূর পরাহত।
কপট দ্যূত ক্রীড়ার চাল আর কূটনীতির লড়াই
ওরা কেহই বোঝে না যে তৃষ্ণা-বিধুর মন
দুইটি হৃদয় মগ্ন হলো অনন্ত বিরহে
প্রিয়া বিনা ফুলশয্যার ব্যর্থ আয়োজন।
দুইয়ের মাঝে বইয়ে দিলো চিরকালের নদী
এপারেতে রইলো প্রিয়া ওপারে নজরুল
মধ্যে শুধু বিশাল নদী ঢেউ ভাঙে দিনরাত।
এই কবরে অশ্রু শিশির সেই কবরে ফুল॥

———————

শরৎচন্দ্র

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

মানুষেরে তুমি ভালোবেসেছিলে—
ছিল যে দরদ বুকে—
তব ভালোবাসা ছিল অমলিন
ছিল মনে, ছিল মুখে।
যাহারা জীবনে পেল না কিছুই
শুধুই ঝরিল আঁখি—
তোমার লেখনী তাদের সবারে
অমর করিল নাকি ?
পশু আর পাখী—মুক মহেশেরে—
নীরবে বেসেছ ভালো —
আপন করার মন্ত্র দিয়েছ
জ্বেলেছ জ্ঞানের আলো।
রবিবাসরের প্রদীপে আজিকে—
চির ভাস্বর হও—
মানব মনের কাহিনী লেখক—
মোদের প্রণাম লও ॥

যে তৃণ আসন পেতে

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

যে তৃণ আসন পেতে শিশিরের মধুপর্ক রেখেছিল
সে তো নেই আগেকার মতো
যে সন্ধ্যা আকাশ থেকে তারার প্রথম তোড়া দিয়েছিল
সে তো নেই আগেকার মতো
যে নদী ধ্বনির গীত তুলে হয়েছিল বৃক্ষের চূড়ায়
সে তো নেই আগেকার মতো
যে চাঁদ ছড়িয়েছিল মুঠো মুঠো মল্লিকা জ্যোৎস্নার ফুল
সে তো নেই আগেকার মতো
যে নারী সেদিন বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিল
সে আর এলোনা কাছে আগেকার মতো
পৃথিবীতে আগেকার মতো শুধু রয়ে গেল
ভালোবেসে আমার এ হৃদয়ের ক্ষত।

* পথের জন্ম

বনফুল

পথের জন্ম জানো কি কোথায় কেউ ?
কোন্ গুহা তলে, কোন্ অতলের কন্দরে
কোন্ আকাশের কোন্ সাগরের ঢেউ
চলার মন্ত্র শুনায় অচল বন্ধ রে !
মুকুলে কি ক'রে জাগে ফুটিবার তাড়া
পাথরের তলে ঝরণারা দেয় নাড়া
আকাশে আকাশে জাগে আলোকের সাড়া
উষার হাসিতে অরুণ হাসির ছন্দরে ।
জমাট জটিল অচল নিষেধ চিরে
চলিবার পথ তবু জাগে ধীরে ধীরে
পাহাড় চূড়ায় অনামা সাগর তীরে
চলে দলে দলে পঙ্গু অন্ধ খঞ্জরে ।

---

* বনফুলের আঁকা একখানি রঙ্গিন ছবির পাশে লেখা ।

বনফুলের প্রতি

ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সাহিত্যের চতুরঙ্গ ক্ষেত্রে তুমি করিতে বিহার,
গল্প উপন্যাস কাব্য নাট্যায়নে সমান কুশলী ;
বাস্তবের রূঢ় সত্যে করো নাই কভু পরিহার,
জীবন দর্শন বহ্নি চিত্তে তব উঠেছিল জ্বলি' ।
ভালোবেসেছিল তুমি মৃত্তিকার মানব পশুকে,
মর্মে তার দেখেছিলে সুপ্তিমগ্ন দেবোপম রূপ ;
সমাজের মূঢ়তায় উচ্চকিত দাঁড়াইলে রুখে,
আপন অন্তর মাঝে পোড়াইলে মহিমার ধূপ ।
মানুষের সুখ দুঃখে করেছিলে সৃষ্টি-উপাদান,
সৌন্দর্য প্রস্ফুট হলো স্মিতোপান্ত পাংশু চিত্রপটে ;
শিল্প তব অঘটন-ঘটন প্রয়াসে পটীয়ান্,
কল্পনার দিব্যরশ্মি বিচ্ছুরিত বস্তু সিন্ধু তটে ।
তোমার মঙ্গলাদর্শ মূর্ত হ'ল দিগন্ত উদ্ভাসি'
বন্দনা গাইবে তব—রাহুমুক্ত হৃষ্ট দেশবাসী ।।

এখানে ওখানে

রামজীবন ভট্টাচার্য

এখানে খ্যাতির তৃষ্ণা, ওখানে তৃপ্তির স্বাদ ;
এখানে বাগ্‌-বৈখরী আর "আমাকে" দেখানো,
ওখানে আমি-হীন অনন্ত শান্ত তা।
এখানে হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ-মসকরা
ওখানে বোধির আলো, নিথর নীরবতা।
এখানে স্মৃতির হুল, অতীত কপ্‌চানো,
ওখানে মৃত্যুহীন দীপ্ত বর্তমান।
এখানে ঘৃণা, তর্ক, বিসংবাদ, বুদ্ধির লড়াই ;
ওখানে মনহীন নিত্য শুদ্ধ একক চেতনা।
এখানে ক্রিয়াযোগ, পূর্ণযোগ—শব্দের বাহার ;
ওখানে বিয়োগহীন নিত্য জাগরণ।
"আপনি", "আমি", "সে", 'তিনি"—সবাই এখা
অদ্বৈত আনন্দ-রস শুধু ওইখানে।

মুক্তোর আশায়

ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ কুয়াশা ঢাকা। মানুষের আত্মার উপরে
নিথর বিবর্ণ সব। মহাশূন্যে ঈথরের স্তরে
স্বাধীন প্রাণের দাবী সূর্যহীন তামাটে আলোয়
ভেসে থাকে। জীবনের দূরচারী ছায়ার প্রবাহ
একান্ত অভ্যাস-ম্লান। নিরাশ্বাস পথের নিশানা।
চক্রবালে মেঘ। তবু অমৃতের পুত্র ইতিহাস।
বস্তুত দুঃখের কান্না দুঃখেরই সীমায় মুখ ঢাকে।
বাতাসের আর্তনাদে কম্পমান দীর্ঘ বালুচর।

এই ঘন অন্ধকারে একমাত্র দীপ শিখা জ্বলে
কারুণিক কবি চোখে। এত কান্না, ব্যথা এ দুঃসহ,
সবই শেষে নদী স্রোতে ভেসে যাওয়া শৈবালের দাম।
এ দুঃখকে ভয় পেলে মুক্তো পাওয়া কখনো যাবে না,
যে মুক্তো সমুদ্র তলে গভীর গভীরে দিন গোণে,
বিধাতার আদি স্বপ্নে মঞ্জরিত যে মুক্তোর প্রাণ।

পঞ্চাশোর্দ্ধ রবিবাসর

প্রভাতকুমার হালদার

এসো জ্ঞানী জন এসো গুণী জন
রবিবাসরের প্রিয়—
হেথা বরণের নেই আয়োজন
সবাই সে বরণীয়।
কেউ আঁকে ছবি, কেউ হেথা কবি
গদ্যে পদ্যে গাঁথা
প্রবন্ধকার-ঐতিহাসিক
এক সুরে বুঝি বাঁধা।
ভাই বোনে মিলি গড়ি মৌচাক
বিতরি মধু জনে
ছোটয় বড়য় নেইকো প্রভেদ
এক হ'য়ে থাকি মনে।
একদা হেথায় বিশ্বকবির
সুর ঝঙ্কার দিয়া
কথা সাহিত্যে অমর কাহিনী
দিয়াছেন মিশাইয়া।
নব বিজ্ঞানে নূতন ধারণা
শোনায় নূতন দিক
হাস্য রসের হাসি তরঙ্গে
ভাসায়ে নির্নিমিখ।
জ্ঞানের বিটপি ছত্র ছায়ায়
সপ্তসুরের তানে
অর্ধ শতেক বছরের দিন
জুড়ে আছে মনে প্রাণে।
এ রবিবাসর যাবে নাকো বনে
মনেতে বেঁধেছে বাসা

বনের ময়ূর মিলায়েছে রঙ্
রামধনু রঙে খাসা।
তাই তো আমরা এঁকে চলি ছবি
জীবনের নানা রঙ্গে
রবিবাসরের পরমায়ু যেন
শতাব্দি পায় বঙ্গে।

রবিবাসর সঙ্গীত

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সভাসদগণ শুভ-আগমনে
ধন্য আজি এ রবিবাসর
আমাদের ছোট নিকেতনে
বসেছে আজি এ গানের আসর।
মোরা মিলি সবে হৃদয়ের টানে
প্রতি সভ্যেরি সাদর আহ্বানে
পক্ষে পক্ষে অনুরাগীদেব
বসে এ মিলন বাসর।

সঙ্গীতে সুরু হয় এই সভা
সাথে কবিতা ও গল্প
ছড়া প্রবন্ধ জীবনের কথা
রস রচনাও অল্প,
মাঝে মাঝে হয় জোর আলোচনা
নৃত্য ও চিত্র গীত সাধনা
আনন্দ ভোজে সবাই সাধক
কভু সবে নিঃস্বর।। *

* কবি সুধানন্দ-ভবনে ২৯শে পৌষ, ১৩৮৫ রবিবাসবেব অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ কর্তৃক গীত।

কবি কালীকিঙ্করের 'ভাবরূপা' কাব্যপাঠে

প্রবীণ কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিনন্দন বাণী

কবি—

তোমার কবিতা পড়ি দেখিলাম ভাব রাজ্য তলে
বন্ধু তুমি বসে আছ শ্রীহরির পাদপদ্ম দলে।
এ কী লিখিয়াছ ভাই বঙ্গবাসী কাব্য কুঞ্জ বনে
তুমি যা দিয়েছ বার্তা পৃথিবীর জনসাধারণে
মূল্য তার কি বুঝিবে? কবিরাজ্যে যাহারা মনীষি
তারা শুধু দিবে মূল্য, আর যারা নরমাঝে ঋষি
তাহারা রাখিবে বুকে তব কাব্য 'ভাবরূপা' খানি
'ভাবরূপা' গ্রন্থে তব যে সব নারীরে প্রাণদানি'
করেছ জীবন্ত তুমি কাব্যে তার নাহি যে তুলনা
তব এ অপূর্ব রস পান করি হয়েছি উন্মনা।
ভাবিতেছি আজো যাহা ভক্ত কবি পারেনি বলিতে
মৃত্যুহরা সেই সুধা ঢেলে দেছ তুমি অঞ্জলিতে।
পরাইয়া দেছ তুমি বাণীমা-কে অপরূপ টীপ
প্রথমে অঞ্জলি তার সাক্ষী তব "সাঁঝের প্রদীপ"।
স্নেহ দিতে গিয়ে তোমা ঝরে পড়ে শ্রদ্ধা আঁখিজলে
ধন্য তুমি ফুটিয়াছ বঙ্গবাণী পাদপদ্ম তলে।

শ্রদ্ধাধন্য

২রা আষাঢ়, ১৩৬২ সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পত্রের উত্তর

হে কবি ! তোমার স্নেহাশিস লভি
তোমারে জানাই প্রণতি মম,
বাংলার আমি চরণের ধূলি
এই পরিচয় কাম্যতম ।
আমার জীবন ফুটে না উঠিতে
পড়ে তো পড়ুক শুকায়ে ঝরি
ফুল্ল হল না, খুললোনা দল
তবু তাই দিব অর্ঘ্য ধরি ।
'ভাবরূপা'—ভাই যাঁহাদের ভাব
সে ভাব আমার দুঃখ সবি
কাঙাল জেনেও করনিক হেলা
কারণ, তুমি যে জ্যেষ্ঠ কবি ।
নীলাচল নাথ নিরাময় করি,
দিবেন তোমারে দীর্ঘ আয়ু
মুছাইয়া দিবে সব অবসাদ
সিন্ধু সলিল স্নিগ্ধ বায়ু ।
আজিকে আমার 'শ্যাম নটরাজ'
লিখি আলেখ্য লেখনী দিয়া
তোমারে সঁপিনু হে স্বভাব কবি ।
তোমার আশিস মাথায় নিয়া ।
তুমি ভাগবত 'ভট্টাচার্য',
আমি তো পূজার কিছু না জানি
পটুয়ার মত পটেতে আঁকিয়া
তোমারে দিলাম পুরোধা মানি ।।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধেয় কবি কালীকিঙ্করকে

অজিতকুমার চক্রবর্তী

হে কবি,

দেখেছি তোমার মূর্ত মুরতি
আমার মনের মুকুরে
শুনেছি যে তব মর্ম বারতা
কাব্য বাণীর নূপুরে।
বঙ্গের ভালে চির জাগ্রত
দীপ্ত দীপক সূর্য
আকাশে বাতাসে বাজুক তোমার
অক্ষয় জয়তূর্য।
নতুন আলোর পরশ দানিয়া
জাগাও যাহারা সুপ্ত
ফিরাইয়া আনো হারা অতীতের
স্মৃতি যাহা অবলুপ্ত।
দুর্গত দীন কণ্ঠে আমার
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ
বিশ্ব সভায় অমর করিয়া
গাহিব তোমার গান।

---

১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫

---

* কবি কালীকিঙ্করের 'ভাবরূপা' কাব্য গ্রন্থ পাঠের পর

ছিন্ন বাঁধন

রামজীবন ভট্টাচার্য

ওগো আমায় ঠেলেছে কেগো বড়ই নিঠুর তুমি
দেখছোনা কি চলছে না পা, ক্লান্ত কত আমি।
আকষী দিয়ে টানছো কেন এই মাটিরই পরে
দেখছো না কি বিন্দু বিন্দু রক্ত আমার ঝরে ?
তোমার প্রীতির তোমার স্নেহের অনেক জোয়ার ভাঁটা
চলার পথে আমার পায়ে ফুটলো কত কাঁটা।
আজকে যখন হারিয়ে গেছে মনের রঙীন নেশা
যাঁতায় ফেলি তবুও কেন এমন করে পেষা ?
মান অপমান নিন্দা খ্যাতির কতই ঘূর্ণিবাঁক
অনেক কষ্টে পেরিয়ে এনু তবুও কেন হাঁক ?
শ্রান্ত 'আমি' ক্লান্ত 'আমি' আর ডেকোনা ওগো
ভিন্ন পথে যাত্রা এবার তোমরা জানো না কো।
চলব না আর এই পথেতে কঠিন আমার পণ
আমায় ছাড়ো এবার তুমি, শূন্য হল মন।
আরতো কিছু নেই যো আমার টানতে যাকে পারো
এই খানেতে ছিন্ন হ'ল দেহের বাঁধনটার-ও ॥

সেদিনও কি

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

ক্লান্ত আমি সপ্তর্ষির বৃন্ত হতে পড়েছি ধূলায়
গতিহারা পঙ্গু অচঞ্চল মূক অসহায়।
থেমে গেছে স্মৃতি আনন্দের অপূর্ব মূর্চ্ছনা
খুঁজে ফিরি কার মোহে আপনারে করেছি বঞ্চনা।
বজ্রের নির্ঘোষে জাগে বহ্নিমান আকাশের গায়
সহস্র সর্পিল ফণা হিংসা ক্রোধে বিষাক্ত জিহ্বায়
অনাবৃত বক্ষে মোর নীল সুধা ঢেলে দেয় ছোবলে ছোবলে
দু'টি বিন্দু ঘাম্ শুধু জন্ম নেয় রাত্রি শেষে উষার কপোলে।
বিবর্ণ তৃণের তলে দগ্ধ জরা সমাধিতে মৃতের ক্রন্দন
তোমার চরণ ছন্দে একদিন লভে যদি আত্মার স্পন্দন
অনাগত শুভক্ষণে অমৃতের রসধারা নামি
মুক্তিতীর্থে নৃত্য করে সুন্দরের ক্ষ্যাপা পাগলামি
সেদিনও কি ভাষাহীন তৃষাতুর রব আমি একা
কণ্ঠে মোর ফুটিবে না অব্যক্তের সুরের কলিকা ?

নাট্যকার ডঃ মন্মথ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চিত্রিতা দেবী

জীবনের রঙ্গমঞ্চে তুমি নাট্যকার
মানুষের কত সুখ, কত দুঃখ, কত অবিচার
কত আশা, কত স্বপ্ন,
কত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার
সমাজের নির্মমতা অকারণে কত অত্যাচার।
কারো ভাগ্যে রাজ সুখ,
কারো ভাগ্যে শুধু উৎপীড়ন
ধুলায় গড়ায় কত সুকুমার পেলব জীবন
বিধাতার কাব্য নিয়ে মর্ত্যের মঞ্চের পরে
সাজালে নাটক
কত সাধু সত্যবাদী ভদ্রবেশী কত চোর ঠক।
তোমার নাটকে দেখি আয়নার মত
বিচিত্র এ জীবনের রং করা ছবি
নমস্কার লহ তুমি নাট্যকার কবি।

———

প্রসাদী

কৃষ্ণ মিত্র

বল মা আলু মিলবে কোথা
আমি থলি হাতে নিরালাতে
ঘুরে ফিরি হেথা হোথা
ফিরলে ঘরে সবাই নারাজ,
অকর্মা কয় শালী শালাজ,
খাচ্ছি বিবির গালি গালাজ
থুতনি নেড়ে বলছে যা তা।
বল মা আলু মিলবে কোথা।

শালগ্রাম কি দেব।দিদেব
আলুব রূপে হিমঘরেতে
হয়ত থেকে অন্তরীণে
মিশে যাবেন পঞ্চভূতে,
বিমাতা ঐ কেন্দ্রকে হায়
লেঙ্গি মেরে বিধান সভায়
ভাবছি আলুর হবে উদয়,
এ অভাগার বাঁচবে মাথা।
বল্ মা আলু মিলবে কোথা।

মুখের ভাষা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সবার ভাষাব স্বর্গে চেতন ব পাখা উড়ে যায়—
মনের আলোর দেশা বাণীবনে বিচিত্র লীলায়।
কথা আর বাসনার ভালোবাসা গানে গানে যদি
গোপন অন্তর থেকে ছাড়া পায় ছুটে হয় নদী।

অনেকে থাকতে পারে, অনেকের থাকে না নির্বাক
স্বভাবে স্বাভাবিকতা ; কারণ বলার মতো ফাঁক
সভ্যতার আদি কালে অর্জন করেছে মানবতা,
কালে কালে অগ্রগতি নবতর চৈতন্যে ক্ষমতা।

আবার বোবার কান্না থেমে গেলে সমাজ সমানে
সৃষ্টির সামগ্রী নিয়ে জীবন যাত্রার সসম্মানে
নতুন ভাবনাটুকু তোড়া বেঁধে জোড়া অবয়বে
ভাষার আশাব রূপে বর্ণাঢ্য যে বাণীব সববে।

মুখেব ভাষার থেকে সুখে দুঃখে বিশ্বেব বাসবে—
একান্ত প্রেমের চিহ্ন বেখে যায় নিছক আদবে।

সর্বজনপ্রিয় পরম প্রীতিভাজন
ববিবাসবেব পবম সমাদৃত সম্পাদক

শ্রীসন্তোষকুমার দে-র জন্মদিনে

আনন্দ সভাজন।

সন্তোষে অন্তর পূর্ণ	তব জন্মদিনে তাই
বাধা বিঘ্ন করি চূর্ণ	শুধু এই প্রার্থনাই
পরিপূর্ণ পুণ্য সুখাস্বাদে,	জানাই জগতিপতি পাশে
দারা পুত্র কন্যা সহ	প্রতি জন্মদিনে তব
মগ্ন রহ অহরহ	ভাগ্য দেবী নব নব
কাজ কমে আনন্দে আহ্লাদে।	সুমহার্ঘ অর্ঘ্য নিয়ে আসে।

চির শুভানুধ্যায়ী
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর

৬ই বৈশাখ
১৩৮২

পারানি

কৃষ্ণ মিত্র

বর্ষার বুকে আছে নূপুরের ছন্দ
বুঝি সেটা থামাবার পরে সে
শিউলির ভোরে জাগা মৃদু মধু গন্ধ
ডাকে মোরে যবে যায় ঝরে সে ।
কোকিলের কুহু কুহু নিরজন বনছায়
দোলা দেয় হৃদয়ের তন্ত্রে
ছিঁড়ে যাওয়া একদিন ভাষা পায় ফিরে তার
ব্যথাভরা জীবনের মন্ত্রে ।
মনে ভাবি ঘুচে গেছে এ হাটের বেচাকেনা
চুপি এসে বসি খেয়া ঘাটেতে
বাউলের সেই গান মনে করে আনাগোনা—
"পারানির কড়ি আছে গাঁটেতে" ?
নিরাশায় ভাঙা হাটে ফিরে আসি গুটি গুটি
পাই নাকো খুঁজে মরি যাহারে,
চেয়ে দেখি এক কোণে পড়ে আছে দুটি কড়ি
—পারানি সে দিয়ে গেছে আমারে

এই তো স্বর্গ

কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'ধারে সোনার ক্ষেত কাছ হতে দূরে
ক্লান্তিহীন সবুজের চোখ ধাঁধা মায়া
চিত্ত আজ বাজে মোর কি সুন্দর সুরে
আম কাঁঠালের বনে কি বিচিত্র ছায়া ।
সত্যের বাণী আছে এইখানে জানি
ভগবান আছে হেথা একথাও মানি ।
দোয়েল ফিঙের গানে বাউলের সুর
বাতাবি ফুলের গন্ধে প্রাণ ভরপুর ।
কে যেন ডাকিয়া বলে আয়, কাছে আয়,
মিঠেল সুরেতে কার গান শোনা যায় ।
স্বর্গ কোথাও যদি থাকে কাছে দূরে
তা এই এখানে, সোনা এ দেশের মাটি
এরই মাঝে অমলিন জীবনটি পুরে
পল্লীজীবন হোক মধু পরিপাটি ।

———

রবিবাসর গ্রন্থ উৎসর্গ

সর্বাধ্যক্ষ ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের হাত থেকে গোলাপগুচ্ছ সহ 'রবিবাসর' বার্ষিক সংকলন গ্রন্থখানি গ্রহণ করছেন আনন্দ বাজার পত্রিকা সম্পাদক অশোক কুমার সরকার।

ক্রিটিক সার্কল অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রবিবাসরের সংবর্ধনা

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ক্রিটিক সার্কল অব ইণ্ডিয়া-র অনুষ্ঠানে রবিবাসরের পক্ষ হতে কবি কৃষ্ণ মিত্র মানপত্র, পদক ও রূপার ময়ূর গ্রহণ করছেন। বামে প্রধান অতিথি মাননীয় বিচারপতি এস. রঙ্গরাজন তাঁর হাতে উপহারগুলি তুলে দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. এস্. সি.
(প্রাক্তন উপাচার্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

রবীন্দ্রনাথ কবি, সাহিত্যিক ও দ্রষ্টা ঋষি। সৃজনী শক্তির এমন ব্যাপক বিকাশ ক্বচিৎ দেখা যায়। কাব্য, সংগীত, নৃত্যকলা, ছবি আঁকা, ছোটগল্প, বড়োগল্প, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পত্রাবলী, উপন্যাস, নাটক; গীতিনাট্য, প্রবন্ধ, ধর্ম, মানবিকতা, শিশুসাহিত্য, হাস্যকৌতুক, শ্লেষাত্মক রচনা—যে দিকে দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনীশক্তি, প্রতিভা এবং স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন। তিনি একটি পরম বিস্ময়। সাধারণ মাপকাঠিতে তিনি বিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা ও চিন্তা তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়িযে আছে।

সম্যক অনুশীলনের দ্বারা বিজ্ঞান কেবল জানাই যায় না, তাকে জীবনের সর্ব কাজে প্রয়োগ করাও চলে। এই শেষোক্ত বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী তাঁদের বলা যায় বৈজ্ঞানিক। আব যাঁদের ক্ষমতা জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদেব বলা যায় বিজ্ঞানী। অর্থাৎ বিজ্ঞানী মাত্রই বৈজ্ঞানিক নন। অনেক বিজ্ঞানী অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, সে রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

যাঁর মন অনুসন্ধিৎসু, যিনি যুক্তি ও বুদ্ধিব দ্বারা পবিচালিত হন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁকেই বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসাধক বলা যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তির সঙ্গে সৃজনীশক্তির যোগে নতুন আবিষ্কার সম্ভব। এই অনুসন্ধান কেবলমাত্র বস্তুতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, নানা বিষয়েই গবেষণা ও সৃষ্টিকার্যে সম্ভব। নতুন নতুন ছন্দ রচনা, রাগসংগীত রচনা, নাটক নৃত্য রচনা ইত্যাদির মধ্যেও সৃজনীশক্তির স্ফুরণ প্রতিভাত হতে পারে। এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরী হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল থেকে একটা সৃজন চলছে।" (আত্মপরিচয়, ১ম খণ্ড, ১৭২)

কিন্তু বিজ্ঞান বলতে চলতি ধারণা পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানসম্ভার ও তার

প্রযুক্তি, কারণ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপাদনের মূলে, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পিছনে রয়েছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনা। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলের মধ্যেই কমবেশি বিজ্ঞানমনোভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্য সাহিত্য ছন্দ রচনাশৈলী নিয়ে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। এই বিষয়ে বহু বিদগ্ধজন তাঁর রচনার আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁর বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল। এর আগে এবং পরেও হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐ অনুষ্ঠানে তাঁর বিজ্ঞানচিন্তাও স্থান পেয়েছিল। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীপরিমল গোস্বামী এই বিষয়ে বিস্তারিত একটি বড়ো তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। সেটি 'রবীন্দ্রায়ণ' গ্রন্থে স্থান পায়। আরও অনেকে লিখেছেন কিন্তু সব কটি সংকলন বা রচনা পড়বার সুযোগ আমি পাই নি। অনেকের ধারণা হতে পারে, যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে আলোচনা আমার পক্ষে দুষ্কর নয়। লেখার আগে পর্যন্ত আমারও এই রকম প্রতীতি ছিল। প্রস্তুতিপর্বে সেই ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। লেখার বিষয়টি যত সহজসাধ্য মনে হয়েছিল, ততটা মোটেই নয়—একথা স্বীকার করছি।

বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা ও মত স্পষ্ট এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নানা উপলক্ষ্যে ব্যক্ত করেছেন। কাব্যসৃষ্টি তাঁর প্রধান প্রেরণা হলেও সমাজ ও দেশ সেবা এবং সত্যিকারের মানুষ তৈরীর কাজ তাঁর মনকে আঁকড়ে রেখেছিল। তিনি প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করতেন না, কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তাতে পদে পদে বাধা পায়। বিজ্ঞান শিক্ষার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে তিনি যতখানি বিজ্ঞানশিক্ষা করেছিলেন তা বেশির ভাগই স্বীয় প্রচেষ্টায়। পঠিত বিষয় সহজে বোঝার জন্য মাঝে মাঝে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

একজন তথাকথিত বিজ্ঞানীর সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে কিছু বলা অধিকতর সহজ, কারণ তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মধ্যে সবটুকু তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার বেশির ভাগই নানা প্রবন্ধে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সংগ্রহকার্যই দুরূহ। অতএব যা-ই বলা হোক অভাববোধ থেকেই যাবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও প্রারম্ভিক পর্বে বলা দরকার মনে করি।

কাব্যসাহিত্য, চারুকলা, সংগীত ইত্যাদি প্রায় একক প্রচেষ্টা। একাধিক ব্যক্তি একত্রে কবিতা কিম্বা উপন্যাস কিম্বা সংগীত রচনা করেছেন, তার নজির জানা নেই। কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার বেশীর ভাগই কিম্বা সবটাই যৌথ প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানে একক রচনা বা তথ্য আবিষ্কারের পিছনে পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের অবদান থাকতে বাধ্য। সেই জন্তেই একজন বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে বুঝতে গিয়ে অন্য বিজ্ঞানীর সমালোচনা বা সমর্থন কাজে লাগান যায়। বিজ্ঞানের যে চমকপ্রদ সৌধ তৈরী হচ্ছে, তাতে কত বিজ্ঞানী যে লোহা, চুন, সুরকি, ইট, কাঠ যোগান দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এভারেষ্ট শীর্ষে যে-ই পৌছাক তাঁর পিছনে যে সহায়ক দল রয়েছেন তাঁদের তো অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু চেষ্টায় ধাপে ধাপে বিজ্ঞানের অগ্রসর হয়। যিনি আবিষ্কর্তা তিনি অধিকতর সাংবান তথ্যগুলি বেছে নিয়ে একটি নতুন আবিষ্কারের পথ খুঁজে নিতে পারেন। পাকা শিল্পীর মতন তুলির একটি শেষ আঁচড়ে এক সৌন্দর্যময় ছবি এঁকে ফেলেন।

রাতের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর লোক যুগযুগ ধরে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আকাশের তারা গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে কত কাব্য, গল্প ও সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নক্ষত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় ঘটে তাঁর পিতৃদেবের সাহচর্যে। তাঁর কথায়:

"তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্ব মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার ধারাবাহিক রচনা ; আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে"। (বিশ্বপরিচয়, ৫)

এই প্রবন্ধই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কেটেছেঁটে প্রকাশিত হয়। বোধ হয় এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা। অবশ্য অনামেই ছাপা হয়েছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত বিজ্ঞানসংবাদ লিখতেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।

'স্বাদ' পাওয়াটাই বড়ো কথা। এই স্বাদ এতই তীব্র ছিল যে তিনি প্রবন্ধ লিখেই থেমে যান নি।

"জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বই তখন কম বের হয় নি। সার 'রবর্ট বল্'-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্খায় নিউকোম্বস্, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক

লেখকের বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি—শাঁসসুদ্ধ, বীজসুদ্ধ। তার পরে একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান এই দুইটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলেনা অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা ক'রি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে"। (বিশ্বপরিচয়, ৭)

'বিশ্বপরিচয়' পুস্তিকার উৎসর্গ পত্র থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হল তাতেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। 'স্বাদ' এবং 'আনন্দ' পাওয়া এই দুইটিই হল আসল। যারা বিজ্ঞানকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ক'জনের এই ভাব রয়েছে? অথচ কবি তাঁর কবিত্বে এতটুকুও ঘাটতি হতে দেন নি। আজীবন তিনি যথাসাধ্য বিজ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন ও আনন্দরস পান করেছেন। তারই ফলশ্রুতি আমরা লাভ করেছি তাঁর অমূল্য রচনা 'বিশ্ব-পরিচয়'-এ। ছিয়াত্তর বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি বইখানি লেখেন কিন্তু প্রস্তুতি বাল্যকাল থেকে। এই নিষ্ঠার তুলনা হয় না। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ পেতেন এবং বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বভাবতই তাঁর লেখার মধ্যে প্রচুর বিজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। পরিমল-বাবুর প্রবন্ধটিতে এই ধরনের বহু সংকলন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের যুগে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানের প্রভাব থাকতে বাধ্য। সুতরাং সব লেখকের লেখার মধ্যে অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের বিষয় নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়মত আমরা সকলেই জানি। বিজ্ঞানশিক্ষাদানও যে মাতৃভাষাতেই হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে তিনি নানা উপলক্ষ্যে মত প্রকাশ করেছেন। মনে হয় 'বিশ্বপরিচয়' লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষায় ভাষা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের বিতর্কের প্রত্যুত্তর দেওয়া।

'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গ পত্রে আর এক জায়গায় কবি লিখেছেন:

"আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃত তত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তা সব বুঝিনি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।" (বিশ্বপরিচয়, ৭)

"বিজ্ঞান থেকে যারা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মত কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে 'যথালাভ'। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরীবৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ"। (বিশ্বপরিচয়, ৭)

আবার বলি, অনেক তথাকথিত বিজ্ঞানীই বিজ্ঞান থেকে চিত্তের পরিবর্তে দেহের খাদ্য সংগ্রহেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। যিনি রস সংগ্রহ করতে পারেন এবং তা থেকে মনের আনন্দের খোরাক জোটাতে পারেন তিনিই তো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক।

আরও একটা বিষয়ে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল'। এইটিই হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। আমরা বিজ্ঞান চর্চা করি কিন্তু অনেকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ—সায়েণ্টিফিক্ টেম্পার বা অ্যাটিটুাড্ গড়ে ওঠে না। স্বাদ আর আনন্দ না পেলে ঐ মেজাজটি আসে না। ঐ মেজাজটিই হল বিজ্ঞানচিন্তার মূল উপজীব্য।

বাল্যকালে বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল প্রচুর। কিন্তু হাতে-কলমে কাজের সুবিধে হয় নি। ফুলের রং বের করতে বিফল হয়ে আর কখনও যন্ত্রে হাত দেন নি—"এমন কি সেতারে এস্রাজে তার চড়াই নি।" (জীবনস্মৃতি, ১০ম খণ্ড, ১৫৬) সীতানাথ দত্ত'র নিকট একই পাত্রের মধ্যে গরম জল ঠাণ্ডা জল ভেদ করে কীভাবে উপরে ওঠে তার চাক্ষুষ পরীক্ষা বালক রবীন্দ্রনাথের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল ও আনন্দ দিয়েছিল। তেমনি বিপরীত ভাবে দাগ কেটেছিল বিজ্ঞান পরীক্ষার একটি ভয়াবহ দিক দেখে। শবব্যবচ্ছেদাগারে একখণ্ড কাটা পা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ঐ সময়েই কণ্ঠনলীর কৌশলরহস্য বোঝাতে গিয়ে মাষ্টার মহাশয় (অঘোরবাবু) যখন পকেট থেকে একটি কণ্ঠনলী বের করে ব্যাখ্যা করতে গেলেন বালক রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ মনে ধাক্কা লেগেছিল। সেই কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতিতে' লিখেছেন :

"কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে কণ্ঠনলীর মধ্যে নেই, দেহব্যবচ্ছেদকালে মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন। এইজন্যই কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই।" ......"কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায় ইহা কখনও মনে হয় নাই। কলকৌশল যত বড়ো আশ্চর্য হউক না কেন, তাহা ত' মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে।" (জীবনস্মৃতি, ১০ম খণ্ড, ২৩)। এইখানেই

কবি-মনের সঙ্গে বিজ্ঞান-পদ্ধতির সংঘাত ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা হারান নি, আজীবন আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন।

'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বলেছেন। একজায়গায় আছে :

"ভারতবর্ষে যদি সত্যি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকেব অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

(বিশ্বভারতী, ১১শ খণ্ড, ৭৪৭)

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা বিষয়ে লিখেছিলেন :

"একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্র ; আহ্বান করেছিলুম এখানকার জলস্থল আকাশের সহযোগিতা।......এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত উদ্ভাবনার তত্ত্ব ; আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। **তাই বিজ্ঞানকে আমরা কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।** ......কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়।" (আত্মপরিচয়, ১১শ খণ্ড, ২২২)। কবির মনের এই দিকটাই পরবর্তী কালে বহুভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

বিজ্ঞানের প্রতি কবির আগ্রহের সীমা ছিল না। তারই আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জীবনীকার শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই বলি :

"কবির কল্পনাবিলাসী মনে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কত কথাই উঠেছে। ভাবছেন, সেখানে টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খুলতে হবে ; সেখানে ল্যাবরেটরি স্থাপিত

হবে, রথীন্দ্রনাথ গবেষণা করবেন ; ভালো একটা হাসপাতালের প্রয়োজন ইত্যাদি। ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতনে যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে সে স্বপ্নও দেখেছেন। প্রাচীন ভারতের কাষায়বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মচারীর আশ্রম-স্বপ্ন কি ভেঙ্গে গেছে ? প্রাচীন ভারতের অবাস্তবতা থেকে কবির মন ক্রমশই মুক্তি পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে ; য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের এটাই হল প্রত্যক্ষ ফল। ভারতীয়েরা যে পাশ্চাত্য জাতির সমতুল্য নয় এইটা পদে পদে অনুভব করছেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে তাদের সমতুল্য হতে না পারলে বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন সে পাবে না, এই ভাব থেকেই কবি আজ শিক্ষাসমস্যাকে দেখছেন এবং শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে হবে ভাবছেন।

"আমেরিকা থেকে বহু চিঠি লিখেছেন, বহু বই পাঠাচ্ছেন শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে—বিজ্ঞানের বই বেশী। কবির ইচ্ছা বিজ্ঞানসম্পর্কে বইগুলি পড়ে কেউ ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেন। ছাত্রদের বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার ঝোঁক তাঁর শুরু থেকেই। ল্যাবরেটরি স্থাপনের পরিকল্পনা এই জন্যই। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের জন্য যখন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয় তখনো ভারতের কোন দেশীয় স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার জন্য বিজ্ঞানাগার ছিল না। জগদানন্দ রায় ছিলেন এর কর্ণধার।" (রবীন্দ্রজীবনী কথা, ১৩০)

১৯২২ সালে আমেরিকা থেকে কবি এই মনোভাবই প্রকাশ করেছেন :

"আমার ইচ্ছা ওখানে এক একটা ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তা হলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যা দান করা।" (রবীন্দ্রজীবনী কথা)

আমেরিকা ও য়ুরোপের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য যে বিজ্ঞানসাধনা ও তার উপযুক্ত ব্যবহারেরই ফল তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের দারিদ্র্য-মোচনের একমাত্র উপায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও তার প্রয়োগ। ভারত জগৎকে দিতে পারে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ, তার দর্শন, কিন্তু ভারতকে প্রথম হতে হবে স্বাবলম্বী এবং বৈষয়িক সম্পদে যথেষ্ট শক্তিশালী। তা হলেই ভারতের বক্তব্য ও মন্তব্য সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে এবং সম্মান করবে। বিবেকানন্দও ঐ কথাই বলেছিলেন : খালিপেটে ধর্ম কর্ম হয়না।

সোভিয়েত য়ুনিয়নে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষায় বিজ্ঞানের অভাব

স্বীকার করেছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : "আমাদের ছাত্রদের একটি জিনিস কেবল দিতে পারিনি তা হল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তার কারণ বিপুল খরচ, আমাদের দরিদ্রদেশে তার সংস্থান খুবই কঠিন।"

(সোভিয়েট যুনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, ৪০)

"ভারতবর্ষের মানুষ কৃষিজীবী। এদেশে আপনাদের যে সাহায্য ও উৎসাহেব প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দেরও তাবই প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভর কবে এই বেঁচে থাকাটা যে কী সংকটজনক তা আপনারা জানেন। জানেন কৃষকদের পক্ষে জীবনেব বর্ধিত দাবি মেটানোব জন্য শিক্ষা ও ফসল উৎপাদনের আমলী পদ্ধতির জ্ঞান কী একান্ত প্রযোজনীয়।"

(সোভিয়েট যুনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, ৬৮)

আজ দেশের বিজ্ঞানীরা যে গ্রামীন উন্নতিব জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের কথা সর্বত্র বলছেন এবং গভর্ণমেণ্টও জোর দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী আগে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রতি যেমন রবীন্দ্রনাথেব আকর্ষণ ছিল, বিজ্ঞানীদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। সীতানাথবাবু ও অঘোরবাবুব সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁরা বালক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানীদের প্রতি কবির শ্রদ্ধার মনোভাব চরম দেখতে পাই জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের পত্রাবলী থেকে এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। জগদীশচন্দ্র মূলতঃ বৈজ্ঞানিক কিন্তু তাঁর কবিমনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁদের বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল পারস্পবিক অপরিসীম শ্রদ্ধার দ্বারা অভিষিক্ত। শিলাইদহের বাড়ীতে রেশম কীটের চাষ থেকে আবম্ভ করে গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক আলোচনার মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁব গবেষণার কাজে বিদেশে ভ্রমণের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর নিজের সঙ্গতি ক্ষীণ থাকাতে তিনি ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের নিকট অর্থ সাহায্য চাইতে দ্বিধা করেন নি।

"জগদীশ বাবুর জন্য কিছু করার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধা তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের ক্ষোভের ও লজ্জার সীমা থাকিবে না।......আমার একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা, মঙ্গল উদ্দেশ্যের

প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি রক্ষা করিবেন।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত, ৯০)

ত্রিপুরাধিপতি অবিলম্বে কবির অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং জানাইলেন:
"বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু'একপদ অলঙ্কার না-ই বা হইল।',

(জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত ৬৮)

জগদীশচন্দ্রের হতাশা ও অনিশ্চয়তাব্যঞ্জক চিঠি পেলেই রবীন্দ্রনাথ উৎসাহপূর্ণ উত্তর দিতেন।

"কোন্ দিক দিয়া তিনি (ঈশ্বর) আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জলিত কর। বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই। ...তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে।"

(জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত ৮৫)

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাব কথা যাতে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ জানতে পারে তার জন্য তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। বঙ্গদর্শনে একাধিক প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্র ও তাঁর গবেষণা নিয়ে লেখা। ভগিনী নিবেদিতা লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে জানাতেন। তিনি বঙ্গদর্শনে বাংলায় লিপিবদ্ধ করতেন। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তিকথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে। কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার, দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেইজন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটতো। **আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিলনা। কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে।** সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেইজন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলতো দুই দিকের দুইখানা জানলা দিয়ে।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত, ২২৯)

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি এই উপলক্ষে বলেছেন:

"জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন

তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাকে প্রতিদিনের সখ্য ও সাহচর্য দান করিয়াছেন।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত ২১২)

তৎকালীন অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিখ্যাত রসায়নবিদ্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি কবির গভীর স্নেহের পরিচয় 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গ পত্রেই পাওয়া যায়। ঐ পুস্তিকাটিতে মেঘনাদ সাহার সম্পর্কে সস্নেহ উক্তি উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর বসুকে বিশ্বভারতীর ভিতর টানবার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি আই. এস্. সি. ক্লাসের ল্যাবরেটরির দরজায় পাথরের ফলকে 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন' লিখিয়েছিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি মনে প্রাণে এত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি স্ত্রীর গহনা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথের আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা পড়াবার ব্যাপারে দ্বিধা করেন নি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী কথা'র এক জায়গায় লিখেছেন :

"কবির বিশ্বাস বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

বিশ্বপরিচয়ের উৎসর্গ পত্রেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে :

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, **গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।"**

(বিশ্বপরিচয়, ১)

"এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেরও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্র মনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।" (বিশ্বপরিচয়, ১)

বিজ্ঞানশিক্ষা ক্লাসের কক্ষে কিম্বা গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে কখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারেনা। তাকে দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে।

"ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে (ছাত্র) অনেক মার খেয়ে শিখেছে। একথা মনে করতে তার সাহসই হয়নি যে, যে-নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে সেই নদীই তার ভূগোল-বিবরণের নদী তার বহুদুঃখের এগ্‌জামিন-পাসের নদী।" (শান্তিনিকেতন, ৩২৪)

আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা এখনও বেশির ভাগই ঐ পরীক্ষা-পাসের জন্য। যা পড়ছে তা কোথাও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে না। এখন ত' বিজ্ঞানশিক্ষা আবশ্যিক পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত ; তবু হাতেকলমে পড়া জিনিস যাচাই করার কোন ভালো ব্যবস্থা হলো না। তা ছাড়া বিজ্ঞানকে আমরা মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারিনি। সোভিয়েত য়ুনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে কবি বলেছেন :

"বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন অধিকাংশ শিক্ষাতেই একথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।" (রাশিয়ার চিঠি, ১০ম খণ্ড ৭০৮)

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের দৈন্য ও অবহেলার উল্লেখ করে তিনি লিখলেন :

"আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি। তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কলনিষ্ঠার পরিচয়।"

(শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৫৬২)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনার পরিণতি হলো বস্তুজগতের নিয়ম আয়ত্ত করা। কবির কথায় :

"বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয় ; বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে ; সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছুতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে ; আর পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।"

বস্তুজগতের উপর কর্তৃত্বই ক্ষমতার উৎস, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের সম্পদ, দরিদ্রতা মোচনের চাবিকাঠি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা।

মানুষের মনে অজানাকে জানার স্পৃহা এবং প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করার প্রবৃত্তি অদম্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া।.........আসল কথা মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়।......গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘটছে এ সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে। সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে ; মানবো না, মানাব।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৫)

বিজ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান পাশ্চাত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানে অনগ্রসর প্রাচ্যের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছা না করলেও মরতে পারি।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৮)

বিজ্ঞানলব্ধ শক্তিই য়ুরোপ এবং আমেরিকাকে পৃথিবীর রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা জুগিয়েছে।

"পশ্চিম দেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ করেছে কখন থেকে ? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৬)

আবার পোলিটিকস্‌ই দেশে দেশে বিভেদ ঘটিয়েছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান যোগসূত্র বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে।

"পশ্চিম মহাদেশ তার পোলিটিকস্‌এর দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বিজ্ঞানের দিকেই তাঁর আলোক জ্বলছে। সেইখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ, কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে।" (বিশ্বভারতী, ১১শ খণ্ড, ৭৮৫)

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে যে সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানে বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিজ্ঞানীরাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব অবস্থাকে দেখতে পারছেন না। যারা বিজ্ঞানের সহায়তাকে এড়িয়ে যেতে চায় তাদের উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে সন্ধান করতে চায় না, তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড ৬৬৬)

"পাড়ায় আগুন লাগলো কেন'র উত্তর এলো: "কপাল"। কবি বললেন, "কপাল নয়, কুয়োর অভাব।"

প্রকৃতি তার সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা দিকে নানা ভাবে। মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি। এই দুইএর যোগে সে আয়ত্ত করতে পারবে এই বস্তুজগতে সে যা চায়।

"তিনি (দেবতা) তাঁর সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন "বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম; আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম। এই দু'য়ের যোগে তুমি বড়ো হও।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৭) বুদ্ধির নিয়ম পেতে হবে বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা।

'কপাল' না 'কুয়োর অভাব' এই মোহ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বের নিয়মগুলিকে জানতে হবে।

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার হাত থেকে কেবলমাত্র মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না।"

(শিক্ষা, ১১শ ৬৬৭)

বিশ্বের নিয়মকে ছাড়িয়ে, বুদ্ধির নিয়মের বাইরে কিছুই কি নেই? যে-দেবতা এই বিশ্বের নিয়ম ও বুদ্ধির নিয়ম যোগে আমাদের বস্তুরাজ্যে আধিপত্য করার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর কি আর কোন দায়িত্ব নেই, নির্দেশ কিছুই নেই, করার কিছুই নেই? রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষমতা কতখানি সীমাবদ্ধ। এই বিষয় নিয়ে কবি অনেক কথা বার বার বলেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতির দ্বারা তাঁর চিন্তাধারাকে বোঝানো যেতে পারে।

"য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগলো তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে।"

(শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭০)

মানুষ মনুষ্যত্ব লাভের সাধনায় তপস্যা করছে। এই তপস্যা তার দৈনন্দিন

জীবনধারণের জন্যও হতে পারে। এই তপস্যার মাঝে মানুষ দেখে নানা বৈপরীত্য ও বৈষম্য। কিন্তু কবির কথায়, "এই সমস্ত প্রবণতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোন একটা মাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।" (শান্তিনিকেতন, ১৩৩)

"মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ......আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।" (শিক্ষা ১১শ খণ্ড, ৬০২)

এইখানেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাধনার সংযোগ স্থাপন সম্ভব। আপাত বিরুদ্ধতা এই সংযোগের দ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকেই প্রমাণ করেছেন নানা রকমে।

"দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। ....সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাপীঠ আজ শুক্রাচার্যের হাতে। ....বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিমদুয়ারী বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও-ঘরটা অপবিত্র, তা হলে যে-বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে-বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড ৬৬৭-৬৮) দু'য়ের সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধন ভারতবর্ষই করতে পারে।

"বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তা ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭৫)

"বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশী পেরোয় কখন? যখন বহিঃপ্রয়োজনের বড় বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে। কলের সঙ্গে সে তাল

রাখতে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহুদূরে পড়ে গেল। কল গেল এগিয়ে, তাকেই সেখানকার লোক বলে অগ্রসরতা! প্রোগ্রেস্।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ১০ম খণ্ড, ৫৬৮)

বিজ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত নানা প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের মনটিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এর থেকে উদ্ধার পাবো কি করে? কবি তাই বলেছেন:

"কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎ পরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশ মাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতর রূপে গভীরতর রূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি।" (আত্মপরিচয়, ১০ম খণ্ড, ১৮০)

"য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞান সাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপে শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এই জন্য তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে; জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।" (বিশ্বভারতী ১১শ খণ্ড, ৬৭৪)

"তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন না-জানাই বন্ধনের কারণ। জানাতেই মুক্তি। সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সে-ই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয় রাজ্যে আমরা যাহা বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া। এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞান।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭৪)

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাব থেকে পাশ্চাত্যদেশের মানুষ মুক্ত হতে পারছে না, ভারতবর্ষ সেই মুক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল। তাই কবির প্রার্থনা:

"ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি। কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।" শিক্ষা ১১শ খণ্ড, ৬৭৭)

বস্তুরাজ্যের নিয়ম অন্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে যাতে জড়বাদ তার শিকড় দৃঢ় না করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার, কারণ "বিশুদ্ধ

জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যলাভের অধিকারী, সত্যকে যে শ্রদ্ধা করে পূর্ণমূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক; প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্যজাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের।" (পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৬)

কিন্তু এই জয়ই কাল হয়েছে। জয়ের লোভে তামসিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে। এই জয়ের লোভেই য়ুরোপীয় ও আমেরিকার বিজ্ঞানসমাজ যে-কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে ভূরি ভূরি প্র্যাকৃটিক্যাল্ ফল বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। কবির কথায়:

"বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগাম বাঁধছে। ....এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়। এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি।" (পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৬) কবি এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন নৈবেদ্য'র একটি কবিতায়:

"শক্তি দম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।"

ভারতের তপোবনে যে প্রশান্ত সরলতা,' 'সমুজ্জ্বল জ্ঞান' ও শীতল সন্তোষ' বিতরিত হত তার অভাব ঘটেছে।

".........আজ তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

(নৈবেদ্য, ১ম খণ্ড, ৯০৩-৪)

বিজ্ঞানের বিশুদ্ধসত্য আলোচনা করে তার সাধকের প্রতি সকলের ভক্তি হয়েছে মনে। কিন্তু লোভ হিংসা পশুবৃত্তি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সে কল্পনাও করা যায় না।

".........য়ুরোপে বাধলো মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে। ......এত বড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয় নি। একেই বলি জড়তন্ত্র; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত। বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।" (পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৭)

"যে-য়ুরোপ শক্তিপূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করচে সেই য়ুরোপ পৌরাণিক—সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্যকে তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা।" (চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড)

আধিভৌতিক শক্তি যেটুকু সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছে তাকেই আত্মসাৎ করতে উদ্যত।

"মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়ি-পাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, 'আমার জ্ঞানের জোরেই এই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে'। কিন্তু এ জ্ঞান যদি তারই হত তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে, বলে, 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি। কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পা-ও চলতে পারত না'।" (শান্তিনিকেতন, ৩৭১)

আইনস্টাইনের সঙ্গে কথোপকথন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি হতে হবে এমনি যাতে ব্যক্তিগত সীমা ও সংকীর্ণতা, ত্রুটি ও ভ্রান্তি বাদ দিতে দিতে বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে-ধারণা সম্ভব সেই দিকেই আমরা যেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পারছি মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের ধারা ও প্রকৃতি ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে; ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তা জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ছে।

আজকাল পরিবেশসংরক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য কত কথা শোনা যাচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা কতখানি বৈজ্ঞানিক ছিল নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়।—

"পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতেখড়ি দিয়াছে; ঘরের দেওয়াল আমাদের পক্ষে ত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালে ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে। আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ-সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে।" (শিক্ষা, ১:শ খণ্ড, ৬৩৮)

বিজ্ঞানের যুগে আমরা দ্রুতগতিতে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করছি, তার কুফলও ভোগ করছি। পরিবেশ কলুষিত করে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুলছি। অথচ প্রকৃতির যোগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চললে এ দশা হত না।

অপরদিকে দেখতে পাচ্ছি বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ নিয়ে আলোচনা চলছে। যে দৃঢ় প্রত্যয়কে মূলধন করে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছিল তার ভিত্তিমূলে চিড় খেয়েছে; ভাঙনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করেছেন এবং নিজের মতামতও প্রকাশ করেছেন:

"বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদান সংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে, সেই জন্যেই কার্বনটা কার্বন, অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহু দীর্ঘকালের ভূমিকায় আদি সূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টি সংঘটনের যে ব্যাপার চলছে তাতে সেই সব মূলভূতের মধ্যেও টানাছেঁড়া ঘটেছে; সেটা ভেবে দেখতে গেলে সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রের অনন্ত মরীচিকার প্রবাহ। এতদিন বিজ্ঞান বলে আসছিল পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; থেকে থেকে অঘটন ঘটে। দুই-দু'য়ে পাঁচও হয় নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্ব সমাসে।" (পথে ও পথের প্রান্তে, ১০ম খণ্ড, ৮৪২)

কবি ভাবজগতের, বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা নিয়ে এর বেশি কিছু বলতে চান নি। তাঁর মতে, "আমার কলমে শোভা পায় না।"

"আমার তো বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার-যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু একদিকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর একদিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সে জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। ......এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পঙ্‌ক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার; নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়।" (পথে ও পথের প্রান্তে, ১০ম খণ্ড, ৮৪৪)

বিজ্ঞানের অমিত শক্তির প্রভাবে বিজ্ঞানী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কাছে থেকে নিজেকে অথবা তার সৃষ্টিকে বিচার করতে পারছে না। অহংকারের ভারে আসল সত্যদৃষ্টির বাইরে সরে গেছে। এক পঙ্‌ক্তি সরে দাঁড়ালে হয় তো কিছুটা প্রতীতি জন্মাতে পারে। নইলে বিজ্ঞানের সংকট থেকে বুঝি মুক্তি নেই।

বিজ্ঞান-প্রভাবিত যুগে সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রত্যেক

সাহিত্যকারের রচনার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয় যেমন সহজে স্থান অধিকার করে আছে তেমনটি আর কারোর লেখায় দেখা যায় না। বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে বিজ্ঞানের উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা বিজ্ঞানের চোখে দেখা তথ্য দিয়ে না-দেখা মনের ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে অথবা অসাধারণ উপলব্ধিকে সাধারণ গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

"উত্তাপ যদি সর্বত্র একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে হাওয়া খেলেনা, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়াই পঞ্চত্ব পাওয়া।" (বাউলের গান)

বিজ্ঞানীরা এই একাকার অবস্থাকেই 'থার্মাল্ ডেথ্' আখ্যা দিয়েছেন। জেম্স্ জীন্স্ তাঁর 'মিষ্টিরিয়স য়ুনিভার্স' পুস্তিকাটিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয় প্রথমে বাষ্প ছিল, "পরে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল।... ....সৌরজগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে।" বুদ্ধি, সমাজ ও কাব্যেও যে এই একই পদ্ধতি কাজ করে সেই কথাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন :

"আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথম কতকগুলো বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণীবদ্ধ করা ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পর প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এই নিয়ম খাটে।

(কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন)

বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী পৃথক। বিজ্ঞান সাধারণতঃ বাড়তি কথা বলে না বরং একটি কথায় অনেক কিছু বোঝানোর জন্য নতুন শব্দ চয়ন করে। তা ছাড়া গাণিতিক সংকেত ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ 'কনসেপ্ট'-কে প্রকাশ করা হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞান দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে এবং বিজ্ঞানের সেই সব মহলে প্রবেশ হয়ে পড়ে আয়াসসাধ্য। সাহিত্যকার সেই আয়াস স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বোধগম্য করে বিজ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারে; অন্যথায় সাহিত্যের রসগ্রহণে পারঙ্গম বিজ্ঞানীকে এই দুরূহ অথচ প্রয়োজনীয় কাজে এগিয়ে আসতে

হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দেখতে পাই প্রথমোক্ত পদ্ধতির সফল প্রচেষ্টা। পরিমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। 'বিশ্বপরিচয়'-এর প্রতিটি ছত্র সাহিত্য রসোত্তীর্ণ, আবার বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

"বিজ্ঞান বলে, সূর্যকিরণে অন্ধকার রশ্মিই বিস্তর। আলোক রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম। একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাত্র স্বরূপ।"

(ধর্ম : জড় ও আত্মা)

বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জানা গেল যে দেখা-আলো না-দেখা আলোর তরঙ্গের তুলনায় খুবই কম। অর্থাৎ না-জানা না-দেখা জিনিসের যেন সীমা নেই। ক্রমশঃ বিজ্ঞান এই না-দেখা মহলের খবর জানতে পেরেছে—একদিকে মাইক্রো-ওয়েভ, রেডিও তরঙ্গ, অন্যদিকে গামা রশ্মি, একস্-রে ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও হয়ত বহু না-দেখা তরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়নি। দেখা অংশ বাস্তবিকই 'মুখপাত্র স্বরূপ,' কারণ ঐ না দেখা অংশের গুণাগুণ দেখা অংশেরই মতন।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেণ্ট্রিফ্যুগল'—এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন।" (পাগল)

এখানে 'পাগল' কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। বিবর্তন কাজ করে আপাত এলোমেলো বা লক্ষ্যহীন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ 'পাগলের খামখেয়ালে'। প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার দ্বারা প্রায় আচমকা একটি সুশৃঙ্খল সৃষ্টির সূচনা করে।

দুটির মিলনেই সৃষ্টি এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি কবির ভাষায় কী অনবদ্য হয়েছে :

"সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটির মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়।
পাখীর সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

(মহুয়া, সঞ্চয়িতা, ৬০৪)

কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব উপমার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা সকলেই করে থাকেন।

সাধারণতঃ ক্বচিৎ উপমা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হয়। উপমাটি যদি বিজ্ঞানের সত্যকে লঙ্ঘন করে তাহলে ত্রুটি রয়ে গেল, কিন্তু যদি সেটি সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয় তা হলে ত্রুটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এরকম সামান্য ত্রুটি আছে এমন উপমা সকলের লেখাতেই পাওয়া যায়।

"জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে, তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে, তখনই সে ব্যর্থ হয়, স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনই সে আলোককে আবৃত করে।" (শান্তিনিকেতন, ২৯৯)

বৈজ্ঞানিক বিচারে জল ও বাষ্পের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। বাষ্পই বৃষ্টি হয়ে জলে পরিণত হয়, সুতরাং বাষ্পীভবন ব্যর্থতার নিদর্শন নয়। স্ফীত অবস্থায় অর্থাৎ বাষ্প অবস্থায় জলবিন্দুর স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয় না, আলোককে সে আবৃত করে না, করে বিকিরণ। ফলে আলোক স্তিমিত মনে হয়। এই উপমার ত্রুটি স্পষ্ট লক্ষণীয় নয়, কারণ বক্তব্য বিষয় সাহিত্য রসে ভরা। বলা বাহুল্য যে-কোন উপমাকে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক উপমা, চুল চেরা বিচার করলে কম বেশি ত্রুটি বেরিয়ে পড়বে।

"এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষ পথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে।" (শান্তিনিকেতন, ৩০৬)

নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাযুক্ত কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির আপাত স্থির ও অচঞ্চল অবস্থা আমাদের উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে ঐ 'নিশ্চল অটল' জগতের মধ্যে অনুক্ষণ কী তাণ্ডব বিক্রিয়া চলছে। পৃথিবীতে যে প্রতি মুহূর্তে মহাজাগতিক রশ্মি পড়ছে তা কত ভাঙনের পরিণতি কে জানে। কার 'অটল শাসনে' এই সব ঘটছে বিজ্ঞান সে সম্পর্কে নীরব, যদিও সীমাহীন অজ্ঞতার তীরে বসে কেউ কেউ অদৃশ্য হস্তের কলকাঠি নাড়া সন্দেহ করছেন, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

"..........উদ্ভিদ পশু-পাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।"

(শান্তিনিকেতন, ৩৬৫)

অল্প পরিসরে কোন বস্তুকে যদি চেপে রাখা যায় তা হলে ফোয়ারার সৃষ্টি

হয় এই তথ্য সত্য বটে। বায়বীয় ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এই তথ্যটি খাটে। কিন্তু প্রাণ না বায়বীয় না তরল এবং প্রাণের গতি এখন আর 'ভাইটল্ ফোর্স' বলে স্বীকৃত নয়, নির্ভর করছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর। সেখানে কোন বস্তুর চাপসৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক তেজের আধিক্য ঘটে। এই তেজের সাহায্যে জীবন গঠনের অণুগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাণের প্রবাহসৃষ্টি করে।

পৃথিবীর বিবর্তনের যে পর্যায়ে উদ্ভিদের জন্ম হল সে একটি বিস্ময়কর পরিস্থিতি। সেটি হল প্রাণী জগতের উৎপত্তির শুভ সূচনা। বৃক্ষাদি যে শ্রমসাধ্য উপায়ে মৃত্তিকা থেকে রস সংগ্রহ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীর সর্বত্র শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রাণী জগতের আবির্ভাব সম্ভব করেছে, প্রকৃতির বিজ্ঞানশালায় সে এক পরমাশ্চর্য কীর্তি। সূর্য রশ্মিকে কী ভাবে আহরণ করে সৌর শক্তিকে কী ভাবে কৌশলে আবদ্ধ করে সেই বৃক্ষই মানব জাতিকে যুগ যুগ ধরে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু জুগিয়ে আসছে, সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যই কবি অপূর্ব মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায়; মানবের দূত হয়ে তিনি এই 'মানবের বন্ধু'কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কাব্য-অর্ঘ্য দিয়ে।

"............মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান লিপি লিখি দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রস্তরে প্রস্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।...........

.........."ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী,—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়

ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।"

(বৃক্ষবন্দনা, ২য় খণ্ড, ৮৩৯-৪০)

আম্রবনকে উদ্দেশ করে লেখা কবিতাটিতে ঐ একই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে।

"শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর,
প্রাণরস কর তুমি পান
ওগো, আম্রবন,... ...."

(আম্রবন, ২য় খণ্ড, ৮৪৫)

ভারতবর্ষে পৌরাণিক কাল থেকে নানাবিধ ভেষজ ঔষধের প্রচলন আছে। হতে পারে কত অনামী উদ্ভিদ পণ্ডিতদের গ্রন্থে স্থান পায় নি, কোন কবিও তাদের নিয়ে ছন্দ রচনা করে নি, কিন্তু সে-সব অবজ্ঞা গায়ে না মেখে তারা মানবের উপকার করে যাচ্ছে। তেমনি একটি উপেক্ষিত উদ্ভিদ্ নিয়ে কবি যে-কবিতাটি রচনা করেছেন তাতে যেমন একদিকে পাই ঐ উপেক্ষাজনিত ক্ষোভপ্রকাশ, অন্যদিকে পাই সূর্যরশ্মির সাহায্যে উদ্ভিদ কত রাসায়নিক দ্রব্য মানবহিতার্থে প্রস্তুত করে সেই তথ্যের ইঙ্গিত।

.... "সে-নাম কেবল জানে এক।
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোক বীণায়
স-নামে ঝঙ্কার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ,....... . ...
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি, পড়েছ ধরা তুমিই রবির আদরিণী।"

(কুরচি, ২য় খণ্ড, ৮৪৭)

ভেষজ ঔষধের পুস্তকাদিতে এমন কি সাহিত্যে কুরচির উল্লেখ নেই একথা বলা চলেনা। কবির মনে যতটা উপেক্ষা মনে হয়েছে সম্ভবতঃ ততটা নয়।

সৌরশক্তিই যে বৃক্ষের মধ্যে তেজের সঞ্চার করে এবং সঞ্চয় করে রাখে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি কবি বহু উপলক্ষেই বলেছেন। যেমন,

"হে বালক বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়,
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ।"

(বৃক্ষরোপণ উৎসব, ২য় খণ্ড, ৮৬৬

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র মানুষের তুলনা করলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু কবির মন অন্য সুরে বাঁধা। তাঁর ধারণায় গ্রহতারার গতিপ্রকৃতি নিয়ে গাণিতিক হিসাব বিজ্ঞানের কাজ, কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি মানুষের আত্মিক সম্পর্ক না গড়ে উঠত তা হলে এই বিশ্বসৃষ্টি অহেতুক মনে হত। এই বিষয়টি বহু প্রবন্ধে কবি প্রকাশ করেছেন। কবিতার মধ্যেও ঐ ভাবটি ধরা পড়েছে। যেমন,

"বহুলক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ্‌ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রীকোলাহল,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।"

(প্রাণ, ২য় খণ্ড, ৯৪৩)

কিম্বা,

"হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে-কথা মানবই
সে-সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই

আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা।
যেখানে তুমি ছোট, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদেব হেমন্তের শিশিববিন্দুব সঙ্গে
তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলেব উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানবপথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রাব পথের মুখে—
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চবম বিশ্রামে।"

(সঞ্চয়িতা, ৬৮৪)

এক সময়ে হিন্দুধর্মেব আনুষ্ঠানিক আচার-প্রথাদির বিরুদ্ধ সমালোচনাব শাস্ত্রীয় সদুত্তর দিতে না পেরে কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার নিষ্ফল প্রয়াস করেন। তাঁদের অগভীর জ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণাকে উদ্দেশ্য করে কবিব শ্লেষাত্মক বচনাটি উদ্ধৃত কবা হল।

"পণ্ডিতবীর মুণ্ডিতশির প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে দিবেন ধর্ম দীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ, হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি—
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়, তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—অন্তত গ্যানো-খণ্ড
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস করেছে লণ্ডভণ্ড।"

পদার্থবিদ গ্যানো এবং হেলম্‌হৎস-এর বইগুলো রবীন্দ্রনাথের ভালো করে পড়া ছিল বলে বিদ্যাভূষণের বিদ্যার দৌড় তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই লিখেছেন :

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা বিজ্ঞান কানাকৌড়ি
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা করিছে দৌড়াদৌড়ি ॥

(কল্পনা, ১ম খণ্ড, ৭৩০-৩৯)

আধা-জ্ঞান তিনি কতখানি অপছন্দ করতেন তাবই পরিচয় মেলে এই কবিতাংশ পাঠে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মে বাল্যকাল থেকে। তার সমগ্র রচনার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ের স্থান অকিঞ্চিৎকর নয়। মনে হয় যেন কাব্য সাহিত্যের পাশাপাশি চলছিল তাব বিজ্ঞান আহরণ ও আলোচনা। সেই জন্যেই তাঁব বিজ্ঞান চিন্তার একটি বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সফলতা ও বিফলতাকে ভিত্তি করে। তাঁর বিভিন্ন সময়ের রচনার উদ্ধৃতি থেকে এই বিষয়টি ব্যক্ত করাব চেষ্টা করেছি।

বালক মনের বিস্ময়েব ও কবি মনের আনন্দের যোগান দিয়েছিল প্রকৃতিব অন্তর্নিহিত বহস্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পশুপাখি তরুলতা ফুলফল। এদের সম্পর্কে আরো জানার জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। জানাটা জানাতেই পর্যবসিত হয়নি, জানার মধ্য দিয়ে যে-সংযোগ ঘটে তাঁর রচনায় তার প্রভাব ও প্রকাশ দেখি। ক্রমশ জীবনে চলার পথে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করার চিন্তা তাঁব মনকে নাডা দেয়। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট স্থান তিনি স্বীকার কবেন। বিজ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা অসম্পূর্ণ এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে পোষণ করেন। এই জন্য সাধ্যমত বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ভারতের দারিদ্র্যমোচন বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত অসম্ভব এই প্রতীতি তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা যে, ভারত যে-সত্যসাধনা আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী, জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করতে হলে বৈষয়িক ক্ষেত্রেও ভারতকে সমকক্ষ হতে হবে; বিজ্ঞান সেই উন্নয়নের একমাত্র সোপান। বিজ্ঞানকে দেশের সেবায় নিয়োজিত না করতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিজ্ঞানে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমাদের দেশের অপ্রতুল ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেবল বাহ্য জগতের কর্তৃত্ব নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে মানব মনের প্রতি অবহেলা তাঁকে পীড়া দেয়। পাওয়ার লোভে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের মধ্যে হিংসা ও পশুবৃত্তি জাগ্রত করে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মহাযুদ্ধের ধ্বংসকার্যে বিজ্ঞানের অপব্যবহার কবির মনকে ব্যথিত করে। বিজ্ঞান

যদি কেবল বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি রাখে তার কী পরিণতি হতে পারে তা ভেবে তিনি চিন্তিত হন। এদিকে যে-বিজ্ঞান দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছিল সেখানে ধাক্কা লাগলো অনিশ্চয়তার। মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে ক্ষমতা পেয়ে অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। বিজ্ঞানীর নিজেকে বিচার করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়লো। মনুষ্যত্ব কেবল যে বিজ্ঞানলব্ধ ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এই সত্যটির উপলব্ধি হলো। নজর রাখতে হবে যাতে আধিভৌতিক শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিকে আত্মসাৎ না করে। কবি এই সতর্ক বাণী নানা ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

"প্রকৃতির সঙ্গে এই (আধ্যাত্মিক) যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে। যে-স্পর্শ থেকে (বিজ্ঞানী) মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে।"

(বিশ্বভারতী, ১১শ খণ্ড, ৭৬৪)

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের ৫০ বর্ষের দশম অধিবেশনে (১৯শে আগষ্ট ১৯৭৯) পঠিত।

আচার্য খগেন্দ্রনাথ স্মরণে,

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম এ, বি, এল,

আমার কলেজ জীবনের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্রের শত-বার্ষিক জন্মোৎসবের প্রকাশ্য সভায় আকস্মিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে পারি নাই। সেইজন্য মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এবার সন্তোষবাবু যখন জানাইলেন রবিবাসরের অধিবেশনে শতবার্ষিক জন্মোৎসবের আয়োজন হইতেছে এবং অধ্যাপক মহাশয়ের পরিবারবর্গ সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন তখন আর 'না' করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ এই অনুষ্ঠান তাঁহারই বাস-ভবনে হইতেছে। আমার কলেজ জীবনের প্রথমদিকে তিনি আমার বন্ধু ৺দুলাল মিত্রের মাতামহীর বাড়ি ৬নং বিডন রোর একাংশে বাস করিতেন। উহা আমার বাসগৃহের সন্নিকটে হওয়ায় তাঁহার কাছে আমার যাওয়া আসা ছিল। তাহাতেই ঘনিষ্টতার সুযোগ ঘটে। দর্জ্জিপাড়া ছাড়িয়া তিনি যখন দক্ষিণে বালিগঞ্জ পাড়ায়, প্রথমে ডোভর লেনে, পরে বর্তমান বাসভবনে, চলিয়া আসিলেন তখনও মধ্যে মধ্যে দেখা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু দূরত্বের জন্য ঘন ঘন যাওয়া আসার সম্বন্ধটা রাখিয়া উঠিতে পারি নাই।

তাঁহার বিডন রোর বাসভবন সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী তাঁহার নিকটে শুনিয়া-ছিলাম। তাহা এইখানে বলিয়া রাখি। উত্তর কলিকাতার এক বিখ্যাত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার গৃহও ছিল বিডন রো হইতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভের প্রথমদিকে তিনি আহারাদি সারিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেন এবং বন্ধু ভবনে গাড়ী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের বিশ্রামটা সেইখানে সমাধা করিতেন। অপরাহ্নের পর তিনি গৃহে ফিরিতেন এবং তথায় উপস্থিত রোগীদিগকে দেখিতেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা তাঁহার গৃহে আসিতেন বা টেলিফোন করিতেন বাড়ীর লোকেরা তাঁহাদের বলিয়া দিত কবিরাজ মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। অবশ্য পরে তিনি শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করিয়া তাহা সৎকার্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক রূপেই তিনি তখন পরিচিত। আমি তাঁহার সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই দিতে পারি। ছাত্র হিসাবে আমি যাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম এবং অধ্যাপক হিসাবে তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কিন্তু ততদূর পর্যন্ত ফিরাইয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইলে সেই পর্যায়ের ছাত্র জীবন এবং শিক্ষার পরিবেশের সমগ্র রূপটাই দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। আমাকে ফিরিয়া যাইতে হয় ১৯১৭ সালে—অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বের পটভূমিকায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার সেই পটভূমিকায় এবং নবজাগরণের অভিনব অনুভবের ও ভাব পরিবেশের মধ্যে মন তখন আত্মচেতন হইয়া উঠিতেছে। সেই চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলে আজিকার আলোচনার সহিত সঙ্গত হইত কিন্তু তাহা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়াছিলাম একটা ঘটনাচক্রে। ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটাই একটা স্মরণীয় ঘটনা। সেই সময়ে স্কুল সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষের চতুর্থবার ভাইস চ্যানসেলর রূপে নিয়োগকাল সমাপ্ত হয় এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভাইস চ্যানসেলর নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সালে তাঁহার দ্বিতীয়বারের নিয়োগকাল চলিতেছে। সেই সময় এই স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আউট হওয়ায় সে পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার আয়োজন হয়, সে পরীক্ষাও প্রশ্নপত্র আউট হইয়া যাওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয়বারের পরীক্ষার আয়োজন হয় জুন মাসে। সে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। দুইবার প্রশ্নপত্র আউট হওয়ার ব্যাপার লইয়া তৎকালে যে সকল কথা উঠিয়াছিল এবং ইহা লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে সিনেটে যে সকল অভিযোগ হইয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে। মোট কথা তিন তিনবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ও পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার ক্লেশ আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে শুনিলাম পাস হইয়াছি। আই এ ক্লাসে ভর্তি হইবার জন্য পিতাঠাকুর সংস্কৃত কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত অধ্যাপকের সন্তানেরা দুই টাকা মাহিয়ানায় সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারিত। সেই সুযোগ আমার প্রাপ্য ছিল। সে সময় সংস্কৃত কলেজের দুই দিকে সংলগ্ন হিন্দু স্কুলের একতলা বাড়ী। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ

করিতেছি সেই সময় পাশে হিন্দু স্কুল হইতে পাড়ার বন্ধু শিবু বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই এখানে কী করিতে আসিয়াছিস?" আসিবার উদ্দেশ্য তাহাকে বলিলাম। শিবু আমাকে তাড়া দিয়া বলিল—"যা যা তোকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হ'তে হবে না; তুই স্কলারশিপ পেয়েছিস, প্রেসিডেন্সি কলেজে যা।" বিস্মিত হইয়া বলিলাম "দূর, আমাকে কে স্কলারশিপ দেবে? শিবু স্কুলের অফিসঘর হইতে গেজেট আনিয়া দেখাইল এবং আমাকে কিছুটা তাড়া করিয়াই প্রেসিডেন্সি কলেজে লইয়া গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ অবশ্য সম্মুখে। কিন্তু তখন আমি কলেজ চিনিতাম না। শিবুর তাড়ায় সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে চলিলাম।

তখনকার অবস্থায় কাজটা দুঃসাহসেরই হইয়াছিল। বিশেষতঃ অভিভাবকদের মত লওয়া হয় নাই। কিন্তু ছোটবেলা হইতেই এইরকম একটা দুঃসাহস আমার আছে। বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখে ভয় পাই না। ভর্তি হইবার জন্য কলেজের অফিসে গেলাম। অফিস আমল দিল না। বলিল "দরখাস্ত করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে।" তখন খোঁজখবর লইয়া একেবারে প্রিন্সিপালের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাহেব প্রিন্সিপাল, বেশ প্রশান্ত মূর্তি। (পরে জানিয়াছিলাম Mr. Wordsworth)। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি চাও?' বলিলাম "আমি কলেজে ভর্তি হইতে চাই।" জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি দরখাস্ত করিয়াছিলে?" বলিলাম 'না।' তিনি বলিলেন দরখাস্ত করিবার শেষ তো চলিয়া গিয়াছে, তোমাকে কেমন করিয়া ভর্তি করিব?" বলিলাম, "আমি কেমন করিয়া দরখাস্ত করিব? প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইতে পারিব এমন ভরসা তো আমার ছিল না। এখন গেজেটে দেখিলাম স্কলারদের তালিকায় আমার নাম ছাপা হইয়াছে; তাই ভর্তি হইতে আসিয়াছি।" সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাবা কি করেন?" বলিলাম পণ্ডিত। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "স্কুলের পণ্ডিত না টোলের পণ্ডিত?" বলিলাম 'টোলের পণ্ডিত।' সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন তোমাকে ভর্তি করিতে পারিলে সুখী হইতাম কিন্তু সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন ভর্তি করিতে পারিব না।" অত্যন্ত ভরসা করিয়া আসিয়াছিলাম। মনটা দমিয়া গেল। হয়তো আশাভঙ্গের দুঃখ মুখে ফুটিয়া থাকিবে। মুখ নামাইয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

কলেজের গেট পার হইয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছি, তখনও কলেজের রেলিং

অতিক্রম করি নাই। হঠাৎ পিছন হইতে কেহ আসিয়া আমাকে থামাইল। ফিরিয়া দেখি কলেজের পিয়ন, বলিল, 'চলুন আপনাকে সাহেব ডাকিতেছেন। আপনাকে ধরিবার জন্য আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছি।" তাহার সহিত ফিরিয়া পুনরায় প্রিন্সিপালের নিকট হাজির হইলাম। তিনি বলিলেন "দেখ তোমাকে ফিরাইয়া দিয়া মনটা বড় খারাপ লাগিতেছিল। তোমাকে ভর্তি করিব ঠিক করিয়াছি।" আমার হাতে একখানি পোষ্টকার্ড দিয়া বলিলেন, "দেখ আমার পিয়ন যদি তোমাকে ধরিতে না পারে সেইজন্য তোমার নামে একটি পোষ্টকার্ড আগেই লিখিয়া রাখিয়াছি। এইটি লইয়া যাও, অফিস তোমাকে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিবে।" এখানে বলিয়া রাখি আমার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময়ই তিনি আমার নাম ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন।

কলেজে ভর্তির বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে ফিরিলাম। সমস্যা বাধিল গৃহে। সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি শুনিয়া পিতাঠাকুর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন "এতোখানি আস্পর্দ্ধা হওয়া উচিত নয়। স্কলারশিপ পাইয়াছ ভাল কথা কিন্তু বড জোর স্কটিশ পর্যন্ত যাইতে পার, প্রেসিডেন্সীতে নহে।" আমার অভিমানে আঘাত লাগিল কিন্তু পিতা-ঠাকুর অনুকূল হইলেন না। অবশেষে বাড়ির মহিলারা সহায় হইয়া আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত পিতাঠাকুরও তাহা মানিয়া লইলেন।

তাঁহার আপত্তির সঙ্গত কারণ ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ অভিজাত কলেজ বলিয়া পরিচিত। ধনী এবং নামকরা প্রতিষ্ঠিত বংশের ছেলেরাই প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হইত। আর এক শ্রেণীর ছাত্র ভর্তি হইত মেধার বলে। ইহারা স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছাত্ররা এ কলেজে ভর্তি হইবার কথা ভাবিত না। যথেষ্ট ধনী এবং খুব নামকরা ঘরের না হইলেও যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো তাহারা ভর্তি হইত স্কটিশ চার্চ কলেজে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছাত্ররা যাইত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন কলেজে। সুরেন্দ্রনাথের রিপণ কলেজে বা ব্রাহ্ম সমাজের সিটি কলেজে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাবান হইলেও ছিল একটু পৃথক ধরণের। তাহা সাধারণ কলেজ এলাকার বাইরে।

ঘটনাচক্রে এই অভিজাত কলেজে ভর্তি হইয়া ছাত্র মর্যাদা যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলাম তাহা দৈব বল বলিয়া মনে করি। পরে কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল প্রেসিডেন্সি কলেজকে যে অভিজাত কলেজ বলা হয় তাহার অন্য অর্থ

হওয়া উচিত। অভিজাত শব্দের দ্বারা এখানে বুঝাইবে অর্থসম্পদ বা বংশাভিমান নয়। শব্দটার দ্বারা বুঝাইবে আন্তরিক বা আত্মিক উৎকর্ষ যে অর্থে গীতায় দৈবী সম্পদের অধিকারীকে অভিজাত বলা হইয়াছে। যাহারা দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছেন তাহারাই অভিজাত। আর অভিজাত শব্দ যদি বংশ মর্যাদায় প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে যোগবাশিষ্ঠের ভাষায় "আভিজাত্যম্ উভয় কুলশুদ্ধতা"। যাহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই পরিশুদ্ধ তাহারাই অভিজাত। আত্মিক উৎকর্ষের, ধী শক্তির উৎকর্ষের যে সম্পদ সেই সম্পদের অধিকারী বলিয়াই প্রেসিডেন্সি কলেজ অভিজাত কলেজ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। ইহার ছাত্র সম্পদ, অধ্যাপক সম্পদ, শিক্ষা সম্পদ এবং পরিবেশ সম্পদ সব দিক দিয়াই ইহা অভিজাত। এখানে অর্থ-কৌলীন্য বড় কথা নয়। Intellect বা ধী শক্তিরই প্রাধান্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের আবহাওয়াটাই intellectual আবহাওয়া যাহা স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে মনীষার সৃষ্টি করে। এইজন্য আমার পূর্ববর্তী সুভাষবাবুদের সময়কার অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল জেমস্ প্রেসিডেন্সি কলেজকে বলিতেন "Premier College of the East"। তাঁহার স্বপ্ন ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজকে Oxford-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। উহা হইবে "Oxford of the East."

এ প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত কথার উল্লেখ করিব। এদেশে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম আবির্ভাবের সময় একবার নব্য সমাজতন্ত্রীরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এই নূতন মতের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইতে গিয়াছিলেন। ডাঃ রায় তাহাদের সমস্ত যুক্তিতর্ক শুনিয়া এক কথায় মীমাংসা করিয়া দিলেন। "তোমরা যাহাই বল aristocracy is the elixir of life." প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্বন্ধে এই উক্তিটাই রূপান্তর করিয়া বলা যায়, "Presidency College is the elixir of intellect." আজ যাহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের অভিজাত সম্পদের এই অমৃতভাণ্ড ভাঙ্গিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহারা গীতার ভাষায় আসুরী বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইয়া এই অভিজাত সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলাম এবং তাহা সমস্ত জীবনের অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। ইহা বাহিরের দিকে যতটা সত্য অন্তরের দিকে তাহা অপেক্ষা বেশী সত্য। বস্তুতঃ অন্তরের দিকেই ইহা প্রকৃত সত্য। কলেজ জীবনের প্রথম দিকে যে অধ্যাপক মণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম অধ্যাপক মিত্র তাঁহাদের অন্যতম এবং

তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুশ্রী সুগঠিত আকৃতি প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অপূর্ব বাচনভঙ্গী। তাঁহার অধ্যাপনায় অজ্ঞাত বিষয় আপনিই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিত। সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিল তাঁহার বাচনভঙ্গী। সুমিষ্ট শান্ত ধীরভাবে কথাগুলি বলিতেন। কিন্তু সেই বলার মধ্যে কোথাও একটা শক্তি থাকিত যাহা বলিয়া দিত ইহাই তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে। ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব দেখিয়া মনে হইত সুদক্ষ মণিকারের হাতে মার্জিত হীরকখণ্ডের যেমন সকল মুখ দিয়াই জ্যোতি স্ফুরিত হয় এ ব্যক্তিত্ব সেই রকমই। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সকল দিক দিয়াই যেন আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে আমাদের পড়াইতেন Logic। তাঁহার অধ্যাপনার গুণ ছিল এই—note পড়িবার দিকে মন ঝুঁকিত না। তিনি যে সকল মূল গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন তাহা পড়িবার জন্য উৎসাহিত হইতাম। যতগুলি মূল গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে Dr. Bain-এর লজিকের কথাটা মনে আছে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণ যে এক জায়গায় আসিয়া মিশিয়া যায় পাশ্চাত্য লজিকের মধ্যেও তাহা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য লাগিয়াছিল। I. A পরীক্ষায় Logic এর প্রশ্নপত্রের উত্তর বেশ ভালই দিয়াছিলাম তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষার গুণে। একথা সে সময়ে বোধ করিয়াছিলাম এবং এখনও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার সঙ্গে একই ক্লাশে ভর্তি হইয়াছিল প্রশান্ত হালদার। অধ্যাপক মিত্রের স্ত্রী ছিলেন প্রশান্তর মাতৃস্বসা। ইহাতে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার একটা সূত্র পাইয়াছিলাম। কলেজ জীবনের বাহিরে তাঁহার পরিচয় লাভের আর একটা সূত্র ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকার। আরপুলি লেনে তাহাদের বাস। কায়স্থ সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের সংবাদ সে রাখিত।

যে সময় আমরা কলেজে সেই সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহারই পর কোনো উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে তিনি কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আহুত হন। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীমতিলাল ঘোষ তাহাকে গান গাহিবার অনুরোধ করিলে যে গানটি তিনি গাহিলেন তাহার প্রথম দিকটা মনে আছে—

"যদি স্নেহের ফুলদলে
দলিয়া চরণতলে
গোকুল ছাড়ি কালা যাবে গো"

গান গাহিতেছেন আর দুই চোখ বাহিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। যাহারা দেখিল তাহারা অনুভব করিল গায়কের মন যেন গানের মধ্য দিয়া সাড়া দিতেছে। গানটি নাটোরাধিপতি জগদীন্দ্রনাথ রায়ের রচনা।

সুকণ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। কলেজ জীবনে আর একবার তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন BA. class এ পড়ি। তখনকার উপলক্ষ্য সংস্কৃতের পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রীর বিদায় সম্বর্ধনা। সম্বর্ধনা সভার তিনিই সভাপতি। বিদায় অভিনন্দন রচনা আমার এবং আমিই তাহা পাঠ করিয়াছিলাম। সভার শেষে অনুরোধ করিলাম গান গাহিতে হইবে। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাহিলেন—

"ওগো সুন্দর আজি গৃহে মম পরমোৎসব রাতি
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি।" ইত্যাদি

তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা অসাধারণ স্বাভাবিক মিষ্টতা ছিল, যাহার গুণে গান মধুবর্ষী হইয়া উঠিত।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে তাঁহার কাছে দুই বৎসর পড়িয়াছিলাম। আই এ পরীক্ষার ফলে স্কলারশিপ পুনরায় পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়া তাঁহার ছাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। এবারে লইলাম Philosophy, Philosophyতে Honours. ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ন্যায় IA পরীক্ষাতেও গোলোযোগ হইয়াছিল। সেটা একটা কাহিনীর মত। সে প্রসঙ্গে এখানে যাইতেছি না। কিন্তু তাহার ফলে কে কোন বিষয়ে Honours লইবে তাহার কিছু হেরফের হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত অধ্যাপকেরা আশা করিয়াছিলেন আমি সংস্কৃতে Honours লইব। তাহা না লওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী ক্লাসে প্রকাশ্যে সেই ক্ষোভ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থার গতিকে আমার সংস্কৃত Honours লওয়া সম্ভব হয় নাই, Philosophy-তেই লইয়াছিলাম। অধ্যাপক মিত্র পড়াইতেন Psychology, যাহা বুঝাইতেন ক্লাসে বসিয়াই লিখিয়া লইতাম। সে খাতাগুলি এখনও যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের জীবনে আমার একটি বিশেষ কাজ ছিল বাংলা সাহিত্যের সাধনা। এই দিকদিয়া—বাংলা সাহিত্যের এই চর্চায়—আর একটা নূতন ক্ষেত্রে অধ্যাপক মিত্রের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের বাংলা ভাষার সেমিনারে সভাপতিত্ব করিতেন। সাহিত্য চর্চায়

অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াদিতেন। একদিন Aesthetics সম্বন্ধে আলোচনায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম মনে আছে।—

"পুনঃ পুনর্যন্নবতামুপৈতি—
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ"

বাংলা সাহিত্যের এই চর্চায় কলেজের বিশাল লাইব্রেরীর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। লাইব্রেরীতে বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ ছিল প্রচুর। কলেজে প্রবেশ করিয়াই মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম একেবারে প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা সাহিত্য পড়িয়া শেষ করিব। সাহিত্যচর্চায়, অগ্রসর হইয়া কার্যত তাহা করা হইয়াছিল। প্রথম যুগ হইতে তৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত রবীন্দ্ররচনা আমার অনুশীলনে সমাপ্ত হইয়াছিল। ক্লাসে অবসরের সময় তো পড়িতাম বটেই কলেজ ছুটির পরেও লাইব্রেরীতে থাকিয়া যাইতাম। একা আমার জন্যই Library খোলা থাকিত। অধ্যাপকেরা বলিতেন সাহিত্যের প্রতি তোমার যখন এত ঝোঁক তখন Philosophy না লইয়া Literature-এ Honours লওয়াই তোমার উচিত ছিল।

অধ্যাপক মিত্রের কথা যখন বলিতেছি সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য অধ্যাপকদের কথাও উল্লেখ করিব। অধ্যাপক স্টারলিং—যিনি বিলাতে দীর্ঘ জীবনের শেষে সারা জীবনের সঞ্চয়ের অধিকাংশই প্রেসিডেন্সি কলেজকে দান করিয়া গিয়াছেন; অধ্যাপক আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক হোম, অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী, অধ্যাপক আশুতোষ শাস্ত্রী, অধ্যাপক হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, অধ্যাপক হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহারা প্রধান। অধ্যাপক শ্রীকুমার বাবু তখন নবীন। অধ্যাপক হরিহর বাবুর আমার প্রতি একটা বিশেষ স্নেহ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি এবং পিতাঠাকুর একই টোলের ছাত্র ছিলেন। অধ্যক্ষ Wordswoth এর কথা আগেই বলিয়াছি পরবর্তী অধ্যক্ষ ব্যারো। ইহারাও ক্লাসে পড়াইতেন। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের ব্যক্তিত্বটা মনে বিশেষ ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কলেজ গেটে গাড়ী হইতে নামিয়া ঢিলা পোষাকে সোজা আপনার ঘরে চলিয়া যাইতেন। চারিদিককার লোক চলাচল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহাকে দেখিলে Shakespeare এর King Lear-এর কথা মনে হইত, যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছেন, কোনমতে জীবন-ধারা চলিতেছে। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আখ্যা দিয়াছেন Poet Ghose এবং ইহাও বলিতেন, বাংলাদেশে কবিতা বুঝিতে পারেন এই একজনই আছেন।

এ এক অপূর্ব জ্যোতিষ্ক পরিমণ্ডল। এই বিভিন্ন ভাব সমাবেশের মধ্যে অধ্যাপক মিত্রকে মনে হইত আনন্দময় পুরুষ।

তখনকার কথা মনে করিলে দেখিতে পাই জীবন ও ছাত্র জীবন ছিল পরস্পর পরিব্যাপ্ত। ছাত্রজীবনের বাহিরে জীবনের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। বরং একথা বলা চলে জীবনকে ছাপাইয়া ছাত্রজীবনই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাই ছিল দিবারাত্রির ধ্যান জ্ঞান। পরিপূর্ণ কর্মপ্রয়াস তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ। ইহাই তপস্যা।

অথচ এই তপস্যার ক্ষেত্রেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বিঘ্ন দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সেটা ১৯২১ সালের গোড়ার দিক। তাহার পূর্বেই পাঞ্জাবে—জালিওয়ানওয়ালাবাগে শাসক শক্তির অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিক্ষোভ জাগিয়াছে এবং সেই বিক্ষোভের প্রকাশ ও পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছেন মহাত্মা গান্ধী একা। যে শাসনে এই অত্যাচার সম্ভব হয় এবং যে শাসন শক্তির পরিচালকগণ এই অত্যাচারের সমর্থন করে সে সরকার 'Satanic'। এই সরকার ভাঙিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে যে চারিটি স্তম্ভের উপর সরকার দাঁড়াইয়া আছে সেই স্তম্ভগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইহাই fourfould boycott, ইহাই "অসহযোগ"। এই স্তম্ভগুলির অন্যতম হইল সরকারী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। অতএব সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা অচল করিতে হইবে। এই আন্দোলনে ছাত্রদের কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে গান্ধিজীর উপদেশ শুনিবার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রসভা বসিল। মহাত্মাজীই একমাত্র বক্তা। তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা করিলেন না, কিছুমাত্র উত্তেজনা যোগাইলেন না। শুভ্র উত্তরীয়ে সমাবৃত ধর্মোপদেশ দানরত বুদ্ধমূর্তির মত স্থির নিশ্চলভাবে বসিয়া কেবল দক্ষিণপানির ভঙ্গীতে তিনি আপন বক্তব্য বলিয়া গেলেন। তাঁহার সেই মূর্তি, সেই দৃষ্টি, দক্ষিণপানির সেই ভঙ্গী এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। প্রশান্ত মানুষের মধ্যে কি তেজ থাকিতে পারে এবং শান্ত বাক্যের মধ্যে যে বিদ্যুৎ সঞ্চারণের শক্তি থাকিতে পারে তাহা সেদিন অনুভব করিয়াছিলাম। ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলিলেন, যে সরকার জালিওয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার ঘটাইতে পারে তাহাদের প্রশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদিগকে বর্জন করিতে হইবে। যতদিন না এই সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হয় ততদিন শিক্ষা থাকিবে "in a state of suspended animation." শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া ছাত্ররা করিবে কি তাহার

উত্তরে বলিলেন "They may go abegging in the streets, break stones, go about cleansing the stinking stables of India. But they may not read in these bureacratic. institutions." এ একেবারে চূড়ান্ত কথা। মনে হয়, আজও যেন শুনিতে পাইতেছি। শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল আমাদের মাতা পিতা যদি এই কার্যে সম্মত না হন তো কি করিব? উত্তরে বলিলেন—If it be an alternative between my advice and the advice of your parents, I say follow your parents. But if it is an alternative between the advice of your parents and the dictates of your conscience, I say follow your conscience."—একেবারে সংশয়চ্ছেদী বাক্য। সভার উদ্যোক্তা, ছাত্রনেতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন গান্ধীজীর উপদেশ শুনিয়া তোমরা এখানেই কর্তব্য স্থির করিয়া যাও, তাহার সেই পরামর্শের প্রতিবাদ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন—Disabuse your mind of what this friend has said ইনি যাহা বলিলেন তাহা তোমাদের ভাবিবার দরকার নাই, এখানে আমার কথায় তোমাদিগকে এখনই কিছু স্থির করিতে হইবে না।—"Go home, retire to your closet. Kneel down and Pray to God for light and guidance. If you feel you should come with me, you come." মহাত্মাজীর কথাগুলি বজ্রবাণীর মত মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। সেই আহ্বান প্রত্যেকের মধ্যেই যেন একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগাইয়া দিল। প্রত্যেকেই অনুভব করিতে লাগিল এ আন্দোলন সফল করিবার দায়িত্ব আমারই। এই চিন্তা লইয়াই গৃহে ফিরিলাম।

ইহার পর কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা। সে সভায় উপস্থিতদের মধ্যে একজনের সঙ্গে এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হয় এবং তিনি সেই সভার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি শ্রীশৈবাল গুপ্ত। আমি বলিয়াছিলাম গান্ধীজীর উপদেশ অনুসারেই কাজ করা উচিত। তখন আমাদের B. A পরীক্ষা আসন্ন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিলেন কলেজ ছাড়িব ঠিকই, তবে পরীক্ষাটা যখন আসন্ন তখন উহা শেষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। আমার প্রত্যুত্তর হইল যদি ছাড়িতে হয় মহাত্মাজীর কথামত এখনই ছাড়িতে হইবে। শেষ পর্যন্ত সভাতে তাহাই সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু সভাতে সিদ্ধান্ত করা যত সহজ, কাজ করা তত সহজ নহে। প্রকারান্তরে ইহা জীবনের বিপর্যয়। ছাত্রদের এই উৎসাহে

অধ্যক্ষ ক্ষুব্ধ, অধ্যাপকেরা বিরুদ্ধ মন্তব্যে তৎপর। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্তব্যে মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। সভার পর দেখা হইতেই তিনি বলিলেন—"কি হল? I knew it would all end in foam froth." বলিলাম আমরা তো স্যার ছাড়িতে রাজী, আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসুননা। তিনি বলিলেন—"আমাদের কী আর তোমাদের মত অত সাহস আছে?"

অধ্যাপক মহাশয়েরা কেহ সঙ্গে আসিবেন এ ভরসা লইয়া অগ্রসর হই নাই। কিন্তু নিজে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা হইতে পিছাইতে পারিলাম না। বাহির হইয়াই আসিলাম। আরো চারজন আমার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। আসন্ন B. A পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এতো আগ্রহ লইয়া যেখানে অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলাম সেই কলেজের সহিত সম্পর্ক অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। গৃহে যাঁহার অভিমতের অপেক্ষা না রাখিয়া কলেজ ভর্তি হইয়াছিলাম তাঁহাকেই গিয়া যখন বলিলাম, কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছি, তখনকার অবস্থা অনুমেয় মাত্র। গৃহের পরিপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে সহসা কর্মচ্ছেদের আহ্বান আসিয়া গেল। ইহাই বিধিলিপি।

আন্দোলন লইয়া যে সময়টা খুব ব্যাপৃত সেই সময়ে অধ্যাপক মিত্রের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। কলেজে তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল কলেজ ছাড়ার সঙ্গেই সেই ঘনিষ্ঠতার যোগ আর রহিল না। ইহার অনেক দিন বাদে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাথ ধরিয়া যাইতেছিলাম, বিপরীত দিক হইতে তিনি আসিতেছিলেন। যেখানে মনোমোহন লাইব্রেরীটা ছিল সেইখানে তাঁহার সামনাসামনি আসিয়া পড়িলাম। খালি পায়ে, মাত্র একটি খদ্দরের চাদর গায়ে, চুল অবিন্যস্ত, এইভাবে যাইতেছিলাম। তিনি দুইহাতে ধরিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন, ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"চপলা, এ তোমার কি চেহারা হইয়াছে? তুমি কি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে?" উত্তর দিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

ইহার পর কলেজের ব্যাপারে একবার তাঁহার কাছে প্রার্থী হইয়াছিলাম। তখন তিনি ডোভার লেনের-এর বাড়ীতে। ঘটনাটির একটু বৈচিত্র্য আছে, উল্লেখ করিব। ফরিদপুর হইতে একটি ছাত্র আসিয়াছিল কলিকাতার কলেজে বিজ্ঞান লইয়া পড়িবে। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে সে কোন প্রকারে বুঝাইয়াছিল তাহার এমন প্রতিভা যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া সে প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশ

নাই। অন্য ছোটখাট কলেজে গেলে সে মাটি হইয়া যাইবে। অথচ প্রেসিডেন্সি কলেজে বেতন দিয়া পড়িবার সম্বল তাহার নাই। বন্ধুটি ধরিয়া বসিলেন ইহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ফ্রি ভর্তি করিয়া দিতে হইবে। কলেজের সহিত সম্পর্ক রাখি না, ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার পক্ষে অপরের জন্য প্রার্থী হইতে যাওয়া নিতান্ত সঙ্কোচের কথা। কিন্তু বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজী হইতে হইল। তখন স্মরণ হইল অধ্যাপক মিত্রকে। অনেক দিন পরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলাম। মনে সঙ্কোচ ছিল কিন্তু তিনি যখন স্বচ্ছন্দে আমার অনুরোধ রাখিতে সম্মত হইলেন তখন সে সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি ছাত্রটিকে ফ্রিতে ভর্তি করিবার জন্য তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল ব্যারোর সহিত দেখা করিয়া বলিলেন "I am ıeliably informed this is a very deserving case." তাঁহার সেই কথার উপর freeship মঞ্জুর হইয়া গেল। পরবর্তী সময়ে কিন্তু এই ছাত্রটির মধ্যে পূর্বকথিত সেই প্রতিভার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। এমন কি সাধারণ লেখাপড়াতেও নহে। এবং তৎকালে ছাত্রদের দল পাকাইয়া গোলযোগের নেতৃত্বে ইহার ভূমিকা শোভন ছিল না। অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল একটা ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। প্রিন্সিপাল ব্যারো সেই গোলযোগের মধ্যে ইডেন হোস্টেল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথ হইতে হোস্টেলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বাহির হইবা মাত্র তিনতলা হইতে একটা জলভর্তি কুঁজো নীচে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রায় প্রিন্সিপালের গা ঘেঁষিয়াই কুঁজোটি পড়ে। প্রিন্সিপাল ব্যারো একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "Don't be coward my boy", সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই পরিণতিতে অধ্যাপক মিত্র কি ভাবিয়াছিলেন জানিনা।

ডোভার লেনের বাড়িতে সেই সাক্ষাতের পর তাঁহার সহিত আর কোন যোগ ছিল না। তিনিও কলেজের কাজ হইতে অবসর লইয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগের কাজে যোগ দিয়াছিলেন। সেই কাজে থাকিতে থাকিতেই তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন—প্রথমে কাউন্সিল অফ স্টেট পরে লেজিসলেটিভ এসেম্বলি। এই শেষোক্ত সময়ে মধ্যে মধ্যে কখনও তাহার সহিত সাক্ষাত হইয়াছে। একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল মনোহর পুকুরে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্দিরে গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসবের কীর্তনের আসরে। কীর্তনের প্রসঙ্গে তিনি সিমলার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র তখন গবর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য। সিমলায় তাহার

গৃহে অধ্যাপক মিত্র কীর্তনের জন্য আহুত হন। সেদিনকার আসরে উপস্থিত সকলকার বায়না হইল আজিকার কীর্তনে সকলকে নাচাইতে হইবে। তাহাতেই সম্মত হইয়া তিনি কীর্তন সুরু করেন এবং কীর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে এমন প্রবলভাব সঞ্চার হয় যে সেই ভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে নৃত্য করিতে থাকেন। সে নৃত্যের বেগ এত প্রবল হইয়াছিল যে মনে হইতে লাগিল বাড়ীটা বুঝি কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাঁহার কথা তিনি রাখিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্তীকালের বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আচার্য পর্যায়ের। সারাজীবন দর্শনের অধ্যাপনা করিয়া বাংলা বিভাগের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাঁহার কর্মজীবনের এক অসাধারাণ বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ে আমি তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহি। ইহার আলোচনায় অগ্রসর হইব না। আমি জানি তাঁহার প্রতি শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। শ্যামাপ্রসাদের ঘরেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা হইত। কেবল একটা কথা উল্লেখ করিবার আছে। আমার মনে হইয়াছিল অধ্যাপক মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর নিযুক্ত হইলে সকল দিক দিয়া সঙ্গত হয়। ভাইস চ্যানসেলর নিয়োগের এক পর্যায়ে সে কথা শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াওছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ। শ্যামাপ্রসাদ আমার কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আরে ভাই সে খগেনবাবু কি আর আছেন? অসুস্থ অবস্থাতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি। মনে হইত চোখে মুখে জাজ্বল্যমান সেই অসাধারণ দীপ্তি যেন নিভিয়া আসিয়াছে। তথাপি সেই অবস্থাতেও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করিয়া যখন ফিরিলাম তখন তাঁহার গৃহে রবিবাসরের অধিবেশনে তিনি আমাকে স্নেহ অভিনন্দন ও আশীর্বাদে ধন্য করিয়াছিলেন। সেই কথাটা স্মরণে অক্ষয় হইয়া আছে।

রবিবাসরের সদস্য স্বর্গত রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

রাজশেখর বসু

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রাজশেখর বসু জন্মেছিলেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ; তার জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবিবাসরের উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। না হলেও দুঃখ ছিল না, কারণ লেখকের আসল সম্মান তাঁর গ্রন্থপাঠে। যদি দেখি তাঁর বই পড়ে আজও পাঠকরা খুশী হচ্ছেন এবং পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে তাহলেই বুঝতে হবে লেখক তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার পাচ্ছেন। লেখক জীবিত থাকেন তাঁর রচনায়। শিল্পী যেমন তাঁর শিল্পকর্মে। তাঁদের হাতের কাজই হল জীবনবীমার দীর্ঘমেয়াদী পলিসি, জীবৎকাল অতিক্রম করেও তার ক্রিয়াশীলতা অটুট থাকে। রাজশেখর বসুর সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ তো অব্যাহত আছেই, সম্ভবত তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'হাস্যরসিক পরশুরাম' সম্বন্ধে একটি উপাদেয় গ্রন্থ লিখেছেন। ছেলেমেয়েরা 'পরশুরাম'-কে অবলম্বন করে 'পি-এইচ-ডি'র জন্য গবেষণা গ্রন্থ লিখছে, আরও লিখবে।

রাজশেখরবাবুর প্রতিভার দুটি দিক—একদিকে লঘু, অন্য দিক গুরু। রাজশেখর বসু লেখেন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'চলন্তিকা', 'কুটিরশিল্প', 'ভারতের খনিজ' প্রভৃতি। আর পরশুরামের লেখনীতে প্রকাশ পায় 'গড্ডলিকা,' 'কজ্জলী' 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন জুড়ী হাঁকাতে খুব কম সওয়ারকেই দেখা যায়।

আমার আজকের প্রবন্ধ সাহিত্য-সমালোচনা নয়, তাঁকে কাছের থেকে দেখেছিলাম, তাই দু'কথা বলব।

স্মৃতিচারণের সুবিধে এই যে বলার কথাগুলিকে সময়ের সোপান ধরে পর পর সাজাতে হয় না, যেমন যেমন মনে আসে তেমন তেমন বলা যায়। স্মৃতিকথার কথককে ইতিকথার আইনে আটক পড়তে হয় না।

রাজশেখর বসুর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় ১৯৩৪-এ। তারপর থেকে দীর্ঘ ২৬ বছর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সূত্রেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে ছিলাম। তার আগে 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' বেরিয়ে গেছে। 'গড্ডলিকা' বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন এনেছিল। এই বইটির প্রসঙ্গে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৃত্রিম অভিযোগ এবং কবি কর্তৃক তার অতুলনীয় প্রত্যুত্তর ভোলবার নয়। কবি লিখেছিলেন—"আমি বস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড্ নন। ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" এই খাঁটি খনিজ সোনাকে দেখার সৌভাগ্য হল পরিভাষা সমিতির সভায়। হাসির গল্প লেখককে দেখলাম আর এক রূপে—বৈয়াকরণ এবং আভিধানিকের ভূমিকায়।

রাজশেখর ছিলেন পরিভাষা ও বানান সংস্কার সমিতির সভাপতি। বলা বাহুল্য অবৈতনিক। সমিতির সকল সদস্যই তাই। সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অগ্রণী সদস্যদের মধ্যে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখক ছিলেন সমিতির কনিষ্ঠতম সদস্য।*

১৯৩০ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে যে মাধ্যমরূপ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল সেজন্য রাজশেখর বসুর কাছে আমাদের ঋণ যে কতখানি তা অনেকেই জানেন না। শ্যামাপ্রসাদবাবুর পরিকল্পনাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সার্থক রূপ দেওয়া যে সম্ভব তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে তাঁর পরিচালনায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরিভাষা সুষ্ঠুরূপে সংকলিত এবং সম্পাদিত হল। গ্রন্থকাররা সেই পরিভাষা অবলম্বন করে বাংলায় পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, কনিক, ত্রিকোণমিতি, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেন পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যেই।

পরিভাষা সমিতির সভা বসত সপ্তাহে এক দিন, দ্বারভাঙ্গা বিলডিঙের পূর্বদিকের ছোট একটি ঘরে—এখন সেখানে সাংবাদিকতা বিভাগের অফিস হয়েছে। রাজশেখর বাবুর সময়ানুবর্তিতা ছিল অসাধারণ। নির্দিষ্ট সময়ের দু'চার মিনিট আগে ছাড়া দু'চার মিনিট পরে তাঁকে কখনো আসতে দেখিনি।

---

* (বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই সমিতিতে রাজশেখর, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং বর্তমান লেখক এরা সকলেই রবিবাসরের সদস্য ছিলেন।—স.)

বক্তব্য বিষয়কে সংক্ষেপে বলতেন এবং সরস করে বলতেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অবিজ্ঞানীর বোধগম্য করা যায় কেমন করে তা তিনি জানতেন। সভ্যদের মধ্যে কেউ অবান্তর আলোচনায় অগ্রসর হলে সবিনয়ে এবং সুকৌশলে প্রসঙ্গের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনার অদ্ভুত পারদর্শিতা তাঁর দেখেছি। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে সকল সম্ভাব্য সমস্যার চুলচেরা বিচার করতেন। সকলের মত শ্রদ্ধাসহকারে শুনতেন এবং যা খণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে এবং দৃঢ়তা সহকারে তা খণ্ডন করতেন। পরিভাষা প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলাবোধ মিশ্রিত ছিল।

রাজশেখরবাবু রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. আমরা জানতাম। তিনি যে ওকালতিও পাস করেছিলেন সে কথা জেনেছি অনেক পরে। ওকালতি বিদ্যা তাঁর জীবনে যদি কাজে লেগে থাকে তো সে পরোক্ষ ভাবে। মূলতঃ তিনি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে পণ্ডিত বলেই তাঁকে বিজ্ঞানী বলছি না। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিকের মনোভঙ্গী দিয়ে। নিয়মশৃঙ্খলাকে তিনি এমন ভাবে জীবনের অঙ্গীভূত করেছিলেন যার মধ্যে প্রয়াসের চিহ্ন ছিল না। তাঁর আলমারিতে ফাইলগুলি সাজানো থাকত অনেকটা গ্রন্থাগারিকের রীতি অনুসারে। যখনই যেটার প্রয়োজন সেই মুহূর্তেই সেটা নামিয়ে আনতেন। কখনো হাতড়াতে হত না। কাজ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে তুলে রেখে এসে আসনে বসতেন। পরে তোলা যাবে বলে কখনো কুড়েমি করতে দেখিনি।

রাজশেখরবাবুর আলমারির ফাইলগুলি ছিল বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডার। একদিন তাঁর বাড়িতে গেছি। আমার হাতে শান্তিনিকেতনের তৈরী বাটিকের কাজ করা চামড়ার পোর্টফোলিও ব্যাগ। স্বাধীনতার পর আমরা রেশনের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়েছি কিন্তু তখন এই পোর্টফোলিও ছিল অধ্যাপকের প্রতীক চিহ্ন। শান্তিনিকেতন থেকে এসে কলকাতার কলেজে নোতুন অধ্যাপক হয়েছি। ওটা সঙ্গেই থাকত। রাজশেখরবাবু কৌতূহলী হয়ে ব্যাগটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর রং, নকসা প্রভৃতি দু'একটি বিষয়ে মন্তব্য করে বললেন, "কারুশিল্প হিসেবে জিনিসগুলি ভালোই। কিন্তু সেলাইয়ের ব্যাপারে যান্ত্রিক সাহায্য না নিলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।" বলেই উঠে গিয়ে আলমারি থেকে পুরু পেস্টবোর্ডের একটা ফাইল নামিয়ে এনে টেবিলের উপরে খুলে ফেললেন। দেখলাম তার মধ্যে আছে ঘড়ির ব্যাণ্ডের মত বাঁধন দিয়ে

আটকানো একটা ছুঁচ—যে ধরণের ছুঁচ মুচিরা ব্যবহার করে, অনেকটা সেই ধরণের। আর দু' তিন টুকরো চামড়া—যার খানিকটা সেলাই করা। দেখাতে দেখাতে বললেন, "চামড়ার ব্যাগ কিভাবে সহজে সেলাই করা যায় সে কথা এক সময়ে ভেবেছিলাম। এই ছুঁচটির ডিজাইন আমার। একটি কামার দিয়ে তৈরী করিয়েছি। ব্যাগের ভিতরের ফ্লাপ সেলাইয়ের পক্ষে এটার উপযোগিতা কতখানি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম।" বলতে বলতে ফাইলটি বন্ধ করে আলমারিতে রেখে এলেন।

আর একদিন উঠলো চকোলেটের কথা। আমার ব্রাহ্মণী তখন নিতান্তই নবীনা। পাক প্রণালীতে সন্তরন সবে সুরু করেছেন। তার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছিল একটি বস্তু, জগন্নাথ মন্দিরের আনন্দবাজারে যার জ্ঞাতিভাই দন্তভাঙ্গা নামে পরিচিত। রাজশেখরবাবু ব্যাপারটা শুনে মৃদু হাসলেন। তিনি হাসতেন না এ কথা সত্য নয়, তবে অট্টহাস্য কদাচিৎ করতেন। যা বলছিলাম, যথারীতি ফাইল পাড়লেন এবং কতটা চিনি, কতটা কোকো, কতটা ঘি এবং কতটা গুঁড়ো দুধ কি ভাবে মেশাতে হবে এবং কি রকম আঁচে পাক করতে হবে তার সুন্দর একটি বিবরণ দিয়ে ফাইলটি বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে এলেন। একটি পুনশ্চ যোগ করে বললেন,—চকোলেটের উপকরণ হিসাবে ঘিয়ের বদলে ভেজিটেবল অয়েল চলতে পারে এবং বাজারে সেটাই ব্যবহৃত হয়।

রাজশেখরবাবু যে-ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন তার একাংশে ছিল একটি ছোট ল্যাবরেটরি। একটি ছোট টেবিলের উপরে গ্যাস বার্নার, অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি। অনেক দিন গিয়ে দেখেছি, গ্যাস জ্বালিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করছেন। কোন অতিথি এলে গ্যাস নিবিয়ে এসে বসলেন। কাজের কথা সারতে বেশী সময় লাগত না। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা সে কথা জানতেন। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও যাঁরা উঠতে চাইতেন না তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও কখনো অসৌজন্য প্রকাশ করতে দেখিনি। অসন্তোষটা বোঝা যেত নীরবতায়। কাজ শেষ হয়ে গেলে দর্শনার্থীর কথার জবাবে 'হাঁ' 'না' ছাড়া আর কিছু বলতেন না।

মিতভাষণ প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে মজার কাহিনী কিছু কিছু রটেছিল। এক ভদ্রলোক একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর টেবিলে ফুলস্ক্যাপ সাইজের পিচবোর্ডে আঁটা বড় বড় হাতের অক্ষরে লেখা এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি এমন ভাবে দাঁড় করানো যে কোনো দর্শনার্থী এসে বসলেই তাঁর

নজরে পড়বে। তাতে বড় বড় হস্তাক্ষরে লেখা ছিল—"পেন্‌সিল কাটতে গিয়ে ছুরিতে আঙুলটা একটু কেটেছে। ভাবনার কোনো কারণ নেই।" ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার।

রাজশেখর বাবু বাঁ হাতের একটা আঙুল আইডিন দিয়ে কাপড়ের একটা সরু পটি জড়ানো ছিল। যিনিই আসেন জিগগেস করেন—"আঙুলে ও কি হল?" যদি বলেন "কেটে গেছে", সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন হয় "কেমন করে কাটল?" তার উত্তর "পেনসিল কাটতে গিয়ে কেটেছে।" কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। তখনই অতিথির মুখে দুর্ভাবনার ছায়া নেমে আসবে। শঙ্কিত কণ্ঠে বলবেন—"বেশি কাটেনি তো? জেরায় জেরায় জেরবার হয়ে তিনি স্বকপোল পরিকল্পিত এই অভিনব বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিলেন।

বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞাপনের মধ্যে তফাত খুব কম। একটার অর্থ বিশেষ রূপে জানা, আর একটার অর্থ বিশেষ রূপে জানানো তাঁর চরিত্রে দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার রূপেই তাঁর কর্মজীবন কেটেছে। এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ পত্রের অনেক বিজ্ঞাপন তিনি স্বহস্তে রচনা করেছেন। অনেক ওষুধের নামকরণ করেছেন সংস্কৃতে বা মার্জিত বাংলায়। মনে পড়ছে Rodofen-এর নাম। Rodo অর্থ রদ কিনা দাঁত, আর ফেন হল ফেনা। মানে দাঁড়াল Tooth paste. গতাসু বেঙ্গল কমিক্যাল পুনর্জীবন লাভ করেছে শুনেছি, কিন্তু রদোফেন-এর নাম আর শুনি না। 'অগুরু' 'কস্তুরী'রও কি বানপ্রস্থ ঘটেছে?

গোলদীঘির উত্তরে বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি আঞ্চলিক অফিস ছিল, যে বাড়িতে এখন কফি হাউস সেই বাড়ির পশ্চিম দিকে দোতলায়। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে সিঁড়ির মাঝামাঝি দেওয়ালের কোণে থুথু ও পানের পিচ ফেলে লোকে নোংরা করে। এটা আমাদের স্বভাব। থুথু ফেলার পাত্র রেখে চুন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে কোন ফল হয় না। দেওয়াল চুনকাম করলে সাত দিনের মধ্যেই ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। রাজশেখর ডাকলেন 'নারদ'-কে। 'নারদ'কে আশা করি আপনারা ভোলেন নি। পরশুরামের গল্পগুলি যার দ্বারা শুধু চিত্রিত নয়, বিচিত্রিত হয়েছিল। বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রাজশেখরবাবুর পরামর্শে শিল্পী যতীনবাবু একটি মানুষের ছবি আঁকলেন—যার জামাকাপড় ময়লা নোংরা, হাতে অর্ধদগ্ধ বিড়ি। পানের পিচ ফেলছে দেওয়ালে পিচকারির মতো। ছবির তলায় লেখা—ইস্‌, লোকটা কি নোংরা"। ছবিটা সিঁড়ির মুখে

দুই দেওয়ালের কোণে টাঙিয়ে দেওয়া হল। কাহিনীটি বিস্তৃত করে রাজশেখর বাবু বললেন—"এতে ফল ফলেছিল।" কিন্তু সে ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না তা তিনি নিশ্চয় জানতেন। মনুষ্য চরিত্রের সংস্কার বড় কঠিন কাজ। তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে গেছেন গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া সম্প্রদায়ের বংশ এবং শেয়ারের দাম দ্রুত-বেগে বেড়েই চলেছে। সিদ্ধেশ্বরী আজ আর লিমিটেড নন, একেবারে আনলিমিটেড।

আমার দেখা রাজশেখর

সুপ্রিয় সরকার

আমাদের প্রকাশনা সংস্থা এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯১০সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুদীর্ঘ সত্তর বছরে আমরা বাংলাদেশের বহু মনীষী ও স্বনামধন্য লেখকের বহু প্রশংসিত অনেক রকম গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, তার মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী এবং তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের কথা অনেকেই হয়তো জানেন। কিন্তু যাঁর প্রায় সকল গ্রন্থ একমাত্র আমরাই প্রকাশ করেছি তিনি হলেন রাজশেখর বসু বা পরশুরাম। পরশুরামের প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালে অর্থৎ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল— ৫৪ বছর আগে। আর তাঁর তিরোধান ঘটেছে কুড়ি বছর আগে। এখন তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এই সুদীর্ঘকালে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমেনি বরং আজও তিনি বিশেষ সমাদৃত, বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন বিশেষ সম্মানীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তি।

রাজশেখরের পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা একটি যত্নে কৃত শিল্পকর্মের মত সুদৃশ্য, ও পরিচ্ছন্ন; তাঁর হস্তাক্ষর রবীন্দ্রনাথ কিম্বা শরৎচন্দ্রের মত শিল্পসম্মত ছিল না, তবে তাঁর লেখার প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট, এক মাপের এমনভাবে লেখা যে অতি অল্পশিক্ষিত কম্পোজিটারদেরও পড়তে কোন কষ্ট হত না। যদি লেখার মধ্যে কোথাও কোনো শব্দ পরিবর্তন করতেন তবে নতুন শব্দটি যথাসম্ভব পূর্ব শব্দের মাপের মত দেখেই নির্বাচন করতেন এবং একখণ্ড পৃথক কাগজে লিখে কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এঁটে দিতেন। তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠাই শুধু সম মাপের কাগজে লেখা হত তাই নয় একই রকমের কালীতে লিখতেন আর সে কালীও তিনি নিজের হাতে তৈরি করে নিতেন। আর মোটামুটি প্রতি পৃষ্ঠার অক্ষর সংখ্যাও প্রায় একই রাখতেন যাতে গোটা পাণ্ডুলিপি ছাপলে কত পৃষ্ঠার বই হবে তাও তিনি বলে দিতে পারতেন এবং কার্যত, দেখা যেত, তাঁর কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত। পাণ্ডুলিপি রচনাকালেই তা বই আকারে ছাপবার সময় কি ভাবে কোথায় কতটা ফাঁক দিয়ে কম্পোজ করতে হবে

তারও নকশা দেখিয়ে দিতেন। তাঁর গড্ডলিকা, কজ্জলী ও হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি চিত্রিত গ্রন্থের কোথায় কোন চিত্রটি বসবে তার সব কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজে সুস্পষ্ট নির্দেশ লিখে দিতেন। রাজশেখর নিজে ছবি আঁকতেও জানতেন এবং তাঁর গ্রন্থের ছবিগুলি তাঁরই নির্দেশক্রমে তাঁর আবাল্য বন্ধু এবং পরে বেঙ্গল কেমিক্যালের সহকর্মী চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন আঁকতেন। যতীনবাবুর আঁকা বাংলা অক্ষরের অপূর্ব শ্রী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ ছাঁদের অক্ষর অঙ্কনেও রাজশেখরের প্রভাব ছিল বলে মনে হয়। তা ছাড়া বাংলা লাইনো হরফ সৃষ্টিতেও যতীন্দ্রকুমার রাজশেখরের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তা করেছিলেন।

পরিচ্ছন্ন মার্জিত শ্রুতিসুখকর এবং বিশেষ অর্থবহ ভাষাতেই তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনও রাজশেখর অনেকবার লিখে দিয়েছেন।

রাজশেখর আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, এজন্য শুধুমাত্র প্রকাশক হিসাবে না দেখে মনে হত তিনি আমাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন। তবে তাঁর ব্যবহারে কিন্তু কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতো না। তিনি ছিলেন অতি রাশভারি প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু খুব কাছে গেলে বোঝা যেত, অফুরন্ত রসের ধারা ফল্গু প্রবাহের মতোই তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে রঙ্গরসের অভাব ঘটতো না।

১৯৪০ থেকে ১৯৬০ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু দিন পর্যন্ত আমি তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। বই ছাপা এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে তাঁর কাছে আমাকে প্রায়ই যেতে হোতো। এই কুড়ি বছরের বিভিন্ন ঘটনা যা আমার সামনে ঘটেছে তার কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি—এর থেকে রাজশেখরের আর একটি দিক বোঝা যাবে।

একবার তিনি আমাদের বাড়িশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমার বাবা স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার তখনও বেঁচে। আহারান্তে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আমরা সকলে গল্প করছি, এমন সময় আমার স্ত্রী রাজশেখরের পোষা অগুণতি বিড়ালের মধ্য হতে একটি হৃষ্টপুষ্ট সাদা বিড়ালকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এটির নাম কি? তিনি তক্ষুণি প্রশ্নের জবাবে আমাদের দেশের এক অতি বিখ্যাত চিত্রতারকার নাম করলেন। তিনি গম্ভীর হয়েই রইলেন কিন্তু তাঁর জবাব শুনে আর সবাই হেসে কুটিকুটি।

আর একদিন গেছি তাঁর ওখানে। টেবিলের ওপর একটি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ

পত্র পড়ে আছে। আমাকে দেখেই বললেন, 'দেখো সুপ্রিয়, শ্রাদ্ধের চিঠিতে ভাগ্যহীন লেখা থাকে কেন বলো তো!' আমার তো মুখে কোনো কথা নেই। তিনি বলে চললেন, 'বাবা-মা কোনো-না কোনো দিন সকলেরই মারা যায়, তাই বলে আমরা কি সকলেই ভাগ্যহীন?' তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, তাছাড়া বাবা-মা মারা গেলে তো পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহলে 'ভাগ্যহীন' না হয়ে তো 'ভাগ্যবান' হওয়া উচিত।'

একদিন টেলিফোন বেজে উঠলো। রাজশেখর টেলিফোন ধরে বললেন, না, এটা কবরেজ মশায়ের বাড়ি নয়। টেলিফোন নামিয়েই নাতনী আশার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলে দিলেই হোতো আমি কবরেজ মশাই বলছি।—ঠেসে দই খান।' আসলে কবিরাজী শাস্ত্রে নাকি দই খাওয়া একদম বারণ।

আর একটি কথা এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল। রাজশেখর অনেকগুলি সংবাদপত্র বিনামূল্যে পেতেন। এই সংবাদপত্রগুলি ওজনে বিক্রি করে যা টাকা পেতেন বছরের শেষে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে তা দেখাতেন তাঁর রোজগার হিসাবে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আলমারি থেকে গীতার একখানি পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সেই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় নির্দেশ ছিলো—এই বই ছাপা হবে না। কারণ হিসাবে জানা যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভাই গিরীন্দ্রশেখরও একটি গীতা অনুবাদ করছিলেন। সেটা জানতে পেরে রাজশেখর গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করে আলমারিতে তুলে রাখলেন। এটি করেছিলেন যাতে গিরীন্দ্রশেখরের গ্রন্থটির প্রচারের কোন অসুবিধা না হয়। পাণ্ডুলিপিটি যখন আমার হাতে এলো তখন রাজশেখর এবং গিরীন্দ্রশেখর কেউই আর ইহজগতে নেই—সেই জন্যে রাজশেখরের আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি নিয়েই গ্রন্থটি প্রকাশ করি। বই হয়ে বেরোবার আগে গ্রন্থটির 'ভূমিকা' অমৃত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সৌম্যদর্শন, মিতবাক, পোষাক পরিচ্ছদে খাঁটি বাঙালী হলেও জীবন যাপনের সকল বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। ব্যবহারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও তাঁর মন বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতো। এজন্য তিনি নিজের হাতে শেলাইয়ের জন্য নতুন রকমের সূচ তৈরী করেছিলেন। বই বাঁধাইয়ের বিষয়েও তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা ছিল।

রাজশেখর ভুরি ভুরি লেখেননি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র

একুশখানি, কিন্তু যখনই যা লিখতেন খুব যত্ন করে লিখতেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থের উপরেই ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। একজন বিখ্যাত লেখক কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে একবার বলেছিলেন, আপনার বই তো খুব বেশী নয়। উত্তরে রাজশেখর বলেছিলেন, 'কম কি, তা তিন কেজি হবে।'

যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা থাকবে ততদিন পরশুরাম থাকবেন, থাকবেন রাজশেখর বসু।

পরশুরাম-রাজশেখর

হরপ্রসাদ মিত্র

যে বর্মে আবৃত থেকে না হেসে, হাসিয়ে—
গিয়েছ এ বঙ্গভূমি আনন্দে ভাসিয়ে,
সে বর্ম হয়তো সেই গলাবন্ধ কোট—
হয়তো যতীন্দ্র সেন-তুমি মিলে জোট।
চিত্রে ও কথায় আজও স্বাদু অনুভবে
কে বলেছে চলে গেছ, নেই তুমি ভবে ?

লঘু-গুরু, খনিজ ও বিচিত্র বস্তুতে
জন্মশতবৎসরেও পার্থিব তন্তুতে—

রয়েছো রসিক-মনে হে পরশুরাম
কথামৃতের প্রায় প্রাণের আরাম!
গড্ডলিকা, সিদ্ধেশ্বরী, বিরিঞ্চিবাবারা,
কৃষ্ণকলি, ভূষণ্ডী বা আহা নীলতারা,
রামকথা, গীতা, মহাভারতানুবাদ আদি—
কিমাশ্চর্য সাবলীল! হবে না তামাদি।

রাজশেখর বসু

মনোরঞ্জন গুপ্ত

(ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের পুত্র বেঙ্গল কেমিক্যালের চীফ্ কেমিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বর্গত মনোরঞ্জন গুপ্ত রবিবাসরের সদস্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ ৩৬ বৎসর তিনি রাজশেখর বসুর নিকট-সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমি অনুরোধ করেছিলাম রবিবাসরের প্রাক্তন সদস্য রাজশেখর সম্পর্কে লিখতে। তিনি আমার অনুরোধে নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি রচনা করে আশাপূর্ণা দেবীর গৃহে অনুষ্ঠিত একটি রবিবাসরে আমায় জানিয়েছিলেন, পরবর্তী অধিবেশনেই প্রবন্ধটি পাঠের ব্যবস্থা করতে। তদনুযায়ী চিঠিও ছাপিয়েছিলাম, কিন্তু হায়, এই পক্ষকালের মধ্যেই সেই অভাবনীয় অঘটন ঘটল! অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী মনোরঞ্জন প্রোস্টেট গ্লাণ্ড অপারেশান করাতে মেডিক্যাল কলেজে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। প্রবন্ধটি তখন ১৩৭১ সালের পূজাসংখ্যা 'সংহতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প পরিসরে রাজশেখরের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় আর কোথাও চোখে পড়েনি, প্রবন্ধটি তাই এবার রাজশেখর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবিবাসরে আবার পাঠ ও প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক।)

আপনারা আমার কাছে চেয়েছেন রাজশেখর বসুর জীবনকথা। আপনারা সাহিত্যসেবী। তাঁর সাহিত্য জীবনের কথাই আপনারা হয়তো বেশি প্রত্যাশা করবেন। কিন্তু রাজশেখরের সাহিত্যজীবন আজও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি। বিশেষত আমার চিত্তে তিনি কেবল সাহিত্যিকরূপে আসন পাতেন নি। তবু তাঁকে যেমন দেখেছিলাম, তাঁকে যেমন জানতাম তাই আপনাদের কাছে বলব। তার ফলে প্রচলিত জীবনী আপনারা পাবেন না। এ কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার মনে করলাম।

রাজশেখর বসু বাঙালা দেশে বিখ্যাত নাম। জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি রাসায়নিক, অন্তরে তিনি শিল্পী। তাঁর জীবনের এই দুইদিক তাঁকে এমন জ্ঞানবান অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল করেছিল যে, এ দেশের সর্বক্ষেত্রের মানুষ, তাঁর উপদেশ যত চাইতেন এমন আর কারো নয়।

প্রারম্ভ কথা

এই মানুষটিকে ১৯২৪ হতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩৬ বৎসর খুব কাছ হতে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল,—তাঁর কর্মজীবনে, তাঁর সাহিত্য-সেবায় ও তাঁর দৈনন্দিন জীবন ধারায়। স্বল্প পরিসরের এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাঁর বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। প্রথমে তাঁর জীবন-দেউলের একটা রেখা টেনে নেব। তার পর যাব সেই দেউল-দর্শনে।

জীবন-কথার পরিক্রমা

বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তাঁর জন্ম হয়। এঁরা চার ভাই। শশীশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরিন্দ্রশেখর। এঁদের পৈতৃক বাড়ী নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে উলা বীরনগরে। সেখানে এখনও পূর্বপুরুষদের আমলের বিস্তীর্ণ পাকাবাড়ী আছে।

পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন দারভাঙ্গারাজের ম্যানেজার। সেখানেই তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন। সেকালের অন্যতম বাঙালী সাহিত্যিকরূপে তাঁর নাম ছিল। বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে চন্দ্রশেখরেরও জীবনকথা সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়।

দারভাঙ্গার রাজস্কুলেই রাজশেখরের স্কুলের পড়া শেষ হয়েছিল। ওখান হতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা কলেজে এসে তিনি এফ. এ. পড়তেন। এফ. এ. পাশ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলেন বি. এ. ও এম. এ. বি কোর্সের। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিলেন। আর এম. এ.-তে হলেন রসায়নে প্রথম। সে হ'ল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর পরে উনি আইন-পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু আইন, কোর্ট, মামলা ওঁর ভালো লাগেনি।

ইতিমধ্যে পিতা চন্দ্রশেখর ১৪ নম্বর পার্শিবাগান লেনে একটি বাড়ী করেন। কাছেই ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকতেন এবং সেখানেই তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালের কারবার শুরু হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর পুত্র রাজশেখরকে এনে প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে দিলেন, বল্লেন, "দেখবেন, ছেলেটা যেন খেতে পায়।"

রাজশেখর নিজেই ঔষধ বানাতেন; অনেক সময় নিজ হাতে তা বেচতেন। সোরা গন্ধক প্রভৃতি নিজ হাতে ওজন করে খুচরাও বেচতেন। ক্রমে এই মানুষটি এত দক্ষ হলেন যে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ম্যানেজার হয়ে গেলেন। ১৯০২ হতে ১৯০৭ পর্যন্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন ডঃ কার্তিকচন্দ্র বসু। তারপর আরও দু'বছর ডাঃ বসু বি. কে. পালের পুত্র ভূতনাথ পালের সঙ্গে যুক্ত ভাবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। এর পর ম্যানেজিং এজেন্সি পদ্ধতি উঠে যায়। তখন হতে রাজশেখরের উপরই পড়ে কোম্পানীর অধিকাংশ দায়িত্ব।

রাজশেখর সম্বন্ধে আচার্য রায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "শীঘ্রই রাজশেখর জমাখরচ রাখা, খদ্দেরদের সঙ্গে কারবার করা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের সুন্দর

সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের যন্ত্রাদি প্রবর্তন ও রক্ষণ—সব তাতেই সমান দক্ষ হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া লেবেল আঁকা ও একাল অনুযায়ী বিজ্ঞাপন লেখার কাজে তার বিশেষ গুণ দেখা গেল।"

(তর্জমাকৃত)

রাজশেখর নিজে কাজের মানুষ হলেন, আর তারি সাথে দেখা গেল তাঁর আর এক অসাধারণ দক্ষতা। তিনি নূতন নূতন কাজের মানুষ গড়ে তুলতে থাকলেন। তাঁদের কাজ শেখাতেন, কাজে উৎসাহ দিতেন এবং সঙ্গত পথ দেখিয়ে এমন করে তাঁদের জাগিয়ে দিতেন যে, তাঁদের অনেকে নানাভাবে বহু কাজ করেছিলেন। তাই তো তাঁর আমলে কোম্পানীটির দিন দিন অত উন্নতি হয়েছিল।

রাজশেখর ম্যানেজার ছিলেন ৩০ বৎসর; তারপর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে এই পদ হতে অবসর নেন। কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল ৫৭ বৎসর—যতদিন না মৃত্যু এসে তাঁকে এই ধরা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় —১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিলের দুপুর বেলা।

পটলডাঙ্গার দে পরিবারের কন্যা বিবাহ করেছিলেন রাজশেখর। 'শুশ্রূষা' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রণেতা ডাঃ শ্যামাচরণ দে হলেন দাদাশ্বশুর। কবি বিষ্ণু দে এই পরিবারেরই মানুষ। স্ত্রীর নাম মৃণালিনী। তাঁদের একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—কন্যা প্রতিমা। রাজশেখরের যখন বয়স ৫৪, কর্মক্ষেত্রে ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন ললাটে জয়তিলক, তখন প্রতিমার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। দুরারোগ্য ব্যাধিতে প্রতিমার স্বামী রাসায়নিক অমর পালিতের মৃত্যু হয় ১৯৩৪ সনে। এই মৃত্যুর একঘণ্টা পরে দেখা যায় প্রতিমার হার্টফেল হয়েছে। এঁদের দেহ একসঙ্গেই সৎকার করা হয়েছিল। এঁরা রেখে গিয়েছিলেন এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রটি ছিল জন্মাবধি বোধশক্তিহীন। এই দু'টি শিশু রাজশেখরের সংসারে চলে আসে। নাতিটি প্রায় ৫০ বৎসর বেঁচেছিল। নাতনীটি তাঁর স্বামীপুত্র সহ হয়েছিল রাজশেখরের শেষ জীবনের সহবাসী। কারণ রাজশেখরের সহধর্মিনীরও অনেক বৎসর আগে (১৯৪২) মৃত্যু হয়েছিল। সে মৃত্যুও এসেছিল অকস্মাৎ। একদিন রাত্রি প্রভাতে দেখা গেল, তিনি নিশ্চল শুয়ে আছেন, জীবন নেই, তাঁর জামার নীচে বুকের উপর পাওয়া গিয়েছিল রাজশেখরের একটি ফটো।

রাজশেখরের আমলে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল, সারা ভারতে ঔষধের ব্যবসায়ীরা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়েছিল—এসব আমরা জানি। কিন্তু

পরবর্তী জীবনে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন সাহিত্যিক রূপে এবং সাহিত্যিক প্রতিভাই তাঁকে এদেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে প্রিয়তর করেছিল।

রাজশেখরের প্রথম বই ছাপা হয়েছিল—নাম 'গড্ডলিকা'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। তখন তাঁর বয়স ৪২ বৎসর। এরপর তাঁর বই কেমন প্রকাশিত হত তার সনওয়ারী তালিকা দিচ্ছি। এই সনওয়ারী তালিকা পরে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যবহার কর্তে হবে।

	প্রথম প্রকাশ কাল বঙ্গাব্দ	বইএর নাম
	১৩৩২	গড্ডলিকা
	১৩৩৫	কজ্জলী
	১৩৩৭	চলন্তিকা
	১৩৪৪	হনুমানের স্বপ্ন
	১৩৪৬	লঘুগুরু
	১৩৫০	ভারতের খনিজ
	”	কুটীর শিল্প
	”	কালিদাসের মেঘদূত
	১৩৫৩	রামায়ণ
	১৩৫৬	মহাভারত
	১৩৫৭	গল্পকল্প
	”	হিতোপদেশের গল্প
	১৩৫৯	ধুস্তরীমায়া
	১৩৬০	কৃষ্ণকলি
	১৩৬২	বিচিন্তা
	১৩৬৩	নীলতারা
	১৩৬৪	আনন্দীবাঈ
	১৩৬৫	চলচ্চিন্তা
	১৩৬৬	চমৎকুমারী
মৃত্যুর পর প্রকাশিত	১৩৬৭	পরশুরামের কবিতা
	১৩৬৮	শ্রীমদভাগবত্ গীতা

রাজশেখরের (পরশুরামের) জীবিত কালে প্রকাশিত ১৯ খানা বই-এর মধ্যে ৯ খানা হল গল্পের বই, একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান, ৪টি সংস্কৃত বই-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, তিনটি প্রবন্ধ ও দু'টি বিজ্ঞান-ঘেঁষা বই।

রাজশেখর হলেন বাংলা লাইনো-টাইপের অন্যতম স্রষ্টা। উনি সাহিত্য পরিষদের দুর্দিনে তাঁর সম্পাদক হয়েছিলেন, জগত্তারিণী ও সরোজিনী পদক পেয়েছিলেন। তিনি অনেক পরিভাষা সমিতির সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্র-পুরস্কার ও একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন, পদ্মভূষণও হয়েছিলেন। তিনি রবিবাসরেরও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এসব হল রাজশেখরের জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বহিরঙ্গ বিবরণ।

আমরা তাঁকে যেমন দেখেছিলাম, তাই এখন বলব। সেই বলার মধ্যে অন্য মানুষের সাথে ক্ষণে ক্ষণে আমাকে দেখা যাবে, কিছু উপায় নেই। মার্জ্জনা করবেন।

বিজ্ঞানী রাজশেখর

তিনি বেঁচেছিলেন ৮০ বৎসর। ২৩ বৎসর বয়সে বেঙ্গল কেমিক্যালে এসেছিলেন; অচিরে ম্যানেজার হয়েছিলেন। ত্রিশ বছর চাকুরি করার পর উপদেষ্টা হয়ে থাকেন বছর পাঁচেক। তারপর ছিলেন ডিরেক্টর। কেবল নামে ডিরেক্টর নন—তিন চারটি সাবকমিটির সভ্য। এই ভাবে ৫৭ বৎসর তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে ছিলেন। তার বিবরণ এড়িয়ে গেলে রাজশেখরের জীবন কথা বলা হবে না। কিন্তু তা বলতে হলে বিজ্ঞানের কথা অন্ততঃ একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হবে। সে কথা সহজ করেই বলছি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার কারখানার মধ্যে একটা বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। তিনি সেখান হতে সকালে ১০৷ টা নাগাদ কারখানায় তাঁর আপিসে এসে একটু বসতেন। তারপরই শহরের আপিসে চলে যেতেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমার বয়স তখন ২৩ পূর্ণ হয়েছে; পারফিউমারী বিভাগের ভার পেয়েছি। তখনও ম্যানেজার রাজশেখরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। দূর হতে তাঁকে চিনতাম। আমাকে চাকুরিতে নিয়েছিলেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। রাজশেখর হতে বেগুনি কালীতে লেখা নোট পেতাম। রা, ব, বলে স্বাক্ষর করতেন। দেখতাম স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখায় স্পষ্ট উপদেশ বা অকুণ্ঠ সম্মতি আসত।

এই সময়ই তাঁর নিজের ফরমূলায় তৈরী বেগুনি কালীতে লেখা স্বাক্ষরের একটি গল্প শুনেছিলাম। লয়েড ব্যাঙ্ক একবার তাঁর স্বাক্ষরিত চেকে টাকা দেয়নি। একসঙ্গে তিনখানা চেক ফিরে এলে বড়সাহেবকে তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, রবার স্ট্যাম্প তো স্বাক্ষর নয়। তাতে কি করে টাকা

দেই ? পরদিন রাজশেখর সাহেবের সম্মুখে বসে নিজের বেগুনি কালির কলমে তিনটি স্বাক্ষর করেন। প্রত্যেকটির হরফ এক ছাঁদে ও আয়তনে। সাহেব বলেন, wonderful এবং ক্ষমা চান।

এই wonderful মানুষটির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মনে সাধ হল। আমি সাহিত্যিকের ছেলে, তিনি গড্ডলিকা বইতে তখন সারা বাঙালায় নাম করেছেন। ভগবান আমার সে আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ করলেন।

কোন খবর না দিয়ে রাজশেখর সহসা একদিন বেলা ১০৷টায় আমার বিভাগে চলে এলেন। বললেন, 'দেখি আপনার ল্যাভেণ্ডার অয়েল' ? তাঁর পরনে তখন ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি ও কোট, পায়ে কালো এলবার্ট সু, ফর্সা প্রিয়দর্শন মূর্তি।

ল্যাভেণ্ডার অয়েলের পাঁচ পাউণ্ড বোতল বার করলাম। বোতলটি ব্রাউন রঙের। ঐ বোতলেই জার্মানী হতে আসত। উনি বললেন, ঢালুন দেখি কাচের মেজার গ্লাসে, রঙ দেখব।

রঙ দেখে বললেন, "এতো খুব হালকা straw colour. আমি অনেক দিন আগে—আপনি আসার আগে—সাদা stoppered শিশিতে এখান হতে Lavender oil নিয়েছিলাম। stopper হতে দুফোঁটা Lavender oil আজ বেরুবার সময় সাদা জামায় লাগিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে এটা সেটা লাগাই ! দেখলাম, spot হল। তাই দেখতে এলাম, নতুন মাল কেমন।"

এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি ভাবতে থাকলাম, Lavender oil এর রঙ কি আলো লেগে ঘোর হয়েছে ? যদি আলো লেগে ঘোর হয়ে যায়, তবে ল্যাভেণ্ডার ঘটিত Handkerchief perfume-এর রংও ঘোর হতে পারে এবং তা হতে জামাকাপড় শাড়ীতে দাগ হবে। ক্রেতারা চটে যাবেন। রাজশেখরের এই আলোচনা হতে যেন একটা ইঙ্গিত পেলাম।

আমি পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। Parryর Essential Oil এবং Sawer-এর Odorographia পড়লাম। কাউকে কিছু বললাম না। ব্রাউন বোতলে essential oil রাখা স্থির করলাম। মাঝে মাঝে দরকার মতো বোতল বিভাগে বড় ব্রাউন বোতল চেয়ে পাঠাতাম। তাঁরা কথাটা রাজশেখরের কানে তুলেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, ঠিকই হচ্ছে।

এরপর মাঝে মাঝে বাড়ী হতে বেরিয়েই আমার কাছে সোজা চলে আসতেন। দুই এক মিনিটের মতো থাকতেন, কোন কাজের কথা বলতেন—

হাসিমুখ, প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। একদিনে বললেন, "আধ পাউণ্ড Tragacanth Mucilage করে রাখবেন, কাল সকালে এসে দেখব।" Tragacanth mucilage ঠিক মতো করায় অভিজ্ঞতা দরকার। অনেক সময় প্রথমেই এক বারে করা যায় না, থিত্ থাকে। তাই ভয় হল। বই পড়ে যতটা পারি পদ্ধতি শিখলাম এবং এক বারেই জিনিসটি সুন্দর তৈরী হল। তিনি পরদিন ১০টায় এসে দেখলেন। বললেন, "এক বারেই হয়েছে? কিছু তো দানা বা অসমান নেই। বাঃ বেশ হয়েছে!" আমি বুঝলাম, জিনিস তৈরী করার নানারূপ পদ্ধতি উনি আমাকে শেখাচ্ছেন।

Tragacanth হল কতিলা আঠা। মধ্য প্রাচ্যে এর জন্ম। আয়ুর্বেদে এর ব্যবহার আছে। এই ভাবে এই বস্তুটির প্রকৃতি আমার জানা হয়েছিল বলেই ১৪ বছর পর এই বস্তুটির সঙ্গে ট্যানিক এসিড মিলিয়ে Tannolep তৈরী করেছিলাম। এ হল পোড়ার ঔষধ—লাগালে ফোস্কা পড়ে না। যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট ৬ লক্ষ টাকার Tannolep কিনেছিলেন।

কয়দিন পরে, একটি ছোট শিশি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আধ গ্রেণ করে ২০টি পুরিয়া করে দেবেন। এই কথা বলে উনি চলে গেলেন। শিশিতে লেবেল দেখলাম—Luminal Poison.

এ হল ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এ জিনিসের নাম শুনিনি। ক্রিয়াও জানি না। খুব যত্ন করে chemical balance-এ ওজন করে ২০টি পুরিয়া করে দিলাম। পরে Luminal সম্বন্ধীয় Literature পড়ে দেখেছিলাম, এই ঔষধ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ব্যথা কমিয়ে দেয়। তিনি এটি দিতেন বোধশক্তিহীন সেই নাতিকে। এর মাত্রা কিছু বেশি হলে জীবন সংশয় হবার কথা। তখন মনে হল, রাজশেখর আমাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। সেই বিশ্বাসের ভরসায় আমি আমার বিভাগের উন্নতি বিধানে অগ্রসর হলাম।

সংসারের বিবিধ গন্ধ বস্তুর বিশ্লেষণ ও যোগকরণের কাজ সহজ পথে আমাকে শিখিয়ে দিলেন। তারই ফলে বিদেশী যৌগিক অটোগুলির অনুকরণে গোলাপ, লিলি, জেসমিন, হায়াসিন্থ প্রভৃতি অটোগুলি তৈরী করলাম।

এদের গন্ধ হল চমৎকার, স্থায়ীও হল খুব বেশি সময়, খরচও পড়ল কম। সব দেখে বিচার করে রাজশেখর বিদেশী আমদানি বন্ধ করে দিলেন।

নূতন নূতন গন্ধতৈল, এসেন্স, সাবান, ক্রিম, পাউডার প্রভৃতি পর পর তৈরী হতে লাগল—Golden Amla Hair oil, Golden Sandal Soap,

প্রভৃতি। এ সব কাজের পরামর্শ, উৎসাহ রাজশেখর থেকে ঘন ঘন পেতাম এবং তারি ফলে আমার সকল কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল।

কেমন করে তিনি সহকারী সৃষ্টি করে নিতেন, তারি এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হবে বিবেচনায় নিজেকে সরাতে পারিনি। এজন্য মার্জনা চাইছি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের, রাজশেখরের আমার কাছে লেখা একটা নোট রাখছি।

এই লেখা হতে দেখবেন, তিনি কেমন করে আমাদের চালাতেন বন্ধুর মতো, প্রিয়জনের মতো, কত উৎসাহ, কত প্রীতি তাঁর কথায়। বেঙ্গল কেমিক্যালে আছে বিরাট টেক্‌নিক্যাল লাইব্রেরী। তিনি সব পড়েছিলেন, সব জানতেন, হাতে কলমে করে দেখেছিলেন। বক্তৃতা করে শেখাতেন না, তাঁর ইঙ্গিত পেলেই শেখা সহজ হত। শিখতে পারলে তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই ছিল পরম পুরস্কার।

শিল্পী রাজশেখর

এই নোটটির হস্তলিপির সুবিধা নিয়ে তাঁর হাতের লেখা সম্বন্ধীয় কথা এখানে বলে নিচ্ছি। প্রতিটি অক্ষরে বিশেষত্ব দেখতে পাবেন। ছ, ঠ, ক, ব, যা ইচ্ছা, নজর করে দেখুন। এমন স্পষ্ট, এক আয়তনের ও ছাঁদের হরফওয়ালা হাতের লেখা দেখা যায় না আজকাল।

রাজশেখর অনেক কাজে গ্রাফ কাগজ ব্যবহার করতেন; হরফের ছাঁদ দেখতেন, অক্ষর বিন্যাস বোঝাতেন, ছাপাখানাকে লাইনের অবস্থান দেখাতেন, কবিতা লিখতে অক্ষর গুণতেন। কোন বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কি যুক্তি আছে তা খতিয়ে দেখার জন্য গ্রাফ কাগজে পয়েন্টগুলি সাজাতেন এবং তা হতেই কর্তব্য নির্ধারণ করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারতকোষ'এর জন্য যারা লিখবেন তাঁদের লেখার আয়তন পূর্ব নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য তিনি গ্রাফ কাগজ ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। খবর পাচ্ছি, এখন রাশিয়াতে সবাই সব সময় গ্রাফ-কাগজ ব্যবহার করে, স্কুলকলেজ লেখা-পড়ার চর্চায় তো বটেই—চিঠি লেখাতেও।

তাঁর 'কালিদাসের মেঘদূত' লেখা হয়েছিল যখন মাণিকতলার কারখানায় থাকতেন। ছাপা হয়েছিল অন্ততঃ ১০ বছর পর। এই বইএর পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি—নিজের হাতের তৈরী খাতায়, নিজের তৈরী কালো কালিতে লেখা। আরো অনেকে এই পাণ্ডুলিপি দেখেছেন। আমি অমন সুন্দর পাণ্ডুলিপি দেখে বলেছিলাম এই-ই আগাগোড়া ব্লক করে ছাপা হোক্।

তিনি বললেন, 'থাক্, অহঙ্কার প্রকাশ পাবে।' পাছে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, এই ভয় ছিল তার চিরকালের। তাই সভাসমিতিতে যেতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখরকে ডক্টরেট উপাধি দিলেন,

৭/১২/৩৬

মনোরঞ্জনবাবু

আপনি কেশ সাবানের যে নমুনা পাঠিয়েছেন তা ভাল হয়েছে। শুঁকলে ঠিক বোঝা যায় না। গায়ে মাখলে জানা যায়। দিন-পনর পরে জানা যাবে গন্ধটা ঠিক আছে কিনা।

বোরোলেপের যে নমুনা করেছেন তার গন্ধ খুব ভাল। বাড়াবার দরকার নেই। কিন্তু আপনার Petroleum Jelly ভাল নয়, কেরোসিনের গন্ধ পাচ্ছি। যদি Paraffin Oil P.B. + Hard paraffin দিয়ে করেন তবে কেরোসিনের গন্ধ হবে না। আপনার নমুনা একটু বেশি নরম মনে হচ্ছে। ঈষৎ শক্ত করলে ভাল হবে।

রাজশেখর বসু

তিনি উপস্থিত হলেন না। অতি অল্প কয়েকটি সাহিত্যসভায় তিনি গিয়েছিলেন, তার সংখ্যা হাতে গোণা যায়।* পরিভাষা সমিতি ইত্যাদির বৈঠক তাঁর ফরাস-পাতা বৈঠকখানায়ই বসত।

*'রবিবাসর' সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে তিনি সদস্য হয়েছিলেন এবং সেখানে লিখিত প্রবন্ধও পড়েছেন।—স.

তাঁর ইংরাজী লেখাও সুন্দর। u n, r, i ইত্যাদি প্রায় এমন জড়িয়ে যায় যে, সেই পথে ছাপাখানার ভুলের সম্ভাবনা ঘটে। তারা টাইপ করা কপি পেলে খুশী হন। কিন্তু রাজশেখরের ইংরাজী হরফ হতে কোন গোল হত না, এত সুন্দর তার ছাঁদ।

আমাদের এক সহকর্মীকে হাতের লেখা ভালো করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। এঁর হাতের লেখা বোঝা শক্ত ছিল। অথচ এঁর বাংলা ভাষায় লেখা স্মারক লিপির উপর রাজশেখরকে নির্দেশ লিখতে হত। বাংলা ভাষায় স্মারকলিপি লেখার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। এইরূপ একটি স্মারক-লিপি তাঁর কাছে গেলে, তিনি সঠিক পড়তে পারলেন না। তখন তাঁর সেই বেগুনি কালীতে তিনি কাগজটির ধার দিয়ে লিখলেন, "চতুর্দিক ঘুরাইয়া পড়িলাম,·কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রা. ব.।"

আমার সহকর্মী প্রমাদ গণলেন। নিজে সাহস করে রাজশেখরের কাছে গেলেন না। রাজশেখরের মন নরম করার জন্য আর একজনকে পাঠালেন। রাজশেখর স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'ওঁকে অভয় দিন। কয়েকদিন বাঙ্গালা ইংরাজী কপিবুক মক্স করতে বলুন, তবেই ঠিক হয়ে যাবে।' ঠিকও হয়ে গেল। ছয় মাসেই তাঁর হাতের লেখা হল স্পষ্ট ও সুন্দর।

রাজশেখর সুন্দর নক্সা করতে পারতেন ইঞ্জিনিয়ারিং নানা রকম ডিজাইন—বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি, ছবি, বিজ্ঞাপনের অক্ষর ও বিন্যাস। রাজশেখরের বিজ্ঞাপন লেখার দক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীসন্তোষকুমার দে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছেন, বহু উদাহরণ উদ্ধার করেছেন। রাজশেখর Modern Reviewতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন Tube well প্রচলনের জন্য। ঘনীভূত তৈল রান্নায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করে উনি প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের প্রবন্ধ আর তিনি লেখেননি। 'দেশীয় ঔষধ' নাম দিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে যে পুস্তক তিনি লিখে দিয়েছিলেন তা আজও সেখানে আদর্শ হয়ে আছে। কিছু কিছু বিজ্ঞাপন লেখা আমাদের শিখিয়েছিলেন। তার কতক আজও চলছে।

রাজশেখর নিজের বই-এর ছবি নিজেই স্কেচ করতেন, আর তা হতে যতীন সেন মহাশয় সুদক্ষ হাতে ছবি এঁকে দিতেন। দারভাঙা হতেই যতীনবাবু আজীবন তাঁর সহযোগী বন্ধু ছিলেন। যতীনবাবু কিছু ছোট, রাজশেখরকে মেজদা বলতেন। কারণ তিনি তাঁর ছোট ভাইদের মেজদা।

তাঁদের ১৪ নম্বর পার্শিবাগানের বাড়ীতে একটা সাহিত্য বৈঠকে এঁরা মিলিত

হতেন। ঔষধ, মানুষ, বই প্রভৃতির নামকরণে রাজশেখর ওস্তাদ। এঁরা তাঁর কাছেই বৈঠকের নাম চাইলেন। উৎকট+কেন্দ্র, নাম হল 'উৎকেন্দ্র'। এখানে জলধর সেন, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন লাহা, রঙ্গীন হালদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, যতীন সেন, রাজশেখর বসুরা চার ভাই—আরও অনেকে আসতেন। এঁরা সব স্ব স্ব ক্ষেত্রের লেখা পড়তেন, আলোচনা করতেন, কখনও কখনও নিজ নিজ লেখা ও ছবি আঁকার বিষয় বস্তু এখানে পেয়ে যেতেন।

এখানে প্রচুর অশ্লীল গল্প হত। গিরীন্দ্রশেখর সর্বকনিষ্ঠ। তিনি বড় ভাইয়ের সামনেই অসংকোচে কামবিষয়ক গল্প বলতেন। ভাইদের মধ্যে বড় হলেন শশীশেখর। তিনি ছোট ভাই রাজশেখরকে একদিন লুকিয়ে দেড় খানা সিগারেট খাইয়েছিলেন। তখন রাজশেখরের বয়স ১২ বছর। জিবে জ্বালা হয়েছিল রাজশেখরের। সেই হতে তিনি আর সিগারেট খাননি। ভাইদের মধ্যে খুব সহযোগ ও অসংকোচ মেলামেশা ছিল। এই বৈঠকে বড় ছিলেন জলধর সেন। তাঁকে সবাই সমীহ করতেন। কিন্তু তিনি কানে ভালো শুনতেন না। রাজশেখর নিজে কামবিষয়ক গল্প করতেন না, কিন্তু গম্ভীর মুখে স্থির হয়ে শুনতেন। কেউ যেন না মনে করেন যে, কেবল কামবিষয়ক গল্পই এখানে হ'ত। কেন এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হ'ল তা পরে বলব।

গিরীন্দ্রশেখরের 'পুরাণ প্রবেশ' বইটি মৌলিক গবেষণার ফল। এই সভায়ই সে গবেষণার সূত্রপাত, পরিণতি ও প্রকাশ। রাজশেখরের গড্ডলিকার গল্পগুলি এখানেই একে একে পাঠ করা হয়েছিল। জলধর সেন তা কেড়ে নিয়ে গিয়ে 'ভারতবর্ষে' ছাপিয়ে দেন। সেগুলি একত্র করে ব্রজেনবাবু ছেপে দেন। প্রুফও তিনিই দেখেন। রাজশেখর নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি। তিনি আমায় বলেছিলেন—"বাড়ীতে আসত এক সেকরা। তার নাম পরশুরাম। যতীনরা বলল, এই নামই বেশ হবে। তাই দেওয়া হল।' আমরা এই সাহিত্যিক সেকরার গড়া যে সব অলঙ্কার পেয়েছি তার এমন নয়নমনের তৃপ্তিকর প্যাটার্ণ যে, আশা হয়, আমাদের নাতিনাতনীরাও তা ভাঙতে চাইবে না।

রাজশেখরের সাহিত্য জীবনের এই প্রথম উন্মেষেই রবীন্দ্রনাথ তাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। এই সম্পর্কে আচার্য রায় রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাও রাজশেখরের প্রশংসার নামান্তর। দুই-ই গড্ডলিকা বই-এর প্রচারের জন্য কাজে লেগেছিল।

রাজশেখর তাঁর ম্যানেজারীর আমলেই বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরির একটা

নিয়মাবলী করেছিলেন। তাতে ছিল যে ৫৫ বৎসরে বয়সে চাকরি শেষ হবে, অথবা তার আগেই যদি কার্যকাল ৩০ বৎসর পূর্ণ হয় তবে অবসর নিতে হবে। এই ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল বলেই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর নেন কিন্তু উপদেষ্টা রূপে নিযুক্ত থাকেন। কোথায় দেখেছি, কেউ লিখেছেন, তাঁর জামাইয়ের অকালমৃত্যুতে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। একথা ঠিক নয়। কারণ তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর অবসর নেবার কিছুদিন পর।

তিনি ম্যানেজারী ছাড়ার দুই বছর আগে তাঁর বাঙলা ভাষার সংক্ষিপ্ত অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি স্বনামেই এটি প্রকাশ করেন। তিনি যখন ম্যানেজারী চাকরি ছেড়ে সুকিয়া ষ্ট্রিটের ভাড়া বাড়ীতে উঠে যান তখন 'চলন্তিকা'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ করছেন। খগেন মিত্র, কৃষ্ণদয়াল বসু, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি পর পর বিভিন্ন সময়ে চলন্তিকার সংস্করণগুলিব জন্য তার কাছে কাজ করতেন। কেউ কেউ এজন্য মাসোয়ারা পেতেন বলে শুনেছি।

এইরূপ মাসোয়ারা দেওয়া উনি খুব পছন্দ করতেন। সাহিত্যিকদের হাতে নগদ টাকা আসে, তা তাঁর কাম্য ছিল। রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ করার সময় তাঁর কাছে আসতেন পণ্ডিত অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিও মাসোয়ারা পেতেন। কিন্তু এঁদের প্রত্যেককে তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন। ১৩৪১ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামপ্রাণ স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। রাজশেখরের পরামর্শে দাতারা যে সর্ত দিয়েছিলেন, তাতে পদক দেবার কথা নেই—সুদের টাকা গবেষকটি নগদ, বই বা অন্য আকারে নিতে পারেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারীর পর তাঁর সময়ের সবটাই সাহিত্যে শুধু নিয়োজিত হত না। বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্য কাজ সারাজীবনই তাঁর হাতে—কখনও বেশী, কখনও কম—ছিলই। শীতকালে উনি স্বচ্ছন্দে লিখতেন, গরমকালে কম লিখতেন। এবার পূর্বদত্ত সনওয়ারী তালিকার সাহায্যে কিছু আলোচনা করব।

'চলন্তিকা' প্রকাশের পর তিনি ৩০ বৎসর বেঁচেছিলেন। ত্রিশ বৎসরে তাঁর ১৫ খানা বই প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর দুইটি বই ছাপা হয়েছে। বইগুলির আয়তন বড় নয়। অনেকগুলির নানা সংস্করণ হয়েছে। কিন্তু সবই গল্প নক্সার বই। তাঁর 'মেঘদূত' উৎকৃষ্ট বই। তাঁর 'ভারতীয় খনিজ' ও 'কুটীর শিল্প' অতি মূল্যবান প্রামাণ্য বই। এসব বিশ্বভারতীর ছাপা, মাত্র আট

আনা করে দাম। এখন হতে ২১ বৎসর আগে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই তিনটি ছাপা হয়েছিল। এসব বই ৫০০ বা ১০০০ ছাপা হয়, চারু ভট্টাচার্য বলেছিলেন। আজও তা নিঃশেষ হয়নি। রাজশেখরের লেখা অমন উৎকৃষ্ট বই কেন বাঙালী পড়ে না, তা সন্ধানের বিষয়। অথচ ঘনঘন এর বিজ্ঞাপন বিশ্বভারতী দিয়ে থাকেন।

তবে কী লিখে রাজশেখর বাঙালী পাঠকের এত প্রিয় হলেন? 'চলন্তিকা'র খুব প্রচার। খুব বিজ্ঞানসম্মত এর বিন্যাস। কিন্তু অভিধানে তাঁর খ্যাতি এত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে যায়নি, যত ছড়িয়েছে তাঁর কৌতুক-গল্পের বিচিত্রতায়।

এই বিচিত্রতায় কি কি আছে তার আলোচনা করছি। সংসারের সবরকম মানুষ—ধনী, দরিদ্র, জমিদার, শিক্ষক, কুলী, মজুর, মিস্ত্রি, দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, স্ত্রী-পুরুষ, প্রাচীনা-নবীনা প্রভৃতি সবাই তাঁর পাত্র পাত্রী। সবারই মধ্যে ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য আছে। এই লেখকের সকলের প্রতিই মমতা ও সহানুভূতি। অত্যন্ত শালীন সহজ ভাষা ও ভাব। প্রতি বাক্যের ক্রিয়াপদ সুন্দর ও সহজে দ্রুতপদে চলে আসে। বক্তব্য সহজে পাঠকের গোচর হয়। যে সব রসে সাহিত্য লেখা হয়ে ওঠে সাহিত্য, সে সব রস তাঁর লেখায় প্রচুর।

একদিন একজন ডাক্তার—যিনি রাজশেখরের বাড়ীতে প্রায় বিশ বৎসর মাঝে মাঝে চিকিৎসা করতেন—তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন তো নানা রসের মধ্যে কোন রসটি ওঁর লেখায় বেশী আকর্ষণীয়? আমি উত্তর দিলাম না। তিনি বললেন, "এই মানুষটি আচারে ব্যবহারে আহারে দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত সংযমী। কিন্তু এই গম্ভীর মানুষটির মনে শৃঙ্গার রস প্রবল। তাই পাশ কাটিয়ে গেলেও, আকারে ইঙ্গিতে প্রতীকে নানা লেখায় তার প্রসঙ্গ এসে যায়। বাঙ্গালী পাঠক এ প্রসঙ্গ ভালোবাসে, উনি জানেন। তাই যখন তিনি দেখলেন, এ ঢঙের লেখা বেশ কাটে তখন ব্যবসায় বুদ্ধিশালী রাজশেখর তাঁর সংক্ষিপ্ত রামায়ণে বিশেষ করে সেই স্থানগুলি বাদ দেন নি—বরং বেশী করে লিখেছেন সেই সব স্থান—যেখানে যৌন-প্রসঙ্গ আছে।"

ডাক্তাররা মনোবিজ্ঞানে অনেক সময় পারদর্শী হন। রাজশেখরের ছোট ভাই ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। গিরীন্দ্রশেখররা যে পাগলের হাসপাতাল চালাতেন তা তো রাজশেখরেরই নিজের 'লুম্বিনী নামক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। ওটি রাজশেখর দান করেছিলেন। রাজশেখর নিজেও মনোবিজ্ঞানে দক্ষ হয়েছিলেন।

রাজশেখরের এই চিকিৎসকের বক্তব্য বা thesis সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাজ্য বলে মনে হল না। বিহারে নাচনেওয়ালীদের একটা গান আছে—'এদেরিয়ারে চোরী গিয়া'। অর্থাৎ কলসী রাখার বিড়ে চুরি গেছে। আর একটা উর্দ্দু গান আছে—'ছোট্টা সে বলদ্দ মেরে আঙ্গনা মে গিল্লি খেলে।' অর্থাৎ ছোট্ট আমার দেবর আঙিনায় মার্বেল খেলে—যে খেলায় আঙিনায় খৈলের পকেট থাকে। এই একটি লাইনই সে-সব-দেশে শ্রোতাদের উল্লাসের পক্ষে যথেষ্ট। নাচনে-ওয়ালীটি মহালাস্যে নেচে নেচে লাইনটি বলে এবং শ্রোতাদের তারিফের ধ্বনি উঠে। এখানে ঐ বিড়ে ও পকেট হল স্ত্রীঅঙ্গের প্রতীক। তাই এত আনন্দ উল্লাস। গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' বই-এ এই সব প্রতীক নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। ফ্রয়েডের বইতে হিউমার সম্বন্ধেও একটি অধ্যায় আছে। এই ভাবে ধরলে রাজশেখরের বইতে অনেক 'আকার ইঙ্গিতে' প্রতীক্ আছে, যা হতে কামলীলা ও কামযন্ত্রের স্মৃতি অবচেতন মনে ভেসে আসতে পারে।

রাজশেখর যখন রামায়ণ লেখেন তখন আমি তাঁর চাহিদা অনুযায়ী বহু বই যোগাতাম। উঁনি হেম ভট্টাচার্যের অনুবাদ বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। যে যজ্ঞের ফলে রামেরা কয় ভাই জন্মালেন সেই যজ্ঞের অংশটি লেখার সময় তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের 'যজ্ঞকথা' নিয়েছিলেন। তারপর সে অংশ লেখা হলে পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এই অংশে খানিকটা মূল তুলেছেন এবং তার সহজ তর্জমা দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ রাখতে চেয়েছিলেন যে, যজ্ঞের ঘোড়ার পুরুষাঙ্গ রাণীর স্ত্রীঅঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয়েছিল। এই অংশটি আমাকে পড়ে বুঝিয়ে দেবার সময় তাঁকে খানিকটা উদ্বেলিত দেখেছিলাম।

তাঁর রামায়ণের ভূমিকার একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। তাঁর রামায়ণ পড়লে যে অনেক কামলীলার কথা জানা যাবে, তা ভূমিকায় নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। রাজশেখরের সারা জীবনে ছিল বুদ্ধির কারুকার্য। একেবারে বিজ্ঞানীর যুক্তিবাদী জীবন। তিনি সকল কাজে এই বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এবং পরম কৌশলে।

তাঁর রামায়ণের বহু পাঠক হল। রাজশেখর খুব উৎসাহ বোধ করলেন। তিন বৎসর পর প্রকাশিত হল রাজশেখরের অনূদিত সংক্ষিপ্ত মহাভারত। তাঁর রামায়ণে অনুসৃত পদ্ধতি তিনি এখানেও প্রয়োগ করেছেন। এ বইও বিক্রি হয়েছে খুব। তার পর ৯ বছরে তিনি ৯টি বই লিখেছেন—তার মধ্যে বিচিন্তা

ও চলচ্চিন্তা হল পুরাতন-প্রবন্ধ-সংগ্রহ, বাকি ৭টি হল কৌতুক গল্পের বই। 'ভারতীয় খনিজ' ও 'কুটীর শিল্প'-জাতীয় বিজ্ঞান ঘেঁষা বা শিল্প বিষয়ক বই আর উনি লেখেন নি। অথচ এইরূপ প্রামাণ্য তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলা বই লেখায় তাঁর মতো যোগ্য লোক এ দেশে আর কেউ ছিল না বলে আমাদের ধারণা।

আমাদের এই সব কথা হতে কেউ যেন না মনে করেন যে, তাঁর সব গল্পেই শৃঙ্গার রস আছে। তবু তাঁর ভাক্তার যে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে মনে হওয়াতেই অতি সংক্ষেপে সে আলোচনা করা হল।

আমাদের মনে হয়, রাজশেখর শালীন রসজ্ঞ সাহিত্যিক এবং তাঁর শৃঙ্গার প্রসঙ্গ কেবল কামালোচনার জন্যই নয়। নানা গল্পে ও নক্সায় তিনি তার বেড়া ডিঙিয়ে উঁচু জাতে উঠে গিয়েছিলেন। যে যুক্তিতে মূল রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতিতে যৌনপ্রসঙ্গ আছে সেই যুক্তিতেই পণ্ডিত রাজশেখর সংক্ষিপ্ত রামায়ণে ও মহাভারতে যৌনপ্রসঙ্গ বেশি করে রেখে দিয়েছেন, বলা যেতে পারে।

রাজশেখরের জীবনের প্ল্যান

রাজশেখরের আমলে যাঁরা শিল্পব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাদের অনেকে তাঁর পরামর্শ নিতে আসতেন। সাহিত্যিকরাও তাঁর স্পর্শ চাইতেন। সকালে এলে একতলায় তার পড়ার ঘরে, বিকালে এলে তার ফরাসপাতা ঘরে আগন্তুকরা বসতেন। কোন কোন দিন বেশি পরিচিতদের তাঁর দোতালার বারান্দায়, শোয়ার ঘরে বা পড়ার ঘরে ডেকে নিতেন। তাঁর বাড়ির একতলার বারান্দায় দেওয়ালে একটা বিজ্ঞপ্তি লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন—

"বেলা ১০টা হতে ৩টা পর্যন্ত
দেখা করতে অসমর্থ"

কিন্তু ম্যানেজারী চাকরি ছাড়ার পরই আমাকে বলে দিয়েছিলেন, এই নোটিস আমার জন্য প্রযোজ্য নয়।

একদিন দুপুর বেলা ছুটোয় তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। ভৃত্য বলল, বাবু পড়ার ঘরের মধ্যেই আছেন। দেখলাম, ৩টি দরজাই ভেতর হতে বন্ধ। করিডোরের দরজা ঠেলতেই তা খুলে গেল। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তামাকের ধোঁয়ায় ভর্তি। উনি জানালার কাছে একটা পাত্রে কী পোড়াচ্ছেন। তখন তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর। বললেন, "তামাক পাতা পোড়াচ্ছি, মনোরঞ্জনবাবু। নিকোটিনিক এসিড পাবো। সেই বিষে আমার পেছনের বাগানের পোকা মারব।" তাঁর

একটা ছোট ল্যাবরেটরি ও মিস্ত্রিখানা ছিল। মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু কাজ করতেন।

তিনি অনেক বছর ধরেই Blood pressureএর রোগী ছিলেন। নিরামিষ পছন্দ করতেন বালককাল হতেই। বকুল বাগানের বাড়িতে দুপুরে মাছভাজা খেতেও দেখেছি কখনও। শেষে আর খেতেন না। আহারের পরিমাণ ছিল খুব কম। দুধ বা দুগ্ধজাত কিছু প্রত্যহ অনেকটা খেতেন। ঔষধ খেতেন না বেশি। শেষ জীবনে বলতেন, "ভালোই আছি—কিছুদিন পায়খানা হচ্ছে না তেমন। ক্রমশ এজন্য বেশি কষ্ট হচ্ছে। আগে ২টি কাঁচালঙ্কা খেয়ে নিতাম চিবিয়ে। Irritationএ বেরিয়ে যেত। এখন সোনামুখী চালাচ্ছি। Griping নিবারণের জন্য কালোজিরা গুঁড়িয়ে নি। এই দেখুন কেমন বড়ি করেছি।" এতে ফল হত না শেষাশেষি। তখন রাতে অনেকটা ইসবগুল খেতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজশেখর অবস্থা অনুসারে বুদ্ধি খাটিয়ে Plan এর পর Plan চালাচ্ছেন। ডাক্তার ড'কেন নিজের জন্য কচিৎ। এমনি করেই কর্মক্ষম ছিলেন প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত।

নিজের কাজ নিজের হাতেই করতেন প্রায় শেষ বয়স অবধি। জুতার ব্রাশ দিয়ে টেবিল ঝাড়তেন, Fountain Pen নিজেই মেরামত করতেন। লেখার কালি নিজেই বানাতেন, চিঠির কাগজ ও কার্ডে ঠিকানা নিজেই ছাপতেন। লেখার খাতা ও File নিজেই বানাতেন। দাড়ি কামিয়ে ব্লেড রৌদ্রে দিতেন, Dropper-এর জল দিয়ে চিঠির টিকিট ভেজাতেন। কুশন হতে আলপিন তোলার জন্য বাঁ-হাতের তর্জনীর নখ বড় রাখতেন। তাঁর কাছে-আসা-খাম উল্টে দিয়ে নিজেই আবার ব্যবহার করতেন। প্রত্যহের বিস্তারিত জমা খরচ লিখতেন, স্নান আহার নিদ্রা প্রাতঃকৃত্য সব নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় করতেন। পিঠ সোজা করে বসতে চেষ্টা করতেন, সভায় গেলে একবারে স্থির হয়ে বসে থাকতেন। শেষ বয়সে ক্যানভাসের নরম জুতায় চলতেন, নিজের হাতে সেলাই করা ছাই রঙের ক্যানভাসের পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ ব্যবহার করতেন। কেউ এলে উঠে গিয়ে তখুনি ফ্যান খুলে দিতেন। যে কাগজখানায় জড়িয়ে তাঁকে তাঁর ফরমাস মতো বই পাঠাতাম উনি ঠিক সেই কাগজের উল্টা পীঠে জড়িয়ে সে-বই সেই সুতায় বেঁধে ফেরৎ পাঠাতেন। নিজের বইএর বিজ্ঞাপন নিজেই লিখতেন। বাড়ির চাকরবাকরকে হাঁক ডাক করতেন না—নিঃশব্দে নির্দেশ দিতেন। সব দেখে মনে হ'ত—এই একটা জীবন, যার প্রতিটি কাজ

পূর্বে চিন্তা করে করা হয়েছে এবং যাঁর প্রতিটি ক্ষণ পূর্বের চিন্তা অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বেলা ১-২০ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে। উনি একতলায় তাঁর সকালের পড়ার ঘরে তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ওখান হতে বেলা ২টায় বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার-সাব-কমিটির সভায় রওনা হবার কথা। কোম্পানীর ড্রাইভার ওসমান গাড়ি এনে তাঁকে অভ্যাস মতো ডেকেছিল। সাড়া পায়নি। তখন রাজশেখরের এক ভৃত্যও সেখানে চলে আসে। তখন তারা রাজশেখরের নাতনী আশা বসুকে ডেকে আনে। তারপর ডাক্তার এসে দেখে, রাজশেখরের মৃত্যু হয়েছে। কোন যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। সংসারের রথে আর সেদিন চড়লেন না, সেই জগতে চলে গেলেন যেখানে সংসারের রথ পৌঁছায় না।

রাজশেখর সারা জীবন চলেছিল plan করে। মৃত্যুতেও দেখলাম তাই-ই চলেছে। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে প্রথমে ওখানে পৌঁছান চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারপর আমি, তারপর সত্যপ্রসন্ন সেন। আমরা দেখলাম, তিনি লিখিত নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, 'বলহরি হরিবোল' যেন শববাহীরা না বলে। কেওড়াতলায় চুল্লীতে যেন পোড়ান হয়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে, একে একে লোক আসতে থাকল। তারপরে এল জন-সমুদ্র ও রাশি রাশি ফুল। বেঙ্গল কেমিক্যালের ব্যবস্থায় ও গুণমুগ্ধদের সমাবেশে তাঁর শেষকৃত্য হল। রাজশেখরের ডাক নাম ছিল ফটিক। ফটিক অর্থ স্বচ্ছ নির্মল। সংসারের স্বচ্ছ নির্মল মানুষ দুর্লভ। বহুজনের কাছে তিনি সেই দুর্লভ মানুষ।

প্ল্যান ছাড়া তিনি এক পা নড়তেন না। তাঁর চিন্তা বিচার সবই একবারে ছক-কাটা। এতে কাজের ভারি সুবিধা, ভুল হবার সম্ভাবনা কম। তাঁর ৭২ নম্বর বকুল বাগান রোডের বাড়ির সব জানলা দরজার রং হল মরা পাতার মতো। রঙের shade কাগজের উপর তুলিতে এঁকে দিতেন, চূণকামে কখনও blue ব্যবহার করতে দিতেন না। ফর্দ করে এসব লিখে দিতেন। যখন ট্রেনে চলতেন, ভৃত্যকে নক্সা ফেলে দিতেন তৈজসপত্রাদি তদনুযায়ী সাজিয়ে দেবার জন্য। কখন কোন পাত্রে কী খাবেন তারও তালিকার খাতা করে দিতেন। লোকের সঙ্গে কথা বলতেন, ব্যবসায়ের লেনদেন করতেন—সবই plan অনুযায়ী। বিয়ের ফর্দ, নিমন্ত্রিতদের আসন, পিঁড়ির নক্সা—আয়তন, আসনের দূরত্ব, plate সাজাবার ঢঙ, সবই খাতায় ছবি এঁকে দিতেন। পানের মশলা, চা ইত্যাদির

ফর্মূলা করে দিয়েছিলেন। চাকরি হতে যদি কাউকে তাড়াতে চাইতেন, নিঃশব্দে তা সম্পাদিত হত। উনিই যে তাড়িয়েছেন তা ধরা সহজ ছিল না। কিন্তু যাঁরা তাঁর কাছে কাজ শিখেছিলেন এবং অনুবর্তী ছিলেন, তাঁদের তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করতেন।

১৯৩৬।৩৭ হতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকদের মতে মিলত না। পরিচালক সভার অধিকাংশ সভ্যই তখন বেশি বেশি টাকা পাচ্ছিলেন নানা সাব কমিটির সভ্যরূপে। আচার্য রায় সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি এসব পছন্দ করেননি। অন্য দিকে নূতন নূতন কাজ সৃষ্টির জন্য experiment-এর জন্য টাকা খরচে কোম্পানীকে প্রবর্তিত করেছিলেন। সে সব কাজের অনেকগুলিই লাভ এনে দেয়নি। এই জন্য পবিচালক সমিতিব সভ্যরা আচার্য রায়কে আর আমল দিতেন না। আচার্য রায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর পরিচালক সমিতিতে নির্বাচিত হলেন না। এর পরে আচার্য রায়ের এক গোপন পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল—উনি অল্প কয়েক জনকে তা পাঠিযেছিলেন। ঐ পুস্তিকায় আচার্য রায় ও রাজশেখরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছিল তার আভাস পাওয়া যায়।

রাজশেখরের কন্যা প্রতিমার মৃত্যু হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ৮ বৎসর পর রাজশেখরের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই ৮ বৎসব স্ত্রী কন্যাশোকে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করতেন। রাজশেখর তাঁকে শাস্ত্রবাক্য শোনাতেন, শোক সম্বরণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে উপদেশ দিতেন, সে স্নিগ্ধবাক্য বড় শোনা যেত না—যতীন বাবু আমাকে দুই দিন বলেছিলেন। অথচ এই কন্যাব মৃত্যুতে রাজশেখর উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে তা ছেপে বিতবণ করেছিলেন, দোতালায় যেখানে বসতেন সেখানে দেওয়ালে কন্যার মূর্তির মর্মর ফলক বসিয়েছিলেন এবং নাতি-নাতনীদের সকল রকম রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ঘব সঞ্চয়—প্রায় ন্যূন্যাধিক ২৫ লক্ষ টাকা-সবই নাতনীদের দিযে গিয়েছেন। নাতনীটি পিতা ও স্বামীকূলের সম্পদেও সম্পন্না। বহু বৎসর ধরে যারা বাজশেখবের সেবা করেছিল—জ্ঞান বন্ধু, সুধীর—তাদের কপর্দক দিয়ে যাননি। আর্তসেবার জন্য দান করা যে নিরর্থক ও ভ্রমাত্মক তা বর্ণনা করে তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে অতি সুন্দর একটি নকসা লিখেছিলেন।

চিত্রকর যতীন সেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। যতীনবাবু বিয়ে করেননি। শেষ বয়সে পিতৃকুলে তাঁর আশ্রয় ছিল না। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচারের জন্য বহু উৎকৃষ্ট ছবি এঁকেছিলেন, রাজশেখরের স্কেচ বা পরামর্শে। তাঁকে বেঙ্গল

কেমিক্যাল হতে আজীবন মাসিক ৭৫্ টাকা পেন্সন পাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধেও নিজের বাড়িতে এই জীর্ণ প্রায়-দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষটিকে আশ্রয় দেননি। অথচ যতীনবাবু প্রত্যহ এসে রাজশেখরকে সঙ্গ দান করতেন। কথাবার্তা বিশেষ হত না। কিন্তু এই সান্নিধ্যও ছিল মূল্যবান।

এখন হতে প্রায় ৮/১০ বছর আগেকার কথা। তখন শ্রীনির্মলকুমার বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। নির্মলবাবু কার্য নির্বাহক সমিতির এক সভায় রাজশেখরের স্বাক্ষরিত একটি পোষ্টকার্ডের চিঠি উপস্থিত করে আমাদের দেখান। এই চিঠিতে রাজশেখর পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পরিষদের দেয়ালে দেয়ালে যে সাহিত্যিকদের চিত্র রাখা হয়েছে তা নামিয়ে ফেলা হোক এবং সব গাদা করে চটে জড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হোক।

পরলোকগত সাহিত্যিকদের স্মৃতিচিত্র সম্বন্ধে তাঁর এই মনোভাব কি নিজের জীবনের নানাক্ষেত্রে সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর কতক পাওয়া যায়, কতক পাওয়া যায় না। একদিন আমার পিতা রামপ্রাণ গুপ্তের লেখা ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশংসাবাক্য স্বেচ্ছায় আমাকে শুনিয়েছিলেন। গিরীন্দ্র-শেখর আমাকে বলেছিলেন, "আপনার পিতার 'প্রাচীন রাজমালা' পুস্তকে পুরাতত্ত্বের আলোচনা আছে। আমার পিতা চন্দ্রশেখরেরও এরূপ আলোচনার পাণ্ডুলিপি পেয়েছি।" রাজশেখর নিজের হাতে তাঁর পিতার সুন্দর ছবি এঁকে রেখেছিলেন।

নির্মল বসু ও সজনী দাসের সঙ্গে তাঁর যা আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি গীতার যে ভূমিকা লিখেছিলেন তা হতে নির্মল-সজনী ধরে নিয়েছিলেন যে, রাজশেখর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। তাঁর কাছে পূর্বজন্ম-পরজন্ম, ইহকাল-পরকাল, স্বর্গ-নরক, স্নেহ-প্রেম-মমতা, পাপপুণ্য কিছু নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজশেখর স্মৃতি সভায় এই কথাই তাঁরা দুইজনে বলেছিলেন। তাঁরা যা বুঝেছিলেন, তা সত্য হতে পারে। কিন্তু আমি তা বুঝিনি। তবু রাজশেখরের একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন-পিতামাতার সন্তানদের প্রতি স্নেহ বা সন্তানদের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা একটা Fiction বা কল্পনা মাত্র। এই কথাটিতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আমরা পরে ব্যবহার করব।

কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস কার্যকর ছিল বলে মনে হয় না। মনে না হবার বহু কারণ আছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিক কতজন তাঁর স্নেহ,

সহায়তা ও গুণগ্রাহিতা পেয়েছেন তার সংখ্যা নেই। একটা ঘটনা বলি। এতেও তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৩৪৬ সনের পৌষের 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধের নাম "কেন এই দুঃখ"। এই প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের আবশ্যকতা। পরের বৎসর ১৩৪৭, পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ'-এ আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম "যন্ত্র বর্জিত শিল্পবাণিজ্য কি সম্ভব?" এর প্রায় ২।২॥ বৎসর পরে ১৩৪৯।৫০ সনে একদিন বিকাল প্রায় ৩॥ টায় বেঙ্গল কেমিক্যালের তখনকার দিনের ম্যানেজার জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী—'পৃথিবীর ইতিহাস'-প্রণেতা দুর্গাদাসের পুত্র, সিটি আপিস হতে ফোনে আমাকে মাণিকতলা কারখানায় জানান যে, আমার জন্য একটা গাড়ি যাবে; তাতে চড়ে যেন আমি ঠিক ৪॥ টায় সিটি আপিসে পৌঁছি এবং গাড়িতেই বসে থাকি। রাজশেখরবাবু তখনি এসেই গাড়িতে উঠবেন এবং আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তাই হল। পথে রাজশেখর বললেন, "বড় ও ছোট শিল্প সম্বন্ধে আপনি প্রবাসী ও ভারতবর্ষে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা আমি পড়েছিলাম, আমার মনে আছে। আমিও কিছু লিখেছি। তাই আজ আপনাদের শোনাব।" আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাড়িতে এসে পৌঁছলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমাদের তখনকার দিনের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সত্যপ্রসন্ন সেন।

রাজশেখর পড়ে শোনালেন তাঁর কুটীর শিল্প বই-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। বিশ্ব-ভারতীর প্রকাশন বিভাগের কর্তা চারুবাবু পাণ্ডুলিপির খাতা-খানি সাগ্রহে সংগ্রহ করলেন। আমরা এক সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম। রাজশেখরের বাড়িতে এই তিন জনের এক সভা মাঝে মাঝে বসত। রাজশেখর ও চারুচন্দ্র নিজ নিজ লেখা শোনাতেন, অন্য গল্পও হত। সত্যপ্রসন্নকে রাজশেখর যখন ট্রেনিং দেন, তখন তাঁর হাতে দিয়েছিলেন মোপাসাঁর গল্পের ইংরাজী তর্জমা।

নিজের ও পরের রচনা

কে কোথায় কী লিখছেন মোটামুটি খবর রাখতেন, তা পড়তেনও তিনি। লেখকদের চিঠি দিতেন কখনও কখনও। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে এক পাতা সমালোচনা প্রবাসীতে লিখেছেন। ইংরাজীর চাইতে বাংলা খবরের কাগজ বেশি পড়তেন। বলতেন, বাঙলায় সবই প্রকাশ করা যায়। আমি একদিন বলেছিলাম যে, তাঁর ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুব সুন্দর, সহজ ও Direct। তিনি বললেন, ও হ'ল বাঙালা দেশের কথকথার ভাষা।

উনি সব ইংরাজী Digestগুলি পড়তেন। ইংরাজী গল্পের বই পড়তেন। নিজের লেখার জন্য শেষের দিকে বিষয়বস্তু খুঁজতেন। আমার কাছে আরব্য উপন্যাস, বিদ্যাসুন্দর, সেভেন হেভেনের বই ইত্যাদি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এ সব হতে তাঁর নকসার উপকরণ নিয়েছিলেন। মহাভারতের পর তাঁর 'হরিবংশ' লেখার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু হরিবংশের সংস্কৃত ও ভালো বাংলা তর্জমা দিতে আমি পারিনি। তাঁর তখন পরিশ্রমের শক্তিও আর তেমন ছিল না।

শেষের দিকে নানাস্থান হতে লেখার তাগিদ ছিল খুব। অর্থাগমও ছিল প্রচুর। কিন্তু হাতের কাছে বা মনে প্রচুর বস্তু আসত না। Wodehouse-এর একটা বই হতে অনেকটা তর্জমা তাঁর লেখার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিলেন বলে 'শনিবারের চিঠি' তা ধরে ফেলেছিল। উনি যে সাফাই পরে লিখেছিলেন তাতে সাফ হয়নি অবস্থাটি।

আমার রচিত বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রথম তিনখান—প্রফুল্ল, জগদীশ, মহেন্দ্র পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন—খুবই উৎসাহ পেয়েছিলাম। যখন শুনলেন, আমি ইতিমধ্যে প্রমথনাথ বসুর জীবনী লিখেছি তখন আমাকে আরও তথ্য দিলেন। এর পরে কী লিখব, ওঁর উপদেশ চাইলাম। তিনি বললেন, যেমন সহজ করে আপনি লেখেন তেমনি সহজ করে চরক ও সুশ্রুত সংক্ষেপে লিখে দিন। তাতে রোগ চিকিৎসার অংশ দেবার দরকার নেই। এই বলে উনি এই দুই আয়ুর্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটেসের একটি তুলনামূলক মনোজ্ঞ আলোচনা শোনালেন। এই আলোচনা হয়েছিল ১৩৬৬ সালের মধ্যভাগে, একদিন রাত্রে, তাঁর শোবার ঘরে। আমার 'চরক সংহিতার কথা' প্রবন্ধ প্রবাসীতে সেই বছরই মাঘে প্রকাশিত হয়। তিনি তা পড়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশিত পথে লেখা 'চরক ও হিপোক্রেটেসের চিকিৎসক'—প্রবন্ধটি তিন মাস পরে প্রকাশিত হয় বৈশাখের ভারতবর্ষে। ১৪ই বৈশাখ তাঁর মৃত্যু আসে অতিশয় অকস্মাৎ। এ প্রবন্ধ তিনি দেখেছিলেন কিনা জানি না। আমরা কয়েকজন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মী কিছু কিছু লিখে থাকি। রাজশেখরের স্নেহ-দৃষ্টি পেয়ে এই অভ্যাস রাখা সহজ হয়েছিল।

রাজশেখর ও জগদীশ্বর

এই সব বিবরণ হতে যে রাজশেখর আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে আসেন তিনি একটি বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিত ও সংসারাভিজ্ঞ কর্মী পুরুষ—যিনি হয়তো কর্মকেই

কর্মের শেষ ফল বলে ধরে নিয়েছিলেন। অথচ এই মানুষেরই কাছে তাঁর কর্মজীবনের চরম সাফল্যের দিনে মধ্যবয়সে পেয়েছিলাম প্রবাসীতে প্রকাশিত একটি কবিতায় সেই মানুষের দেখা, যিনি নানাকাজ ও সৃষ্টিতে আর তৃপ্তি পাচ্ছেন না—শক্তিমান জগদীশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য আকুলতা দেখাচ্ছেন।

সজনীকান্ত ও নির্মলকুমার রাজশেখরকে নিরীশ্বরবাদী ও পরকালে অবিশ্বাসী বলেছেন। যদি তা ঠিক হয়ে থাকে তবে রাজশেখরের মধ্যজীবন ও শেষজীবনের এই মন-পরিবর্তনের কারণ কী? দাস ও বসুকে সোজাসুজি সমর্থনের শক্তি আমার নেই। কিন্তু যদি তাঁদের নির্ণয় ঠিক হয়ে থাকে তবে তাঁর জীবনের মধ্যভাগে ও শেষ ভাগের অবস্থার একটু আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রায় ৫০ বৎসর ধরে এই ধৈর্যশীল সংযমী, নির্ঝঞ্ঝাটে পরোপকারী সঞ্চয়ী মানুষটির সামনে ভগবান কেন বোধ-শক্তিহীন চিরব্যথিত নাতিটিকে দিয়ে কেবল বেঁচে থাকার আর্তনাদ শোনালেন? এক সন্তান—কন্যা প্রতিমা ছিলেন যেন দেবী-প্রতিমা। তাঁর স্বামী অমর পালিত আচার্য রায়ের প্রিয়—Calcutta Soap Works-এর প্রতিষ্ঠাতা। অকালে একসঙ্গে এরা চলে গেলেন কেন? সাথী রইলেন স্ত্রী, জগদ্ধাত্রীর মতো যাঁর মূর্তি—স্বামীর উন্নতি, মঙ্গল, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা যাঁর একমাত্র আকাঙ্খা, এই কন্যাবিধুরা জননীও চলে গেলেন। কন্যার শোক, কন্যার সন্তানদের দায়িত্ব সবই রেখে গেলেন ৬২ বছরের বৃদ্ধ রাজশেখরের উপর। সেই বছরই বোমা পড়েছিল কোলকাতায়। দীর্ঘদেহ বিকলাঙ্গ নাতিটিকে সঙ্গে করে তিনি ভাগলপুরে চলে গিয়েছিলেন। ওখানে বনফুল না থাকলে জীবনধারণই হয়তো সম্ভব হত না।

এই স্বল্পবাক, গম্ভীর নিঃসঙ্গ সংযত মানুষটির মনের কথা কে জানতে পারবে? তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন, সারা জীবনের, তাঁর প্ল্যান মৃত্যুতে ছিন্ন হয়ে যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামায়ণ, তারপর মহাভারত নিয়ে ৫।৬ বৎসর তিনি ব্যাপৃত থাকলেন। রাম ও কৃষ্ণ তাঁকে কী দিয়েছিল জানি না। এতবড় কর্মী মানুষ, কী নিয়ে তিনি থাকবেন? শরীর দিন দিন অশক্ত হচ্ছে; কিন্তু বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচারশক্তি তখনও অটুট। বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁরাও তখন স্বাধীন হতে চেষ্টা করছেন। তবু তিনি ছাড়তে চাননি। এবে তার সারা জীবনের সাধনার ধন, ব্যবহারিক জীবনের সকল শক্তির উৎস।

সাহিত্য রচনার জন্য তাগিদ আসে। গড্ডলিকা, কজ্জলী, চলন্তিকা, হনুমানের স্বপ্ন লিখেছিলেন তাঁর প্রতিমার মৃত্যুর আগে—যখন তাঁর জীবন সাফল্যে পরিপূর্ণ। রামায়ণ-মহাভারত লিখেছিলেন সহধর্মিনীর পরলোকগমনের পর। তারপর কি লিখবেন? শ্রীকৃষ্ণের শেষ জীবনের সংসারের জ্বালার কথা আছে হরিবংশে। তাই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরীরে সামর্থ্য ছিল না।

যে-মন নিয়ে গড্ডলিকার গল্পগুলি লিখেছিলেন, তাঁর সে-মন হারিয়ে গিয়েছিল তখন। তবু ধীরে ধীরে কিছু কিছু লিখেছিলেন। সেখানে ছিল তাঁর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার।

তাঁর বয়স ৮০ বছরের দিকে এগিয়ে এল। কয় বছর গত হল, বিকলাঙ্গ নাতিটি তিরোহিত হয়েছিল। নাতনির ছেলেটি বি. এস. সি. পরীক্ষা দিচ্ছে। জামাই গঙ্গাবাবু পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযোজিত হয়েছেন। সংসারের ব্যবহারিক জীবন হতে রাজশেখর প্রায় মুক্ত হয়ে এলেন।

রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর ২।৩ বার মূর্ছা হয়ে গেল। এখন রাজশেখরের কী plan? এখন আর তাঁর plan ছিন্ন হতে দেবেন না তিনি। এখন নেমে আসুক তাঁর জীবন-রঙ্গমঞ্চের উপর শেষ যবনিকা, জ্বলে উঠুক প্রেক্ষাগারে দুপুরের খর সূর্যের আলো। সহকর্মী, বন্ধু, আত্মীয় ও গুণমুগ্ধ যাঁরা, তাঁরা জীবননাট্য দেখেছিল,—তাঁদের চোখে যদি জল আসে, তিনি জানতে পারবেন না, তারা যেন নিঃশব্দে তার দেহ ভস্ম করে দেয়।

বাংলা বিজ্ঞাপন সাহিত্যের অগ্রণী স্রষ্টা রাজশেখর

সন্তোষকুমার দে

কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের পক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রচার বা বিজ্ঞাপন পরিচালনা কিন্তু নতুন ঘটনা নয়, যাঁর হাতে অর্থ ব্যয় করবার ক্ষমতা থাকে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাও প্রভাবিত করতে পারেন এতো জানা কথা। ছোট প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ম্যানেজারই একাজ সচরাচর করে থাকেন। প্রতিষ্ঠান যখন বৃহৎ হয় তখনই তার পৃথক বিভাগ থাকে প্রচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য।

শোনা যায়, বেঙ্গল কেমিক্যালের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পৃথক প্রচার বিভাগ থাকলেও প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা রাজশেখর বসু স্বয়ং অনেক সময় নিজ হাতে বিজ্ঞাপনের 'লে-আউট' এঁকেছেন, বিজ্ঞাপনের ভাষাও রচনা করেছেন। তাঁর সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত—পরিচ্ছন্ন, মার্জিতরুচি শুচি স্নিগ্ধ সেই বিজ্ঞাপন নক্সার যেমন কুশলী শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের অমর তুলির স্পষ্ট জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করা যায়, তেমনি তার ভাষার যে শুদ্ধি ও সুরুচি সবারই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তার রচয়িতা রাজশেখর স্বয়ং।

তাঁর বিজ্ঞাপনের বিষয়ে আমি 'বিজ্ঞাপন সাহিত্য ও রাজশেখর' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার রাজশেখর স্মারক সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭), এখানে সংক্ষেপে রাজশেখরের বিজ্ঞাপনের ভাষা-সম্পদের কিছুটা নমুনা তুলে দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।—

পূজার সময়ে 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রসাধন সামগ্রীর বহুবর্ণে মুদ্রিত ইনসেট হতে, সাবানের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত 'কপি'—

স্নানলীলা

"কেবলমাত্র স্নানে দেহ শীতল হয় কিন্তু উহার ক্লেদমুক্তির জন্য গাত্রমার্জনা প্রয়োজন। সাবান গাত্রমার্জনায় অন্যতম সহায়, অথচ উহার উপকরণ বিশুদ্ধ ও নির্দোষ না হইলে গাত্রচর্ম কর্কশ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সর্ববিধ স্নানীয় সাবান ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত এবং পরম সুরভিযুক্ত। স্নানে ও প্রসাধনে ইহাদের ব্যবহারে দেহে লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য আসে এবং মনে পরম তৃপ্তি অনুভূত হয়।"

তারপরে সাবানগুলির নাম দেওয়া। সাবানের নামগুলিও লক্ষ্যণীয়। সিপ্রা, যমুনা—দুটিই নদীর নাম—যাতে অবগাহন স্নানের কথাই সহজে মনে আসে। 'গোলডেন স্যানডালউড' নামে চন্দনগন্ধ বহন করছে।

পাউডারের বিজ্ঞাপন

রূপচর্চা

"প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ষড় ঋতুর রূঢ় অত্যাচার হইতে গাত্রচর্মের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বর্ণের লাবণ্য ও কান্তির সম্যক প্রকাশকল্পে চন্দনপঙ্ক ও পুষ্পপরাগ প্রভৃতি বিবিধ সুখদ উপকরণের ব্যবহার সুপ্রাচীন প্রথা। বেঙ্গল কেমিক্যালের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত চূর্ণ প্রসাধনী গন্ধের অপূর্ব মনোহারিত্বে ও স্পর্শের কোমলতায় পুষ্পরাগের মতই তৃপ্তিপ্রদ ও পেলব এবং চন্দনপঙ্কের মতই শীতলস্পর্শ"।

এসেন্সের বিজ্ঞাপন

"দেবার্চনায় ও দেহচর্চায় অগুরু চন্দন কস্তুরী এবং বিবিধ পত্রপুষ্প হইতে আহৃত উপকরণের ব্যবহার সকল দেশেই চিরাচরিত প্রথা। ইহাদের সময়োচিত ব্যবহারে দেহ এবং মনে তৃপ্তি ও প্রফুল্লতা আসে। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুরভি মাত্রেই গন্ধে ও গুণে স্বভাবজাত উপকরণের সমকক্ষ। ইহাদের বহুক্ষণ স্থায়ী মৃদু ও অনন্যসাধারণ চিত্তহারী সুবাস কায়িক ও মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে।"

কেশতৈলের বিজ্ঞাপন

"বিবিধ ছন্দে রচিত কবরী সর্বযুগে রমণীর রূপচর্চায় পরম সহায়। মনোহর গন্ধ বিজড়িত স্নেহপদার্থ কবরীর সম্যক সৌন্দর্য বিকাশে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহারই জন্য সুগন্ধী কেশতৈলের সৃষ্টি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রত্যেক কেশতৈল নির্দোষ, সুনির্বাচিত উপাদানে তৈয়ারী ও বিচিত্র গন্ধবস্তু সহযোগে সমৃদ্ধ। নিয়মিত ব্যবহারে ইহাদের যে কোনটি কেশের সমুচিত বৃদ্ধি ও কমনীয়তা সাধনে সমর্থ।"

১৩৪৮ সালে পূজার সময়ে দুটি করে পাখীর বহুবর্ণ ছবি দিয়ে শরতের কাশগুচ্ছ, পদ্মফুল, ধান্যগুচ্ছ ও পুষ্পস্তবকসহ প্রসাধন সামগ্রীর চারটি বিজ্ঞাপনের

ভাষালালিত্য ভুলবার নয়। তার কিছুটা এই রকম ছিল—

শরৎকাল

আনন্দ ও উৎসবের কাল। এই সময়ে সদ্য-বর্ষ-স্নাতা পত্রপুষ্পালংকারা ধরিত্রীর সুনীল আকাশে লঘু শুভ্র মেঘ খণ্ড, মাঠে মাঠে কাঞ্চনবর্ণা ধান্যমঞ্জরী ও শঙ্খধবল কাশগুচ্ছ। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শেফালির আলিম্পন, হ্রদে ও তড়াগে কুমুদ কহ্লার, শাখে শাখে শুক সারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি প্রকৃতির বৈতালিকের কলগুঞ্জন এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুর ঝংকৃত করে।

এই সর্বজনীন আনন্দের দিনে ব্যবহার ও উপহারের জন্য আমাদের স্নিগ্ধ সুরভিসংহত চিত্ত-বিমোহী প্রসাধনগুলি বিশেষ প্রশস্ত। সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্দোষ উপাদানে, বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বলিয়া ইহাদের যে-কোনটি ব্যবহার করা যায়। 'অগুরু', 'কস্তুরী', 'ইরা', 'স্বাতি', 'রেবা', 'উৎপল', 'সিপ্রা' প্রভৃতি গন্ধসার স্থায়িত্বে ও গন্ধমাধুর্যে অপরাজেয়। প্রত্যেকটির উপাদান সুনির্বাচিত উপকরণ হইতে আহৃত।"...

বেঙ্গল কেমিক্যালের এসেন্সকে 'গন্ধসার', সুগন্ধী সাবানকে 'গন্ধফেন', সুগন্ধী কেশতৈলকে 'গন্ধতৈল' এবং পাউডারকে 'গন্ধরেণু' অভিধা দিয়ে ১৩৪৬ সালে আর একটি দুই রং-এ চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—সেটিও চমৎকার।

শুধু পত্রিকার বিজ্ঞাপনেই নয়, উৎপন্ন পণ্যবস্তুর নামকরণেও তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—প্রত্যেকটি নাম শুধু গূঢ় অর্থবহ নয়, সাহিত্যিক রসসমৃদ্ধ। যেমন—সাবানগুলি নদীর নামে—সিপ্রা, যমুনা। দাড়িকামাবার সাবানের নাম—'রাকা' অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। দাঁত মাজবার টুথপেস্টের নাম 'রদফেন' অর্থাৎ দাঁতের সাবান, পুষ্টিকর পানীয় একটি পণ্যের নাম 'পানীয়ন', কীটঘ্ন ডি. ডি. টি-র নাম—'মারকীট'।

রাজশেখরের নিজের বই-এর বিজ্ঞাপনও নিজেই লিখে দিতেন, তার ভাষাও সুসংহত ও চিত্তাকর্ষক।

একটি কারুকার্যের জন্য খ্যাত হোর্ডিং কোম্পানীর নামকরণ করেছিলেন—কারুকৃৎ। সে প্রতিষ্ঠানটি এখনও সগৌরবেই চলছে। বিজ্ঞাপনের মত মুদ্রণ শিল্পের পালাবদল ঘটাতে বাংলা লাইনো টাইপ সৃষ্টিতেও রাজশেখরের দান স্মরণীয়। একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়, রাজশেখরের মত নিপুণ ভাষাশিল্পীর হাতে বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষায় যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তারই উপর গড়ে উঠেছে বর্তমানের বাংলা বিজ্ঞাপনের প্রগতি।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহাসিক গবেষণা ও কোষগ্রন্থ প্রণয়ণের দিক্‌পাল বহু ভাষাবিদ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহার শতবার্ষিক স্মৃতিসভায় নিজের এবং রবিবাসরেব পক্ষ হইতে আমি বিনম্র চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। আমি বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করি, ১৯০৯ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) খৃষ্টাব্দে।

তাঁহার শান্তসৌম মূর্তি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণেব নিকট আমি বহু বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করি। সে সময় তাঁহার বিশ্বকোষ ও বঙ্গীয় মহাকোষ সম্পাদনার ব্যাপারে উভয়েব ম'ধ্য ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। তিনি যে একজন বহুবিদ্যার ও বহু ভাষার সচল মন্দির স্বরূপ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার বঙ্গীয় মহাকোষ গ্রন্থখানি, যতদূর জানি ২ খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়া অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। অমূল্যচরণের ঐ অমূল্য কোষ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করার প্রতি জাতীয় সরকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাবার কথা

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

দেশবরেণ্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আমার বাবা। শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর কথা বলতে গিয়ে মনে হল, যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার কিছু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে; যদিও আমাদের বংশে অমূল্যচরণের মত বহুমুখী প্রতিভাধর পণ্ডিতের উদ্ভবের কোনো পরিবেশ ছিল না। এইরকম একটা সাদামাঠা কায়স্থ-পরিবারে তাঁর মত ব্রাহ্মণোচিত পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব নিতান্তই বিস্ময়জনক।

বংশ-পরিচয়

কলকাতার অনতিদূরে ২৪পরগণার নৈহাটিতে আমাদের দেশ। আমাদেরই এক পূর্বপুরুষ হুগলির পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত আকনা গ্রাম থেকে নৈহাটিতে এসে বসবাস করেন। ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতকে যখন পর্তুগীজ, হার্মাদ, ইংরেজরা হুগলির আশে-পাশের স্থানগুলিতে অত্যাচার আর লুঠতরাজ সুরু করে, তখন ওখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। শুনেছি ঐ স্থান থেকে পালিয়ে ঘোষ বংশীয়েরা নৈহাটিতে প্রথম এসে বসবাস করেন। তারপরে আসেন তাঁদের দৌহিত্রবংশীয় মিত্ররা, পরে দত্ত ও তারপরে ভট্টাচার্য পরিবারেরা (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্বপুরুষ)। ঘোষ-বংশের মহাদেব ঘোষ (মকরন্দ ঘোষ থেকে ২০ পুরুষ) নবাবী আমলে সরকারী চাকরী করে 'মজুমদার' উপাধি পান। সেই থেকে নৈহাটির ঘোষেরা কেউ ঘোষ, কেউ বা ঘোষ-মজুমদার বা শুধু মজুমদার পদবী ব্যবহার করেন। মহাদেবের কনিষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান রামরাম ঘোষ নৈহাটিতে এক মন্দির নির্মাণ করেন ১৬৯২ শক্ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। মহাদেবের তৃতীয় পুত্র আন্দীরাম—তাঁর পুত্র বীরনারায়ণ—তাঁর পুত্র হরচন্দ্র। তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ আমার পিতামহ। উদয়চাঁদ মাঝামাঝি বয়সে কলকাতার কোন এক সওদাগরী অফিসে নিযুক্ত হন—পরে উত্তর-কলকাতায় বীডন ষ্ট্রীটের ৫২/২ নং বাড়িখানি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ঠাকুরদা বিয়ে করেছিলেন হুগলির দ্বৈপাড়া বা দৈপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র

দত্তের কন্যা সুবাসিনী ওরফে বাদুমণিকে—বীডন ষ্ট্রীটের শিবু বিশ্বাসদের নিকটতমা আত্মীয়া। আমার ঠাকুরদাদার এক ভগ্নী সুরেশবালা ওরফে এলোকেশীকে বিয়ে করেন মোহনবাগানের বাসিন্দা দেওয়ান কীর্তিচন্দ্র মিত্র।

উদয়চাঁদের তিন পুত্র—চণ্ডীচরণ, অমূল্যচরণ ও ধীরেন্দ্রনাথ ও তিন কন্যা—বিপিনমোহিনী, মানমোহিনী ও গিরিবালা।

চণ্ডীচরণ চাকুরীজীবী ও জেঠাইমা চারুবালা ছিলেন দর্জিপাড়ার বিনোদবিহারী বসুর কন্যা। ঠাকুরদা মারা যাবার (১৯০১) কিছু পরেই জ্যেঠামশাই দুই পুত্র—নির্মল ও বিমল এবং দুই কন্যা রেখে মারা যান। কনিষ্ঠ বিমলও কৈশোর বেলায় মারা যান।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই নির্মলকুমার ব্যাটরায় বাড়ি করে চলে যান। নির্মলকুমার এক পুত্র সমীরকুমারকে রেখে মারা যান।

আমার মা সরসীবালা ছিলেন ২৪পরগণার রাজপুরের রায়চৌধুরী বংশের দেওয়ান (শিরোহীর) শরৎচন্দ্র দত্ত রায়চৌধুরীর কন্যা এবং মায়ের মাতামহ ছিলেন 'রেইস ও রায়েত'-এর লেখক প্রসিদ্ধ কবি নবকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি 'রামশর্মা' নামে বিখ্যাত। আমার মায়ের জন্ম শিবোহীতে।

কোন্নগরের মিত্রবংশের প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে আমার বড়পিসি বিপিন-মোহিনীর ; নৈহাটির কাঠালপাড়া নিবাসী বিপিনচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে মেজপিসি মানমোহিনীর ও জয়নগর বিষ্ণুপুরের বসু বংশে রজনীকান্ত বসুর সঙ্গে ছোটপিসি গিরিবালার বিবাহ হয়।

আমার কাকা ধীরেন্দ্রনাথ ট্রাম-কোম্পানীর হেডক্লার্ক ছিলেন ; কাকিমা ছিলেন চেতলার অবিনাশচন্দ্র বসুর কন্যা। কাকাবাবু দুই পুত্র—অজিত ও অসিত এবং চার কন্যার মধ্যে তিন কন্যা রেখে মারা যান। পুত্রেরা উভয়ে প্রতিষ্ঠিত। অসিত অবিবাহিত।

আমরা সাত ভাই—হরিচরণ (মৃত), আমি, শচীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, সুধীন্দ্র (মৃত) ও সুখেন্দ্র। এবং তিন বোন—হেমলতা (মৃতা), কনকলতা (মৃতা) ও প্রীতিলতা।

আমার বড় ভাই ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে মেতে ওঠেন। শ্যামপুকুরে তাঁত বসিয়ে বুনতেন কিন্তু তিনি পুলিশের নজরে পড়েন। বাবা তখন জয়নগর বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেন সেখানে আমাদের কিছু ধানের জমি তদারক করতে। তিনি সেখান থেকে নিরুদ্দেশ হন। বহুদিন পরে খবর পাওয়া যায় তিনি সন্ন্যাস

নিয়ে পরিব্রাজক হয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবশেষে দীর্ঘ ১২/১৩ বছর পরে বাড়ীতে এসে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করেন। শেষ বয়সে বৃন্দাবনের কোন এক আশ্রমে দেহ রক্ষা করেন। সুধীন (মণ্টু) নামে আমাদের এক ভাই বি, এস্ সি পাশ করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়—(মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে যান) আমাদের বিশেষ পরিচিত গান্ধীভক্ত স্বর্গত নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে নোয়াখালিতে যায়। ফিরে এসে কিছুদিন পরে টাইফয়েড রোগে মারা যায়। বাকী সকলে জীবিত ও সংসারধর্মে রত।

এবার বোনেদের কথা কিছু বলা যাক্। জ্যাঠতুত বড় বোন বিভার স্বামী শালিখা নিবাসী ডাঃ শ্যামাপদ দাস এবং ছোট বোন অমিয়ার স্বামী কটক-প্রবাসী অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সিংহ।

আমার বড় বোন হেমলতার বিয়ে হয় রায় জলধর সেন বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়কুমার সেনের সঙ্গে, মেজ বোন কনকের বিয়ে হয় বিডন ষ্ট্রীট-নিবাসী ডাঃ বিনয় দত্তের পৌত্র প্রবোধ দত্ত আর ছোট বোন প্রীতিলতার বিয়ে হয় ত্রিবেণী মজুমদার বংশে রথীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে।

কাকাবাবুর বড় মেয়ে স্নেহলতার স্বামী দেওঘর-নিবাসী মণিমোহন সরকার; মেজ মেয়ে শান্তিলতার স্বামী এলাহাবাদে অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্রের পুত্র বিমলকুমার মিত্র, আশালতার স্বামী বালিগঞ্জ নিবাসী পঞ্চানন মিত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা পুষ্পলতার স্বামী রাজাবাজার-নিবাসী-অনিলকুমার বসু।

এই তো গেল আমাদের পারিবারিক পরিচয়।

বাবার ছেলেবেলার কথা

বাবার ছেলেবেলাকার কথা ঠাকুমা, পিসীমাদের কাছে কিছু কিছু শুনেছি। বাবা যখন স্কুলে পড়তেন তখন পড়ায় এত নিবিষ্ট থাকতেন যে বাড়িতে কোথায় কি হচ্ছে তা তিনি টের পেতেন না। বৈঠকখানা ঘরের পাশেই একটা ছোট ঘর—সেটা তাঁর নিজস্ব পড়ার ঘর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেই ঘরে বসে পড়তেন। তখনকার সময় বিডন ষ্ট্রীট একটা বড় রাস্তা। কোন ধনীর গৃহে বিয়ের উৎসবে বরযাত্রীর যে শোভাযাত্রা যেত তাতে দাঁড়া-রোশনাই, ব্যাগ-পাইপ, ব্যাণ্ড-জুড়িগাড়ী আর হৈ-হট্টগোলের চূড়ান্ত হত। বিয়ের অথবা যে কোন শোভাযাত্রা গেলে তা দেখবার জন্য ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সকলেই যে যার বাড়ীর জানালায়, রাস্তায়, রোয়াকে দাঁড়াত। একদিন এই রকম এক বিয়ে শোভযাত্রা দেখতে বাড়ির সকলে বাহিরের দিকে উঁকি মারছে—জানালা ভর্তি। বর এলো, শোভাযাত্রা

এল—আর চলে গেল। ছাত্রর (অমূল্যর) খোঁজ পড়ল, তাকে তো কেউ সে সময় দেখে নি—তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে সকলে দেখল সে এক মনে পড়ছে—এত হৈ-চৈ তাব কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। দিদিরা ঘরে ঢুকে তার পড়ার তন্ময়তা দেখে অবাক।

এই রকম ছিল তাঁর একাগ্রতা আর নিবিষ্টতা।

আমার স্মৃতিতে বাবা

বাবা চিরকালই বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র আর সাহিত্যিকদের নিয়ে সারা সকালবেলা কাটিয়ে দিতেন। ঘুম থেকে উঠেই দেখতুম, কেউ না কেউ বৈঠকখানায় বসে বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন। মাণিকতলার বাড়িটা ছিল বিরাট। বিরাট ঘেরা মাঠ, মাঝে দো-তলা বাড়ি, পেছনেও মাঠ। এই বাড়িতে আগে এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন ছিল, বাণী প্রেসও ছিল। এগুলো উঠে গেলে আমরা এই বাড়িতেই আসি। এই বাড়িতে দেখতুম মাঝে মাঝে বাইরের ঘেরা মাঠে যাত্রা হতো। দো-তলায় আমরা থাকতুম। বাবার বসবার ঘর যেটা ছিল—তা বইয়ে ঠাসা। ঘরের সামনে একটা ছোট ছাদ। অনেক সময় সন্ধ্যায় ছাদে সাহিত্যিকদের আসর বসত।

ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা ৮২ মাণিকতলায় উঠে গেলুম—এটাও বিরাট। ১৮/২০ খানা ঘর। তার মধ্যে ৩/৪ টা হলঘরের মত। এখানেও দো-তলায় ছাদের পাশে বিরাট ঘরের দেওয়ালে র‍্যাক আর আলমারিতে ভরা হাজার হাজার বই। আধখানা ঘরে তক্তোপোষের ওপর ফরাস পাতা।

বাবা নিরামিষভোজী ছিলেন। কোন নেশাই ছিল না, চা-পান-সিগারেট প্রভৃতি কিছুই খেতেন না—কেবল বই-পড়ার নেশাই ছিল প্রধান নেশা। বাবা ছিলেন বৈষ্ণব এবং প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। আমাদের বাড়িতে তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর কার্যালয়। বাবা তার সম্পাদক। 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' কাগজ এখান থেকে বের হত। প্রায় রবিবারে বিকালে কীর্তন হত—কত গুণী ব্যক্তি আসতেন—কত ভক্ত আসতেন। এই সমাবেশে মাঝে মাঝে প্রভুপাদ আসতেন, আসতেন স্যর মন্মথ মুখার্জি, মৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত, মণিমোহন মল্লিক, হরিদাস নন্দী প্রভৃতি। এই আসরে আমরা ছেলেবেলায় কীর্তন গান অনেক শুনেছি—নবদ্বীপ ব্রজবাসী, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় রসময় মিত্র, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ

গোস্বামী প্রভৃতির। বাবা মাঝে মাঝে কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজাতেন। মাণিকতলা থেকে যখন তেলিপাড়ায় আসি তখনও কীর্তন হত।

এই সময় বাবা স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-সরকারে 'রাজ-ঐতিহাসিক' পদে নিযুক্ত হন। ছুটিছাটার সময় আমরাও মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় যেতুম। আমি বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় দু'বার ত্রিপুরায় গিয়েছিলুম। দেখতুম প্রাচীন মূর্তি দেখতে বা প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে তিনি কখনো পদব্রজে, কখনো বা হাতির পিঠে চড়ে রাজ্যের নানা স্থানে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। সেখানকার সাধারণ লোক, আদিবাসী সবার সঙ্গেই বেশ মেলামেশা করতেন।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার

যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তিনি জড়িত ছিলেন—তেমনি কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এই সমাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে ক্ষত্রিয়াচারে পৈতা গ্রহণ করেন। আমাদের বংশে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন। আমার ঠাকুরমার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধে বহু আত্মীয়-স্বজনেরা বংশানুক্রমিক ধর্মীয় প্রথা থেকে বিরত হতে তাঁকে উপদেশ দেন; কিন্তু তিনি তাঁদের কথা না শুনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আর মানসিক শক্তি নিয়ে ১৩ দিনে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে স্থির করে প্রায় অর্দ্ধশতাধিক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরাও সাদরে তাঁর আহ্বান গ্রহণ করেন, বাবাও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদাসহ অভ্যর্থনা করেন। এছাড়া সেদিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন—তার মধ্যে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে আমার মনে পড়ে।

'পঞ্চপুষ্প' প্রসঙ্গে

'বাণী,' 'সঙ্কল্প' 'মর্মবাণী' সাময়িকপত্রের কথা কিছু জানি না। 'পঞ্চপুষ্পে'র কথা বলি। ১৩৩৫ সালে কলকাতা ফাইন আর্ট কটেজের সত্বাধিকারী স্বর্গগত চণ্ডীচরণ দাস মহাশয় অমূল্যচরণ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 'পঞ্চপুষ্প' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন—মাসিকখানি গল্প, উপন্যাস ও ছবিতে অলঙ্কৃত। 'পঞ্চপুষ্পে'র এক বছর পূর্ণ হলে চণ্ডীবাবুর প্রবল ইচ্ছা হয় পত্রিকাখানিকে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা করবার। বাবার বাল্যকালের সহপাঠী ছিলেন শরৎচন্দ্র ভড়। শরৎকাকা আবার ছিলেন চণ্ডীবাবুর নিকট আত্মীয়। শরৎকাকারই

যোগাযোগে পত্রিকাখানির সম্পাদনার ভার পড়ে বাবার ওপর। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে বাবা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। কয়েকমাসের মধ্যেই 'পঞ্চপুষ্প' প্রথম শ্রেণীর মাসিকে পরিণত হল, কিন্তু প্রকাশের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় চণ্ডীবাবু কাগজ তুলে দিতে চাইলেন। তখন শরৎকাকার মধ্যস্থতায় বাবা নামমাত্র মূল্যে তা কিনে নেন। ১৩৩৭ সালের বৈশাখ থেকে 'পঞ্চপুষ্প' নতুন ভাবে সাজানো হয়। সম্পাদনা ও পরিচালনায় সহকারী নিযুক্ত হলেন চারুচন্দ্র মিত্র, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র ভড়, নীহাররঞ্জন মিত্র, নন্দরাম ভট্টাচার্য প্রভৃতিরা। এঁদের অনেকেই বেতনভোগী ছিলেন। তাছাড়া, ভাল কাগজ, সুন্দর ছাপা, একাধিক রঙীন ও অজস্র সাদা-কালো ছবি—সব দিক দিয়েই কাগজখানিকে যাতে সর্বোৎকৃষ্ট করা যায়, সেই দিকেই ছিল বাবার দৃষ্টি। অথচ সেই অনুপাতে দাম যথেষ্ট কম রাখা হয়েছিল। কাজেই আয়ের তুলনায় ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পেল। সেই সময় সকাল-সন্ধ্যায় আসর বসত, যোগ দিতেন অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, জিতেন্দ্রনাথ বসু, নরেশ মিত্র প্রমুখেরা। এই সময় 'পঞ্চপুষ্প প্রেস' স্থাপনা করা হয়। 'পঞ্চপুষ্পে'র নামডাকও খুব হতে লাগল, ঋণের বোঝাও বাড়তে থাকল। পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার জন্য বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। শরীর তার মাশুল তো আদায় করবেই। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর নির্দেশ মত ১৩৪০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা আমি সম্পাদনা করি। এইটিই 'পঞ্চপুষ্পে'র শেষ সংখ্যা। পঞ্চম বর্ষ সম্পূর্ণ করে 'পঞ্চপুষ্পে'র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হল। চার বছর পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার নীট লাভ কয়েক হাজার টাকার দেনা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ। আসলে অব্যবসায়িক চিন্তা মাথায় নিয়ে ব্যবসা করার যা স্বাভাবিক পরিণতি হতে পারে, তাই হল।

রোগশয্যা থেকে উঠে কয়েকবছর আবার আগের মতই নিত্যনৈমিত্তিক, কাজকর্ম (যেমন, অধ্যাপনা, সাহিত্য পরিষদ, বৈষ্ণব সম্মিলনী, এসিয়াটিক সোসাইটী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সভাসমিতিতে যাওয়া) চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ: মহাকোষের সূচনা

এরপর ১৯৩৩ সালে আবার একটা কাজ হাতে নিলেন। তা হল, বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার। সঙ্গে সহযোগী হিসাবে

রইলেন—চারুচন্দ্র মিত্র, ত্রিদিবনাথ রায়, বিমানবিহারী মজুমদার ও অজিত ঘোষ। নতুন করে বিশ্বকোষকে ঢেলে সাজালেন। আগে বিশ্বকোষে কোনটা কার লেখা জানার উপায় ছিল না, এবার লেখকদের নাম লেখার তলায় ছাপার ব্যবস্থা হল এবং আভিধানিক শব্দগুলির সংযোজনের ব্যবস্থা হল। মাত্র 'অ' শব্দ সম্পূর্ণ হতে না হতেই—১ বছরের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে তিনি ও তাঁর সহকারী সকলেই পদত্যাগ করলেন। এতে তিনি নিরুৎসাহ বা হতাশ হলেন না। বরঞ্চ তিনি নিজেই বললেন—আমিও একটা বাংলায় এনসাইক্লোপিডিয়া বার করব। বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। অর্থ নেই—কিন্তু উদ্যোগপর্ব আছে। শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই এই কাজে হাত দিতে নিষেধ করে বলেছিলেন—বিত্তহীনের পক্ষে এই বৃহৎ কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি কারো কথাই শুনলেন না—কাজ সুরু করলেন—প্রতিষ্ঠা-সভা খুব জাঁকজমক করে হল। নাম স্থির হল 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (Encyclopaedia Bengalensis); কবিগুরু আশীর্বাদ দিলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উৎসাহিত করলেন। বিদ্বৎসমাজ অকৃপণভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে লাগল।

মহাকোষ সংকলনের সূত্রপাত থেকেই বাবার কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেল—দিনরাত্রি খেটেই চলেছেন, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। মহাকোষের কাজের সঙ্গে যাঁরা সংশিষ্ট ছিলেন—তাঁদের সকলকেই কাজের বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়ে, তথ্যের সন্ধান দিয়ে লিখতে বলতেন। তারপর লেখা শেষ হলে সে সমস্ত তিনি নিজে পড়তেন। প্রয়োজন হলে সংশোধন ও সংযোজন করতেন। মহাকোষকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর মধ্যে জেগে থাকত। দু'তিন সপ্তাহ অন্তর বিভাগীয় সভা ডেকে তা অনুমোদন করে নিতেন। প্রতিদিনই তাঁর কলেজ ও লাইব্রেরীগুলিতে যাওয়া চাই—ট্রামে বা পদব্রজে। তার ওপর অর্থচিন্তা। মহাকোষের মত একটা বিরাট সংকলনের ব্যয় সংকুলন করা সামান্য ব্যাপার নয়। তবুও মহকোষ ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে আর সাময়িকপত্রগুলির সমালোচনায় অকৃপণ প্রশংসা লাভ করতে থাকে। দীর্ঘ কলেবরে ৩৪।৩৫ সংখ্যা বেরুল, দ্বিতীয় খণ্ডের আধাআধি গ্রাহক-সংখ্যা পাঁচশতর উপরে উঠল। প্রায় স্বনির্ভর হবার পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

দীপ নেভার আগে

এই সময়ে একদিন সাহিত্য পরিষদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে হঠাৎ

তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ভাগ্যক্রমে ডাঃ দেবীপদ ঘোষ, কিরণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সেখানে ছিলেন। তাঁরা তখনই তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। চিকিৎসার ভার নিলেন ডাঃ দেবীপদ ঘোষ। যকৃৎ, গ্যাস্ট্রিক ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। একেবারে শয্যাশায়ী। চিকিৎসায় ক্রমে সেরে উঠলেন—ডাক্তাররা তাঁকে ছ'মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। প্রথমত ২।৩ মাস কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হলেন। কর্মঠ মানুষ; তিনি কি শুধু বসে থাকতে পারেন? শুয়ে শুয়েই বই পড়তেন, মাঝে মাঝে কিছু লিখতেন। ডাক্তারের কাছে ধরা পড়ে যেতেন। আবার কিছুদিন চুপ-চাপ।

কোনরকমে সেবার পরিত্রাণ পেলেও বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়ে। নিজেকে জোড়াতালি দিয়ে আবার কাজে নেমে পড়েন ও বিশেষত 'মহাকোষ' নিয়ে। এমনি করে চলতে চলতে আবার ১৩৪৬ সালে ঠিক পূজোর মুখেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার এ্যালোপ্যাথি নয়—কবিরাজী। কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক চিকিৎসার ভার নিলেন। কবিরাজ মহাশয় প্রাণপণ যত্নে ও পরিশ্রমে তাঁকে অনেকটা উন্নতির পথে আনলেন এবং বায়ুপরিবর্তনের জন্য অনুমতি দিলেন। তখন চৈত্রের শেষ। হঠাৎ ২৫এ চৈত্র বাবা আমার দিদির শ্বশুর রায়বাহাদুর জলধর সেনের প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভার আহ্বান করলেন আমাদের যদু মিত্র লেনের বাড়িতে **রবিবাসরের** মাধ্যমে। সে দিন রবিবাসরের সভ্যগণ ছাড়াও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সাহিত্যিক, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। রীতিমত খাওয়া-দাওয়া, আনুষ্ঠানিক আয়োজন হয়। অনেকে এই ব্যাপারে বাবাকে বহু নিষেধ করেছিলেন। বাবা বললেন—এ আমার রোগমুক্তির উৎসব।

সমাপ্তি

এই সময় ঘাটশিলায় কাকাবাবু সপরিবারে ছিলেন। গরম হলেও বাবা সেখানেই যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। শুক্রবার বোম্বে মেলে বাবা রওনা হলেন—সঙ্গে আমার সেজ ভাই শৈলেন। ঘাটশিলায় গিয়ে প্রথম ২ দিন একটু ক্লান্ত হলেও বেশ ভালই ছিলেন, হঠাৎ মঙ্গলবার নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রোগ-যাতনার পুনঃপ্রকাশ হলে সেখানকার ডাক্তার দেখান হয়। ঔষধের জন্য আমার কাছে শৈলেন টেলিগ্রাম পাঠায় সকাল ১০টায়—ঔষধ নিয়ে বোম্বে মেলে যাবার আগে আবার টেলিগ্রামে মৃত্যু-সংবাদ। তখনই আমরা সব চলে যাই এবং তাঁর শেষকৃত্য হয় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে।

ব্যক্তিমানুষটি কেমন ছিলেন

বাবার চরিত্র মাধুর্যও ছিল খুব সুন্দর। সব সময়ে তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। সাংসারিক জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমরা তাঁর সদা-প্রফুল্লতা দেখেছি, কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি। তাঁর একটা বড় গুণ ছিল—পারিবারিক জীবনে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন—আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। খাওয়ানর কথা বলি। তখনকার দিনে যিনি বেশি খেতে ভালবাসতেন তাঁকে বাবা মাঝে মাঝে ডেকে খাওয়াতেন। তখনকার দিনের অনেকের নাম করা যেতে পারে।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন হাওড়ার তিনুদা। শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদক দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের পুত্র অনাথনাথ ভট্টাচার্য। একদিন বাবা কলেজ থেকে ফিরছেন—তিনুদার সঙ্গে দেখা। বাবা তাকে জিগ্যেস করলেন—তিনু, হাওড়া থেকে এসেছ—কি খাবে? তিনুদা গম্ভীরভাবে বললেন—এক হাঁড়ি রসগোল্লা। শ্যামপুকুরের মোড়েই দ্বারিকের দোকান—তখনই এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনালেন।

যদু মিত্র লেনে থাকতে বাবা রোজ সকালে দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে যেতেন—সঙ্গী থাকতেন প্রফুল্লকুমার সরকার, রাজেন্দ্রলাল দে, ডা. উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। রাজেনবাবু শরীর ভাল রাখার জন্য নানারকম উপদেশ দিতেন। একবার বাবাকে বললেন—সকালে পার্কে রোজ বেড়াবেন—এতে স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হবে। বাবা হাসতে হাসতে বললেন—ঠিক বলেছেন—শাস্ত্রেও আছে—'পারং অর্কয়তি ইতি পার্ক'—অর্থাৎ পরপারে যাবার আলো যে দেয় সেই পার্ক।'

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কলেজ ফেরত প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন আর পুরানো কালের গল্প বলতেন। একদিন এক ছাত্র বাবার কাছে এসেছে। পূর্ণবাবু তাঁকে দেখে জিগ্যেস করলেন—ওহে কি পড? ছাত্রটি উত্তর দিলে বাংলা বি. এ.। অমনি প্রশ্ন, বল দেখি—মূর্খ বানান কি? ছেলেটি অবাক্! চুপ্ করে রইল। আবার ধমকের সুরে বললেন—বল? ছেলেটি তখন আস্তে আস্তে বলল—ম-য়ে উ খ য়ে রেফ্। তিনি বেশ জোরে বললেন—তুমি একটি মূর্খ। বর্দ্ধন যদি দর্ঘ হয়, মূর্খ হবে কূর্খ। আবার প্রশ্ন—কলেজ মানে কি? বাবা ছেলেটির দুরবস্থা দেখে বললেন—কলে জন্মতি ইতি কলেজ। ইত্যাদি……।

বাবার আর একটি গুণ ছিল ছাত্র-বৎসলতা। অথবা বাবাকে ছাত্রবন্ধুও বলা যেতে পারে। প্রায় সবসময় দু-একজনছাত্র আমাদের বাড়িতে থেকে

স্কুল বা কলেজে ফ্রি-ষ্টুডেণ্ট হয়ে পড়াশুনা করতেন। তাঁদের মধ্যে এখন অনেকেই কৃতী পুরুষ হয়েছেন। অনেক সপ্তাহে প্রায় ২।১ দিন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করতে আসতেন। কেউ জর্মান, ফরাসী, কেউ ফার্সী, কেউ বা পালি ভাষা। একসময় এক জাপানী আমাদের বাড়ী এসে উঠেছিলেন সংস্কৃত পড়তে। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে সন্ধ্যায় এসে ফল মূল প্রভৃতি খেয়ে মোমবাতির আলো জেলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়তেন। আর একজন আমেরিকান সকালে এসে পড়তেন সংস্কৃত। এটর্নী যতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে থাকতেন। একদিন শুনলুম তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'কালিদাস'। আরো আরো কত ছাত্র।

বাবার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা বহু ছাত্র, বন্ধু, সহাধ্যায়ী, গবেষক, পণ্ডিতগণ বহুবার বহুস্থলে উল্লেখ করেছেন। আমরাও স্বচক্ষে তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখেছি। একবার যা পড়তেন—তা যেন তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে থাকত। হাজার হাজার দামী দামী বই বাড়ীতে সাজানো—তার মধ্যে যখন যে তথ্য দরকার হত —তখনই তিনি অমুক বইয়ের অমুক অধ্যায় অথবা অত পৃষ্ঠায় শেষের দিকে দেখ—এমন কি সাময়িকপত্রের সেই সময়ে কি প্রকাশ হয়েছে—তাও বলতেন। বিশেষত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সংকলনের সময় বিচিত্র তথ্যের কথা মুখে মুখে তাঁর সহযোগীদের বলে দিতেন—তা তাঁরাও অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

আরও কত কথা আছে।

এইখানেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পিতৃ-স্মৃতি শেষ করলুম।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(১৮৭৯-১৯৪০)

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

বহুভাষাবিদ শিক্ষাব্রতী ও মনস্বী লেখক পণ্ডিত প্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রবন্ধের যে ধারা বঙ্গসাহিত্যে রামমোহন থেকে সুরু করে বঙ্কিম বিদ্যাসাগর প্রমুখের মধ্য দিয়ে এযাবৎ প্রবহমান ছিল, অমূল্যচরণ ছিলেন সেই ধারারই একজন উত্তর সাধক। আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ ভারতীয় ঐতিহ্যের মুগ্ধ উপাসক অমূল্যচরণ ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিক প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত সারস্বত সাধকরূপে কেবল এদেশে নয়, সারা ভারতে নিশ্চিত স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁর মত এমন বিচিত্র সর্বত্র-গামী প্রতিভা বিরল।

অমূল্যচরণের মত ছাব্বিশটি ভাষার পারদর্শী সুপণ্ডিত একমাত্র হরিনাথ দে ছাড়া আর কেউ এদেশে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও পরিধি ছিল কিরূপ বিস্ময়কর তা তাঁর ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ নিবন্ধাদি পাঠ করলে বোঝা যায়। তদানীন্তন বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাই তাঁর কাছে আসতেন নানা জটিল তথ্য সংগ্রহ করতে। আসতেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য মনীষী। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন :

অমূল্যচরণের অগাধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্ন সংগ্রহ করবার জন্যে এসেছেন কত শ্রেণীর কত অনুসন্ধিৎসু লোক। কেউ সাধারণ প্রবন্ধ লেখক, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক। অমূল্যচরণ ছিলেন যেন মূর্তিমান বিশ্বকোষ। প্রায়ই কোন পুস্তকের পাতা না উল্টেই মুখে মুখে দিতে পারতেন প্রশ্নের উত্তরে দুর্লভ তথ্যের সন্ধান। যেমন বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি, তেমনি বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। এই জন্যই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রশ্ন করে তাঁকে লিখেছিলেন : তোমার তো সব নখদর্পণে। এক লাইন লিখিয়া তোমার মতামত জানাইবে।" (যাদের দেখেছি, ২য় পর্ব, পৃঃ ১১৭)।

অমূল্যচরণ কলিকাতা ৫২।১, বিডন স্ট্রীট মঙ্গলবার ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর [২৪ অগ্রহায়ণ ১২৮৬ সাল] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার নৈহাটি। তার পিতা ও মাতার নাম শ্রীউদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার ও শ্রীমতী যদুমনি দেবী। এবা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ও মজুমদার এই বংশের নবাব প্রদত্ত উপাধি।

অমূল্যচরণ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় কলকাতার "কেশব একাডেমী" নামক বিদ্যালয়ে। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাঁর মনকে কখনও তিনি আবদ্ধ করেননি। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ছিলেন তখন এই বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত। তিনি অমূল্যচরণের অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনার অলৌকিক শক্তি দেখে মুগ্ধ হন। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের একজন স্মরণীয় শিক্ষক ও সাহিত্যিক। তিনি স্নেহবশত অমূল্যচরণের বাড়ী আসেন এবং তাঁকে উৎসাহিত করেন। তাঁর আয়াস ও যত্নে অমূল্যচরণের শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে উপাধি পরীক্ষা দেন।

অমূল্যচরণ এই সময়ে মন্মথ দত্ত পরিচালিত ইংরাজী পত্রিকা The Queen-এ অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন এবং তিনি মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিকে ইংরাজী থেকে বহু প্রবন্ধ বাংলায় তর্জমা করে দেন। তাঁর বাড়ীর পাশে ছিল গৌরহরি সেন প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য লাইব্রেরী। অমূল্যচরণ উক্ত গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পাঠকালেই পড়ে ফেলেন এবং নবম শ্রেণীতে পাঠ করবার সময়ে তিনি বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন। সেই সময় তিনি ইহুদী কোহেন সাহেবের ছেলেকে সংস্কৃত পড়িয়ে পঞ্চাশ টাকার মত রোজগার করতেন। এই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার-এর সূত্রপাত করেন।

অমূল্যচরণ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জেনারেল এসেমব্লি ইন্সটিটিউ-শনে এফ. এ. অধ্যয়নের সময় আরো দশটি ভাষায় তার অধিকার জন্মে। বাল্যকাল থেকে ভাষা শিক্ষা ছিল অমূল্যচরণের একটা hobby বা ঝোঁক যার জন্য কলেজের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীক ও বাড়ীতে মৌলভী রেখে উর্দু ও ফারসী শিখে নেন। এই সময় বাংলা ছাড়া হিন্দী উর্দু আরবী ফারাসী ওড়িয়া নেপালী আসামী তামিল তেলেগু ইংরাজী ফরাসী জার্মান রুশীয় সংস্কৃত লাটিন গ্রীক হিব্রু পোর্তুগীজ পালি প্রভৃতি ছাব্বিশটি ভাষায় তিনি

পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময় তাঁর অধ্যাত্মপিপাসা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি "প্রেয়ার ফ্রেটারনিটি"র (Prayer Fraternity) সদস্য হন।

অমূল্যচরণ এফ. এ. পরীক্ষার সময় ভীষণ শিরোপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কাশী যান এবং সেখানে সুস্থ হবার পর তিনি কাশী চতুষ্পাঠিতে যোগদান করেন ও সেখান থেকেই তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলকাতায় ফিরে এসে অমূল্যচরণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ভাষা থেকে চিঠিপত্র অনুবাদ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন Translating Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অধ্যাপকের নামে ভারতে তিনি ভাষা শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় "এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন" স্থাপন করেন। মিশনারীদের ডাভটন কলেজে ১৯০২ খ্রীঃ তিনি প্রথমে লাটিন ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন (বর্তমানে "বিদ্যাসাগর কলেজ") পালি, হিন্দী ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত [২৫ এপ্রিল ১৯৪০] তিনি উক্ত পদে প্রধান হিসাবে ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষার দাবী উত্থিত হলেও তা কার্যে পরিণত হয় বঙ্গভঙ্গের পর। ১১ মার্চ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) , জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন অরবিন্দ ঘোষ ও তত্ত্বাবধায়ক হন সতীশবাবু। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অমূল্যচরণ যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি পড়ান বাংলা, হিন্দী, পালি ও বিদেশী ভাষার মধ্যে ফরাসী ও গ্রীক। শ্রীঅরবিন্দ সেখানে পড়াতেন হিন্দু ও শিখ আমলের ইতিহাস। আলিপুর বোমার প্রসিদ্ধ মামলায় শ্রীঅরবিন্দ যখন গ্রেপ্তার হন, তখন বিদ্যাভূষণ মশায়ের উপর উক্ত বিষয়গুলি পড়াবার ভার অর্পণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রচার ও ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন প্রয়াসে স্বদেশী যুগে অমূল্যচরণের অবদান বড় কম নয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন, যেমন ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে। এই দুটি স্থানকে বলা যায় তাঁর জ্ঞানচর্চার পীঠভূমি। এই সময় অমূল্যচরণের 'বাণী' নামক একটি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্রের প্রকাশনা ও সম্পাদনা এবং "বাণী প্রেস" স্থাপন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৩১২ সাল থেকে ১৩১৯ সাল

পর্যন্ত এই পত্রিকা সগৌরবে চলে। প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় "ভারতবর্ষ" নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি দেন। ১৩২০ সালের বৈশাখ মাস থেকে উহা প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অকস্মাৎ মৃত্যুতে উহা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় আষাঢ় মাস থেকে প্রকাশিত হয়। অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তাঁর বৈবাহিক জলধর সেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় একবছর পরে তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যায় তিনি যে রচনাটি প্রকাশ করেন তা পাঠ করলে পাঠকের হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অমূল্যচরণের সম্পাদিত "সঙ্কল্প", "মর্মবাণী", "পঞ্চপুষ্প" প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আকারে প্রকারে ও রচনায় সঙ্কল্প ছিল ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর প্রবর্তিত নিজস্ব পত্রিকা ছাড়া তিনি অচিন্ত্য মিত্রীয় শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, শ্রীভারতী, কায়স্থপত্রিকা প্রমুখ মাসিক পত্রিকা এবং ইংরাজী ত্রৈমাসিক Indian Academy of Art বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। এই সমস্ত পত্র পত্রিকায় তার সংস্কৃতিক প্রবন্ধ আজও আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। গুণগ্রাহিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। লেখককে আত্মপ্রকাশের সুযোগ তিনি যেরূপ দিতেন, সেরূপ সুযোগ আজকাল কেউ দেন বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে 'মর্মবাণী' পত্রিকায় (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৯) কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন :

তারপর (আমি) যখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি—তখন একদিন কলেজের পথে 'বাণী' পত্রিকার অফিসে গেলাম। সেখানে ছিলেন কবি করুণানিধান, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র ব্রজেন বন্দ্যো প্রভৃতি কবিতাটি শোনাইলাম। তাঁদের সকলেরই কবিতাটি ভাল লাগিল। অমূল্যবাবু কবিতাটি একরূপ কাড়িয়া লইলেন 'বাণী'তে ছাপিবেন বলিয়া। 'বাণী' উঠিয়া গেল। অল্পদিন পরে অমূল্যবাবু 'ভারতবর্ষের সম্পাদক হইলেন। 'ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইল—"নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে শিক্ষাকোষ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম, বিদ্যাপতি, ভক্তমাল, শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত ও ইংরাজী ভাষায় রচিত SHEIR MUTAKSERIN VOL I. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির সম্পাদনায় তিনি যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যায় "বঙ্গীয় মহাকোষ" (Encyclopaedia

Bengalensis) এতে অমূল্যচরণের বিদ্যাবত্তা ও একাগ্রতা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর সফলতা কামনা করে তাঁকে বঙ্গদেশের পক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা চিঠিখানি অমূল্যচরণের শতবর্ষ স্মরণিকায় ছাপা হয়েছে। সেকালে কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কতকগুলি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের কেবল তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা। অমূল্যচরণ কিন্তু সাহিত্যিকদের এই রকম দলাদলি করা একেবারে পছন্দ করতেন না। যদিও তাঁর 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তখন একটা সাহিত্যিক-গোষ্ঠী ছিল। অমূল্যচরণের এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউটে এই গোষ্ঠীর বৈঠক বসতো প্রতি সন্ধ্যায় প্রবীণ নবীন সকলের সঙ্গে তাঁর ছিল সমান অন্তরঙ্গতা, সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে খুব আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। অমূল্যচরণ নির্দল ছিলেন বলে তাঁর বৈঠকে প্রবীণদের মধ্যে আসতেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, কবি বনোয়ারীলাল গোস্বামী, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি। আর নবীনদের মধ্যে ছিলেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধ নিয়ে যখন বঙ্গ-সাহিত্যে বাদ-প্রতিবাদ ও সমালোচনা চলছিল তখন বিরোধী পক্ষে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যদুনাথ সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ও রবীন্দ্রপক্ষে প্রিয়নাথ সেন অজিত কুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাঁরা যখন রবীন্দ্র সমালোচনায় পঞ্চমুখ তখন একমাত্র অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাণী' পত্রিকাগোষ্ঠীর সদস্যগণ ছিলেন রবীন্দ্র বিরোধের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় ১৩৬১ সালে শারদীয়া যুগান্তরে যা লিখেছিলেন, তার কয়েক লাইন উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন:

"এই (রবীন্দ্রবিমুখ মানসী, ভারতী প্রভৃতি) দলাদলির বাইরে একটা সাহিত্যিকগোষ্ঠী ছিল,—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন চারুচন্দ্র মিত্র, গিরিজা বসু, কবিবর করুণানিধান, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সুধীন ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে এই গোষ্ঠীতে ধরা যেতে পারে। জলধর সেনও ছিলেন, কিন্তু তিনি বক্তা ছিলেন না, শ্রোতাও ছিলেন না, নীরবে চুরুট টানতেন। এঁরা কবিবর দেবেন্দ্র সেনের খুব ভক্ত

ছিলেন। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় আসর জমাতেন। তখন এরা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন।"

অমূল্যচরণ বিভিন্ন ভাষার অধ্যাপক রূপে জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় ছিল জ্ঞান সাধনা, বিশেষ করে ভারতবিদ্যার সকল দিক উন্মোচন। ভারতবিদ্যা বলতে ভারতীয় জাতির সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সমাজ প্রভৃতি বোঝায়। এগুলি সংগ্রহ করতে তিনি পৃথিবীর নানা ভাষায় প্রকাশিত নানা তথ্যের উপর নির্ভর করে গবেষণা করেন এবং ভারতের অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্য শিক্ষিত সুধী মণ্ডলীর সামনে উন্মুক্ত করে দেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে জ্ঞানীগুণীগণের ধন্যবাদার্হ হন। 'প্রাচীন ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে প্রাচীন সংস্কৃতি বুঝতে হলে প্রথমে সন্ধান করতে হবে ভারতের প্রকৃতি। যথা :

"প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বলিলে আমরা বুঝি প্রাচীন ভারতে আর্য ও আর্যেতর জাতির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সাহিত্যের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাই তাহাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোন জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে। আর্যের সমস্যা হয়তো আর্যেতর সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে পুরাতন ভারতের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমেই লইতে হইবে।"

অমূল্যচরণের মত বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তির নাতিদীর্ঘ জীবনকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা মাত্র দশটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সরস্বতী, চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী ও গনেশ, মহাভারতের কথা, ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য। পুস্তকাকারে তাঁর রচনা অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে, তাই বাংলা সাহিত্যের বহু লেখক তাঁদের পুস্তকের প্রবন্ধালোচনায় অমূল্যচরণকে দেখতে পান নি, এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাঁর সাময়িক পত্রিকায় আবদ্ধ অসংখ্য প্রবন্ধরাশির একটি তালিকা অমূল্যচরণের শত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রকাশ করেছেন। উক্ত তালিকায় চোখ বোলালে বোঝা যায় যে ভারতের

পুরাতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-লিপিতত্ত্ব-মূর্তিতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব অগ্রন্থবদ্ধ জনশিক্ষামূলক নষ্টপ্রায় প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রণের ব্যবস্থা করলে দেশের মহোপকার সাধন করবেন। কারণ এই সব অমূল্য প্রবন্ধ বিদ্বৎজনমণ্ডলের উদ্দেশ্যে কেবল রচিত হয়নি, বিভিন্ন ভাষা থেকে গবেষণালব্ধ এই সব প্রবন্ধরাশি বাংলায় তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ পাঠকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে "বাংলায় প্রথম" এই শিরোনামায় অমূল্যচরণের আটটি প্রবন্ধের উল্লেখ করবো। প্রবন্ধগুলির নাম : প্রথমবাংলা ব্যাকরণ, প্রথম বাংলা অভিধান, ফরাসী-বাংলা অভিধান, প্রথম সচিত্র পুস্তক, প্রথম সাংবাদপত্র, ইউরোপীয়গণের দ্বারা প্রথম বাংলা বই, ও প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। সম্প্রতি এগুলি একত্রে গ্রথিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এ ছাড়া অমূল্যচরণ ফরাসী, লাতিন ও ফার্সী থেকে অনুবাদ করে তিনটি বই প্রকাশ করেছেন এবং সংস্কৃত থেকে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত বাংলায় ও যথাক্রমে জাতকের ইংরাজী অনুবাদ Lord Rashabha's Parbhavas (লর্ড রাসভ পূর্বাভাস) নামে প্রকাশ করেন। তাঁর বহু রচনায় তিনি শ্যামল বর্মা ও সত্যব্রত বর্মা এই দুটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৯ এই সাত বছর অমূল্যচরণ ছিলেন ত্রিপুরা রাজের "কোর্ট হিস্টোরিয়ান" অর্থাৎ 'রাজ ঐতিহাসিক'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটি ও বানান সংস্কার সমিতির সদস্যরূপেও তিনি কাজ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ও রবিবাসরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রবিবাসরে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করে ছিলেন। তার মধ্যে বঙ্গভাষার কথা (২৪ চৈত্র ১৩৪৩) ও ভারতের রাষ্ট্র ভাষা (১৩৪৫) নামক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কীয় দুটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অমূল্যচরণ তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৩৪২ সালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি ও ১৩২৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। উনিশ শতকে বহুমুখী সৃষ্টির মাঝে বহুভাষাবিদ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অবদান ছিল অসামান্য। জীবনে নিরহংকারী বন্ধুবৎসল মৃদুভাষী গুণগ্রাহী সৌম্যশান্ত নম্র সাহিত্যিক অহমিকা বর্জিত এই পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

অমূল্য স্মৃতি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ইং ১৯৩০ সাল। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষা সামনের বছরে কিন্তু সাহিত্যরূপী কচ্ছপেব আক্রমণে পড়েছি।

স্কুল থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজার ষ্ট্রীটেব সাহিত্য-মজলিশে নিত্যকারের আড্ডায় যাওয়া চাই-ই। আড্ডাটি বসতো তখনকার প্রসিদ্ধনামা কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জীবনচরিত লেখক স্বর্গত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মশায়ের বাসভবনে। নলিনী পণ্ডিতের মধ্যম পুত্র দেবরঞ্জন ছিলেন আমার সমধ্যায়ী বন্ধু। পণ্ডিত মশায়ের বাড়ির সবাই সাহিত্যানুরাগী, কেউ লেখক, কেউ সঙ্গীতশিল্পী, কেউবা আবার চিত্রশিল্পী। আর তখনকার কালেব খ্যাতিমান সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, শিল্পী, গবেষক, অভিনেতা—প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের সমাবেশ ঘটত।

কি কারণে জানিনে, আমি পণ্ডিত মশায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম,—আমার তখন বালখিল্য রচনা, কিন্তু পণ্ডিতমশায় নাকি তারই মধ্যে সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছিলেন।

বাংলার বাউল সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব গবেষণার কাজে পণ্ডিতমশায় রত ছিলেন। তাঁব একাজে বইপত্তব বেব কবা, পৃষ্ঠায় দাগ দেওয়া অংশগুলি চোখের সামনে মেলে ধরার কাজে তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গে আমিও সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম।

এমন দিনেই একদিন বিকেলে পণ্ডিত গৃহে উপনীত হলেন পণ্ডিত প্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধির রেখা—দেখলাম অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে। তাঁর নাম জানতাম পঞ্চপুষ্পের সম্পাদক রূপে। তখনকার দিনে 'পঞ্চপুষ্প' নামকরা মাসিক পত্রিকা। কয়েকটি সংখ্যা পড়বারও সুযোগ হয়েছিল আমার। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত ঘোষ ছিলেন আমার ছোড়দার সহপাঠী বন্ধু। সেই সম্পর্কে আমার অজিতদা। অজিতদা পঞ্চপুষ্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—মধ্যে মধ্যে দু' এক সংখ্যা আমরা তাই পেতাম।

সে যাই হোক—স্কুলে সংস্কৃত উপক্রমণিকা-ভীতিই আমার মধ্যে পণ্ডিত ভীতির সঞ্চার করেছিল,—অতএব পণ্ডিত পদবীকে ভয় না পেলেও পুরোভাগের

ব্যবহৃত পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার ভয় কিন্তু পুরোপুরিই ছিল। ব্যাকরণগত শব্দ ব্যবহারে ভুল আর বানান ভুলের জন্যেই বোধহয় এই পণ্ডিতভীতি।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে দেখে তাই সভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু নলিনী পণ্ডিতমশায় আমাকে ধরে তাঁর কাছে সমুপস্থিত করে হাসতে হাসতে বললেন—ছেলেটির লেখায় হাত আছে; কিন্তু পণ্ডিতভীতি—

নলিনী পণ্ডিতের কথায় পরিহাস রসিক পণ্ডিত অমূল্যচরণ নিজেই পণ্ডিত শব্দের ব্যাখ্যা করে বললেন,—'সর্বকর্মং পণ্ডয়তি যঃ স পণ্ডিতঃ।

এরপর আরেকদিন মাত্র দেখেছিলাম তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে। বোধকবি ইংরেজি ১৯৩৩ সাল। পঞ্চপুষ্প তখন উঠে গেছে।

আমাকে চিনলেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়। বললেন, দেখলেতো পণ্ডিতের পণ্ডয়তি। পঞ্চপুষ্প উঠে গেছে।

কিন্তু পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কৃতিত্বময় জীবন-পঞ্জীর পাতা ঘাঁটলে কিছুতেই তা বলে পণ্ডয়তি পণ্ডিত বলে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না।

কিন্তু সে আলোচনা থাক। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা পণ্ডিতজনরাই আলোচনা করবেন। আমি আজ তাঁর পরিহাসিক জীবনের দু' একটি চুটকী গল্পের কথা বলি।

শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদক দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের পুত্র অনাথনাথ ভট্টাচার্য হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন। একদিন হাওড়া থেকে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের শ্যামপুকুরের বাড়িতে অনাথবাবু উপস্থিত হলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজে ভোজনরসিক ছিলেন। খেতেও যেমন ভালোবাসতেন খাওয়াতেও তেমনি! অনাথবাবুর ডাক নাম তিনু।

বিদ্যাভূষণ মশায় বললেন, 'তিনু এতদূর থেকে এসেছ, নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। কি খাবে বল?

তিনু পরিহাসছলে উত্তর দিলেন, 'এক হাঁড়ি রসগোল্লা।'

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়েই দ্বারিক ঘোষের মিষ্টির দোকান। বিদ্যাভূষণ মশায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনালেন। বত্রিশটি রসগোল্লা কিন্তু তিনুকে খেতেই হল।

বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাড়িতে রোজই বৈঠক বসত। সে বৈঠকে শুধু পাণ্ডিত্যেরই যে আলোচনা হত তা নয়। রসালাপে সে আসর প্রায়ই ভরা থাকত।

একটি ছোট্ট কাহিনী বলি, কাহিনীটি বিদ্যাভূষণ মশায়ের পুত্র বন্ধুবর গৌরাঙ্গ কুমার ঘোষের কাছ থেকে শোনা।

একদিন বিদ্যাভূষণ মশায়ের আড্ডায় গীতারত্ন জিতেনবাবু এসে হাজির। জিতেনবাবু পেশায় এ্যাটর্নী হলেও নেশায় ছিলেন বিশেষ সাহিত্যানুরাগী। বিশেষ করে গীতার তত্ত্ব তথ্য নিয়ে আলোচনায় প্রায়ই তিনি বিদ্যাভূষণের বাড়িতে আসতেন।

জিতেনবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে অমূল্যচরণ বললেন, 'এসো হে গীতারত্ন। তুমি গীতাজ্ঞ, রত্নও বটে। আচ্ছা বলতো গীতার এই শ্লোকটির অর্থ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

গীতারত্ন ব্যাখ্যা করলেন, 'আমি বৈকুণ্ঠবাসী নই, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি নে। আমাব ভক্তের যেখানে বাস সেখানেই আমার অধিবাস।

হেসে বিদ্যাভূষণ মশায় বললেন 'হল না।

'হল না মানে?

শোন আমি ব্যাখ্যা করি, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি বৈকুণ্ঠের অধিবাসী নই, তা হলে কোথায় থাকি? 'মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি' মানে কিনা, মদের ভক্তেরা যেখানে থাকে সেখানেই আমার বাস। নারদ,—অর্থাৎ না-রদ মানে রদ নেই। তা হলে এবার বোঝ শ্রেষ্ঠ ভক্ত কারা?

এইরকম বহু বৈঠকীরস রসিকতায় পণ্ডিত প্রবর অমূল্য বিদ্যাভূষণমশায় মুখর থাকতেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য শুধুই শুষ্কং কাষ্ঠং ছিল না, তা রসাশ্রিত হত। অর্থাৎ শুধু মুখের কথায় নয় তাঁর রচনার মধ্যেও অতিশয় গুরুতর বিষয়বস্তুও সাহিত্য পরিবেশনের রসে সহজপাচ্য এবং মনোহরত্ব লাভ করেছে। আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের কাছে অমূল্য বিদ্যাভূষেণর এই সাহিত্যিক পরিচয় বড় কম গৌরবের কথা নয়।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের শতবর্ষ জীবনের পরিধিতে তিনি ইহজগতে না থাকলেও আমাদের কালের সাধারণ পাঠকেরা আজও তাঁর সাহিত্য সান্নিধ্য লাভে ধন্য।

এই ডিসেম্বরে ('৮০) তাঁর জন্মশতবর্ষের আরম্ভ। এমনদিনেই রবিবাসরে আমরা সমবেত হয়েছি রবিবাসরের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে।

আজকের রবিবাসর বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ছে। ইংরেজি ১২ই এপ্রিল তারিখে ১৯৩৯ সালে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের এক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে তদানীন্তন রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অমূল্যচরণ এক অনুরোধপত্র পান।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

১২ই এপ্রিল নৈহাটীতে রবিবাসর। দাদা (জলধর সেন) অসুস্থ—কাজেই আপনাকে সভাপতিত্ব করিতে হইবে। পত্রে তাহাই ছাপাইবার ব্যবস্থা করিব। ঐদিন আপনি দয়া করিয়া অন্য কোন সভা-সমিতির আহ্বান লইবেন না—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য পত্র দিতেছি। তাহাতে ত আপনার কোন আপত্তি হইবে না। আশাকরি কুশলে আছেন। ইতি স্নেহধন্য শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

সে সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল আজকের সভাটি তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই স্মৃতিমুখরতায় ভরে উঠবে।

অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাসভবনে আড়ম্বরে অনেকবার রবিবাসরের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে জানি, রবিবাসরের দশমবর্ষের শেষ অধিবেশনটির কথা। বাংলা সন ১৩৪৬ সাল, ২৫শে চৈত্র। পঞ্চম বার্ষিক জলধর স্মৃতি তর্পণের আহ্বানকারী ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ৫নং যদু মিত্র লেন, শ্যামবাজারের বাসভবনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জলধর স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, অমূল্যবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত জলধরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়েছিল। জলধর সেন ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বৈবাহিক।

বিদ্যা অহংকার না হয়ে বিদ্যাভূষণের মনের অলংকার হয়েছিল। তাঁর সাংবাদিক জীবনও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের প্রথম বছরে, বাণী, মর্মবাণী, সংকল্প, পঞ্চপুষ্পের সাজি সাজিয়েছিলেন তিনি বঙ্গভারতীর পাদপীঠে।

বাঙালি আত্মবিস্মৃতজাতি এ অপবাদ চিরদিনের। রবিবাসর ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আজ স্মরণ-সভা ডেকে তাঁর প্রতি জন্ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সাহিত্যকৃতিকে যে স্বীকৃতি দিচ্ছেন—এটুকুই বা কম কথা কী?

ছাত্রবৎসল আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

ডকটর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি-এইচ-ডি

১৯২৮ সনে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হই, তখন জগন্নাথ 'হল' (Hall)-এর আবাসিক ছাত্র হই, কারণ, তার প্রথম অধ্যক্ষ ('প্রভোষ্ট্') ডকৃটর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সময় থেকেই সেখানে একটি সাহিত্য চর্চার আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের হিন্দু ছাত্রদের অন্যতম 'হল' ঢাকা হল খেলাধূলার দিক থেকে এক গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল বলে সেখানে সাধারণতঃ খেলাধূলা বিষয়ে যারা উৎসাহী তারা ঢাকা 'হলে'রই আবাসিক ছাত্র হতো। কিন্তু জগন্নাথ 'হল' খেলাধূলার দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশেষ অগ্রসর ছিল। জগন্নাথ 'হলে'র সাহিত্য বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগ, নাট্য বিভাগ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল, কারণ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই জগন্নাথ হলেরই ছাত্র ছিলেন। সকলেই যে আবাসিক ছাত্র ছিলেন, তা নয়। অনেকেই বাইরে থেকেও তার সঙ্গে প্রশাসনিক যোগরক্ষা করে চলতেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে পরবর্তী কালে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়, কবি অজিতকুমার দত্ত, কবি-ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু এঁরা সকলেই জগন্নাথ 'হলে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই আমারও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল, সেইজন্য আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে জগন্নাথ 'হলে'রই আবাসিক ছাত্র হলাম। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন জগন্নাথ 'হলে'র অধ্যক্ষ বা 'প্রভোষ্ট্'।

আমি যখন গিয়ে প্রথম ভর্তি হলাম তখন আচার্য রমেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে তখনকার আইন বিভাগের ডীন্ স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ অস্থায়ী ভাবে জগন্নাথ হলের অধ্যক্ষ বা 'প্রভোষ্ট' নিযুক্ত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আচার্য মজুমদার ফিরে এসে কার্যভার গ্রহণ করলেন। তখন তিনি একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ এবং জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট্। বি.এতে ইতিহাস আমার পাঠ্য বিষয় ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে ইতিহাস বিভাগে সাময়িকভাবে আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইতিহাসে অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর নাম ডকটর হেমচন্দ্র চৌধুরী। আচার্য রমেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনি আমাদের ভারতের ইতিহাস পড়াতেন।

জগন্নাথ হলে প্রতি বৎসর ছাত্র সমিতি গঠিত হতো, তাতে যে নির্বাচনী তৎপরতা চল্‌তো, তা বিধান সভার নির্বাচনী তৎপরতা থেকে কোনো অংশেই কম হতো না। প্রচারপত্র ছাপিযে ছাত্রদেব ঘরে ঘরে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তা' বিতরণ করা হতো, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেব মধ্যে পরস্পব প্রতিযোগিতা-মূলক তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ত। নির্বাচনের দিন বড বড প্রাচীর পত্র লিখে নির্বাচন-কেন্দ্রের দিকে দিকে টানিয়ে দেওয়া হতো। সাধাবণতঃ দল-ভিত্তিক নির্বাচন হতো, তবে দলেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার দৃষ্টান্তও কম ছিল না। যাতে এই নির্বাচন কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে দিকে প্রভোষ্ট এবং দুইজন 'হাউস টিউটব' অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বর্গত অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ বিশেষ যত্ন নিতেন। কোনদিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। সামান্য কোনো কিছু ঘটলে তা তাঁদের স্নেহ-তিরস্কারের মধ্য দিয়েই মীমাংসা হয়ে যেত।

প্রথম বছব থেকেই আমি এই সকল নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ কব্‌তে আরম্ভ করি। অবশ্য ভর্তি হবার প্রথম বছরেই আমি নির্বাচনে প্রার্থী হই নি, তবে যে দলটিকে আমি সমর্থন কবেছিলাম, সেই দলটি জয়লাভ করার ফলে আমি একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হই—তা সাহিত্য শাখার সহকারী সম্পাদক। এব আগেব বছব সাহিত্য শাখার সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু এবং পরের বছর তাঁরই একজন সহপাঠী শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। খগেন্দ্রবাবু মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পডাশোনায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন তিনি, ছাত্র সমিতির কাজে বিশেষ মন দিতে পাবতেন না, সেইজন্য তিনি তার সকল দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমি পডাশোনা একরকম জলাঞ্জলি দিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের কাজ নিয়ে মেতে থাকতাম। তখন ছাত্র ইউনিয়নের কাজ বল্‌তে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক কাজ বোঝাত, রাজনৈতিক কাজ বোঝাত না, কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থতার জন্য খগেন্দ্রবাবু ক্লাশ কামাই করে বাড়ী চলে গেলেন, সাহিত্য বিভাগের সকল ভারই আমার উপর পড়ল।

জগন্নাথ হল ছাত্র ইউনিয়নের সাহিত্য শাখার দুটি প্রধান কাজ ছিল—একটি

'বাসন্তিকা' নামে বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা, দ্বিতীয়টি ছিল, বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা তিথিতে একটি মনোরম সাহিত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হতো, তা বসন্তোৎসব নামে সে দিন ঢাকাবাসীর নিকট পরম উপভোগ্য ছিল। 'বাসন্তিকা' নামে যে বাৎসরিক সাহিত্য সঙ্কলনটি ছাত্র-ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হতো, তাব তখন সম্পাদক হিসাবে অধ্যক্ষের নাম থাকৃত কিন্তু সকল দায়িত্ব সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের উপরই ন্যস্ত থাকত। সেই বছর যখন 'বাসন্তিকা' প্রকাশিত হয়, তখনও আচার্য রমেশচন্দ্র বিদেশ থেকে ফিরে আসেন নি, সুতরাং অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের নামই সম্পাদক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই আচার্য রমেশচন্দ্র ফিরে এসে জগন্নাথ হলের সকল ভার নিলেন। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে খুব ঘটা করে একদিন বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানানো হলো।

দ্বিতীয় বছরেই আমি সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদকেব পদ প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলাম। অনেক ভোটে জয়লাভ করলাম। সাহিত্য শাখাব কাজ যথারীতি আবম্ভ হলো, তার সভাপতি আচার্য রমেশচন্দ্র এবং সম্পাদক আমি। সাহিত্য বিভাগের কাজেব মধ্যে বিতর্কসভা, বক্তৃতাসভা, বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসন্তোৎসব ইত্যাদির আয়োজন কবা। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে সভাপতিব পবামর্শ নিতে হতো, তিনিও তাঁর ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর বাড়ীতে প্রভোষ্টে'ব অপিসে কিংবা অন্যত্র যেখানেই হোক সর্বকার্যে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কবতে কখনো বিবক্তি বোধ করতেন না, এই বিষয়ে ক্ষুদ্রতম দায়িত্বটুকুকেও তিনি কদাচ এড়িয়ে যেতেন না।

ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের পরই 'বাজেট অধিবেশন' হতো। তাতে সকল সম্পাদকই নিজের বিভাগের জন্য বেশি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরত। কিন্তু টাকার পরিমাণ কম তথাপি আচার্য মজুমদার সকল বিভাগকেই খুসী রাখবার চেষ্টা করতেন।

কোনো সভার আয়োজন করলেই কার্যসূচীটি প্রভোষ্ট্কে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। একবার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাতে একটি বিষয়ে লেখা ছিল Dance বা নৃত্য। অনুষ্ঠান সূচীটি তাঁকে দিয়ে অনুমোদন করাতে নিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আবার কি? কার নৃত্য?

আমি খুব বিনীত ভাবে বললাম, একটি সাত আট বছরের মেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালে তালে নাচবে, তার মা কাছে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইবেন।

তিনি গম্ভীর ভাবে আর কিছু না বলে Dance বা নৃত্য কথাটি কেটে সেখানে Action song এই কথা দুটি লিখে দিলেন। প্রকাশ্য মঞ্চে সে দিন ঢাকা সহরে মেয়েদের নৃত্যের তখনও প্রচলন হয়নি।

কর্মজীবনের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আচার্য রমেশচন্দ্র ছাত্রদের যে কত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও খোঁজ রাখতেন এখানে তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করে পারছি না। ছাত্রজীবনে আমি খুব দুরন্ত ছিলাম, অনেককে অনেক সময় অকারণে বিরক্ত করতাম। এখন তার জন্য মধ্যে মধ্যে অনুতাপ করি।

জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ীতে (South House) আমি আবাসিক ছাত্র ছিলাম। সেখানে ছাত্ররাই পালা করে পনর-দিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হাতে নিত, তাকে 'ম্যানেজার' বলত। একবার এক ম্যানেজার খুব খারাপ খাওয়া দিতে লাগল। তার দোষই বা কি? ছাত্রেরা মাসে ৮ টাকা খাবারের বাবত দেয়, তাতে পনের দিন পর একটি 'ভোজ' ও দিতে হয়! ছাত্রেরা ম্যানেজারকে টিট্‌কারি দিত, কিন্তু তাতে তার কোনো চৈতন্য হতো না। একদিন আমার এক সহপাঠী আমাকে এসে তার কিছু প্রতিকার করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার অনুরোধ, আমি একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে নোটিশ বোর্ডে এঁটে দিই। যাতে আমি সেই কবিতা লিখেছি বলে কেউ বুঝ্‌তে না পারে, সে জন্য সেই ছাত্রটি তার নিজের হাতে কবিতাটির একটি অনুলিপি করে দিতে স্বীকৃত হলো।

তথাপি জান্‌তাম, আমি ধরা পড়ব। ম্যানেজার আমাদের অপেক্ষা চার ক্লাস ওপরে পড়ত, সুতরাং আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাকে ব্যঙ্গ করলে অপরাধ হবে, সে 'প্রভোষ্টে'র কাছে বিচার প্রার্থী হতে পারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতা লিখলাম। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার একটি লালিকা (Parody)। কবিতাটি আমার সহপাঠী একটি অনুলিপি করে নোটিশ বোর্ডে রাত্রে গোপনে গিয়ে এঁটে দিল। এমন ভাবে আঁটা দিয়ে দিল যে তা ছেঁড়াও যায় না, তোলাও যায় না। যথা সময়ে অধ্যক্ষের নিকট নালিশ করা হলো, নালিশের প্রথম কথা অর্বাচীন একজন ছাত্র প্রবীণ ছাত্র-ম্যানেজারকে কবিতা লিখে ব্যঙ্গ করেছে, তার শাস্তি চাই। বলা বাহুল্য,

অধ্যক্ষের হস্তাক্ষর থাকলেও তার রচয়িতা হিসাবে আমার নামটি তাতে গোপন রইল না, কারণ, ইতিমধ্যেই আমার কবিত্বের খ্যাতি কিছু বিস্তার লাভ করেছিল। সোজাসুজি আমার নাম করেই লিখিত ভাবে নালিশ করা হলো। প্রভোষ্ট সে নালিশ 'সরকারীভাবে' গ্রহণ করে ম্যানেজারকে অবিলম্বে তার তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

তখনকার দিনে ছাত্রজীবন আমাদের কি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাপন করতে হয়েছিল, তা একটু বুঝিয়ে দিবার জন্য বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে লিখলাম। আজকের দিনে আবাসিক ছাত্রেরা কল্পনাও করতে পারে না যে এই রকম একটি তুচ্ছ বিষয়ে একটা নালিশ চলতে পাবে এবং সেই নালিশ 'সরকারী' ভাবে গৃহীত হতে পারে।

যাই হোক, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্বাচীন ছাত্র হলেও ছাত্র পরিষদের সাহিত্য শাখার সম্পাদক, বহু কাজেই অধ্যক্ষের সংস্পর্শে আসতে হয়। সে জন্য আমিও আমার 'অপবাধেব' জন্য চিন্তিত হলাম।

যেদিন সকালে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, সেই দিনই তিল বিলম্ব না করে ম্যানেজার প্রভোষ্টেব বাড়ীতে গিয়ে লিখিত ভাবে নালিশ দায়েব করে এসেছিলেন এবং প্রভোষ্ট আচায বমেশচন্দ্র আপিশে এসেই তাঁর আপিশের পোষাক পরেই দুপুর বেলা আমাদের বান্নাঘবেব সামনে যে 'নোটিশ বোর্ড' ছিল, তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিযোগেব সত্যতা প্রমাণ কবতে লাগলেন। অর্থাৎ অভিযোগের মধ্যে যে কবিতাটি ম্যানেজাব আমার লেখা বলে উদ্ধৃত করেছিলেন, তা সত্য কিনা, তা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো কবিতাটির সঙ্গে নিজে মিলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরে বসেই এক সতীর্থের কাছে সংবাদ পেলাম প্রভোষ্ট এসে কবিতাটি পড়ছেন।

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, একটা এত তুচ্ছ কাজে প্রভোষ্ট স্বয়ং হোষ্টেলের রান্নাঘরের দরজায় এসে নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়েছেন?

ছেলেরা কেউ আসে পাশে নেই, অনেকেই ক্লাসে চলে গেছে, কেউ কেউ তাঁকে দেখতে পেয়ে সামনে থেকে সবে গেছে। ছাত্রাবাস অনেকটা নির্জন; আমি জানালা খুলে দেখলাম, নোটিশ বোর্ডে কবিতাটি পড়ে তিনি আবার তাঁর আপিশের দিকে গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন। আমি ঘরে বসে প্রমাদ গুনতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আপিশ ঘবে আমার ডাক পড়ল। আচার্য রমেশচন্দ্রের

চরিত্রের একটা প্রধান গুণ ছিল, কোনো ব্যাপারই তিনি মুলতবী রেখে দিতেন না। এই ব্যাপারটাও তিনি সত্বর মীমাংসা ক'রে দিতে চাইলেন।

আমি একা তাঁর সাম্‌নে যেতে সাহস পেলাম না। আমাকে এই কাজে যারা প্ররোচিত করেছিল, তাদের জন কয়েককে সঙ্গে করে অধ্যক্ষের আপিশ ঘরের দিকে চল্‌লাম। কেবল মাত্র তার জন্য কি শাস্তি হ'তে পারে, তাই ভাবতে লাগ্‌লাম।

আমার সঙ্গীরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর আপিশ ঘরে তাঁর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখি আমার বিরুদ্ধে যিনি অভিযোগকারী (তিনি ইতিহাসের ছাত্র, আচার্য রমেশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র) তিনি আগে থেকেই সেখানে গিয়ে বসে আছেন।

আচার্য মজুমদার আমাকে দেখবা মাত্রই উচ্ছ্বসিত হাস্যে আমাকে অভি-নন্দিত করে বল্‌লেন, আশু, তুমি যে এত ভাল কবিতা লেখ, তাতো জান্‌তাম না! এই বলে আমার লেখার কিছু কিছু অংশ পড়ে পড়ে কেবলই হাসতে লাগ্‌লেন। তাঁর এই হাসি দেখে আমার অভিযোগকারীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাস্‌তে লাগ্‌ল! সাহস পেয়ে আমার যে সকল সঙ্গী ছাত্র বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও এসে ভিতরে ঢুকল।

দু একজন অধ্যক্ষের কথায় সায় দিয়ে বল্‌ল, হ্যাঁ; স্যার, কবিতায় এর বেশ ভাল হাত।

আমি সব ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, অপ্রস্তুতভাবে পুরস্কার গ্রহণ করলাম। আমার চোখে প্রায় জল এলো।

তারপর আচার্য রমেশচন্দ্র আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, দেখ, আমরা যখন হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্র, তখন একদিন হোষ্টেলে পাঁটার মাংস রান্না হলো। মাংস অনেকে খেত, অনেকে খেত না, তাই পরিবেশনকারী বামুনঠাকুর মাংস পরিবেশনের সময় সবাইকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, বাবু আপনি পাঁটা। তার অর্থ আপনি পাঁটার মাংস নেবেন? তাতে হাস্যরোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। এই বয়সে যদি একটু আধটু হাল্‌কা হাসিঠাট্টা না করবে তবে আর কবে কর্‌বে? তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, আশু, তোমার কাব্যচর্চা বন্ধ করো না, আর অভিযোগকারীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,

যাও, ক্লাসে যাও, এখানে সময় নষ্ট করো না। বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে চলে গেলেন।

তার বহুদিন পরও তিনি এই ঘটনাটি স্মরণ করে একদিন কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর এক সভায় প্রসঙ্গটি পরিহাসছলে উল্লেখ করেছিলেন। এমন কি, স্মৃতি থেকে সেই কবিতার কয়েকটি লাইনও তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল।

আচার্য রমেশচন্দ্রের নিকট আমার বিরুদ্ধে এমনই আর একটি অভিযোগ প্রায় এমনই ভাবেই তিনি নিষ্পত্তি করেছিলেন। তাও এখানে উল্লেখ করতে পারি। সেই অভিযোগটি ছিল একটু গুরুতর। কারণ, তখন আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'লেকচারার' এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; অভিযোগকারী একজন অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষক, পরে সহকর্মী।

যখন থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লেকচারার' রূপে যোগদান করি, তখন থেকেই প্রায় বিভিন্ন হলের বাৎসরিক মুখপত্রের প্রবন্ধাদি পরীক্ষা করে দেওয়ার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হয়। দৈবাৎ জগন্নাথ হলের 'হসন্তিকা' পত্রিকায় একটি নামগোত্রহীন এক ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপকই কমবেশি 'আক্রান্ত' হয়েছিলেন। সরকারীভাবে এই অপরাধ আমারই ছিল, তথাপি আমার একটি নিষ্কৃতির পথ ছিল যে আপত্তিজনক প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না বলে আমি তা বিচার করিনি এবং আমার স্বাক্ষর করে তা অনুমোদিত ব'লে লিখে দিই নি, সুতরাং আইনতঃ আমি তার জন্য দায়ী হতে পারি না। তথাপি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ, উপাচার্য তা উপেক্ষাও করতে পারেন না। তবে তিনি এই বিষয়ে বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে না নিয়ে জগন্নাথ হলের তখনকার 'প্রভোষ্ট' অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করলেন। তিনি অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছিলেন, কারণ, এই বিষয়ে পরে আর কিছুই জানতে পারি নি।

আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গুণ তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। কর্তব্য যত তুচ্ছই হোক, তাকে তিনি কখনও ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলে ছোট করে দেখতেন না। ছাত্রদের প্রতি সমিতি, উপসমিতির সভায় তিনি যোগদান করে প্রত্যেকটি সভা যত তুচ্ছ কারণেই ডাকা হোক না কেন, তাতে অংশগ্রহণ করতেন। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে নিজেও বিতর্কে যোগদান করতেন। যদিও

প্রত্যেক সমিতি এবং উপসমিতিতে এক কিংবা একাধিক সহসভাপতি থাকতি, তথাপি এমন কোনও সভা আমি দেখ্‌তে পাইনি, যাতে কোনও সহ-সভাপতি তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবার সুযোগ পেয়েছেন। এই বিষয়টি খুবই অসাধারণ বল্‌তে হবে। কারণ, অন্যান্য হলের সহ-সভাপতিগণ যে সুযোগ সর্বদাই পেতেন।

ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে সকল বিতর্ক-সভা, ইংরেজি বাংলা বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হোত, তাদের প্রত্যেকটিতেই তিনি সভাপতিত্ব করতেন, একটি সভার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। তার ছ'রকম ফল হোত, প্রথমতঃ এক শ্রেণীর ছাত্র তাঁর উপস্থিতিতে মঞ্চে আরোহণ করে আবোল তাবোল বক্‌তে সাহস পেত না, কেবল মাত্র যাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, তাঁরাই গিযে মঞ্চে দাঁড়াত। সামান্য ভুল ভ্রান্তি কবলে সভাপতি তা শিক্ষকের মত বুঝিয়ে দিতেন। আর এক শ্রেণীর ছাত্র বাড়ী থেকে মুখস্থ করে এসে বক্তৃতা দিত, তাদেরও তিনি বুঝিয়ে দিতেন, সাহস দিয়ে বল্‌তেন, নিজে যা পার বল, ভুল হলে শুধ্‌রে দেব, কিন্তু মুখস্থ করো না, কারণ, তাতে প্রকৃত কোন শিক্ষা হয় না। আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একদিন তাঁর সামনে মঞ্চে গিয়ে প্রথম যে দিন আমি আত্মপ্রকাশ করলাম, সে দিন কি বিষয়ে বক্তৃতা ছিল, তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু একটি বাক্য বল্‌বার পরই মনে হয়েছিল, হঠাৎ আমার সামনে ঘরের আলোগুলো নিভে গিয়েছে। কিন্তু তখনো 'লোডশেডিং' কি জিনিষ কেউ জান্‌ত না, তারপর কে যেন সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমার হাত ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পেলাম একটি একটি করে আলোগুলো আমার চোখের সাম্‌নে আবার জ্বলে উঠ্‌ছে। সেই আলো আমার সাম্‌নে এতদিন ধরে জ্বলেই ছিল, আজ চিরতরে নিভে গেছে।

॥ রবিবাসরে শতসন্ধ্যা ॥

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত এম. এ., ডব্লু-বি-সি-এস্ (রিঃ)

রবিবাসরের কথা আমি প্রথম জানতে পারি বছর চল্লিশ কি একচল্লিশ আগে। তখন আমি সিটি কলেজের ছাত্র। সেই বয়সে সকলেই কবি যশঃ প্রার্থী। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই সময়ে আমাদের বাংলার অধ্যাপক বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ মশায়ের কাছে রবিবাসরের কথা শুনি। বাংলার অন্য একজন অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যও তখন রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন ফেরতা এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন সেজন্য আমাদের মনোযোগ ও কৌতূহল দুইই আকর্ষণ করেছিলেন। বিপিনবাবু ও বিজনবাবু দুজনেই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন, যদিও দু'জনের পদ্ধতি বা approach ছিল ভিন্ন ধরনের। বিপিনবাবু তির্যগ্‌ভঙ্গিতে কথা বলতেন ও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লালিকায় ব্যঙ্গ কবিতা পড়তেন। তাঁর সরস অথচ অম্লমধুর মন্তব্য জ্বালার সৃষ্টি করলেও তাঁকে আমাদের ভালো লাগত। বিজনবাবু ছিলেন ধীর, স্থির এবং গম্ভীর। কখনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেন না। সর্বদাই আমাদের মধ্যে সাহিত্য প্রীতি জাগ্রত করার জন্য সচেষ্ট।

বিপিনবাবুর আন্দুল মৌরির বাড়িতে রবিবাসর বসত। যে সব ছাত্রের বি-এ ক্লাসে ঐচ্ছিক বাংলা থাকত তাদের কেউ কেউ এই বাসরে যোগ দিত। আমার অবশ্য এ বাসরে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তারপর বহু বছর কেটে গেল। রবিবাসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আনন্দবাজারে পড়তাম। ভাবতাম কখনো যদি কলকাতায় ফিরে আসি তাহলে এই বাসরে যোগ দিতে হবে। সরকারী যে চাকরিতে স্থায়ীভাবে যোগ দিয়েছিলাম তা ছিল বদলির চাকরি। একবার হাওড়া ও আর একবার আলিপুরে বদলি হয়েছিলাম বটে, কিন্তু রবিবাসরের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি। মনের আশা মনেই চেপে রাখতাম। উত্থায় হৃদি বিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। কোথায় বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মিলনস্থান রবিবাসর, আর কোথায় সাহিত্য ক্ষেত্রে অখ্যাত, অজ্ঞাত আমি।

আমার নিভৃত সাহিত্য সাধনায় অবশ্য ছেদ ছিল না। দু'এক জন সাহিত্যিকের সঙ্গে যে পরিচয় হয়নি বা ছিল না তা নয়। কিন্তু কোনো সাহিত্য সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য যে সব জায়গায় বদলি হয়েছি সেখানে আমাদের মিলন সভা ছিল। সে সব জায়গায় সাহিত্য সংগীত ও শিল্প আলোচনায় বহু সন্ধ্যা কাটিয়েছি। কিন্তু আশা মেটে না। এ যেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দুধের বদলে পিটুলি গোলা জল খাওয়া। কিংবা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।

এই ভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯৬৬র প্রথমদিকে কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম এবং তার কিছু আগে সোদপুরে সবকারী যে গৃহটি কিনেছিলাম সেখানে স্থিতি হলো। ক্রমে কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল মূলতঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার মাধ্যমে। সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রথম যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো তখন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। তার পরে অবশ্য সে পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা লিখেছি এবং এই পত্রিকা আয়োজিত প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনে শুধু যোগই দিইনি, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি ও স্মারকগ্রন্থে প্রবন্ধ দিয়েছি। ক্রমে রেডিওতে ও অমৃত বাজারে রবিবাসরীয়তে আলোচনা ও প্রবন্ধ দিয়েছি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও কবিতা, জীবনের আয়না এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মেঘদূতমের সটীক ইংরেজি অনুবাদ, "প্রত্যাশা" নামে একটি একটি বাংলা সনেটের বই এবং "আরূঢ় ভণিতা" নামে একটি সমালোচন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। আমার মন কিন্তু পড়ে আছে রবিবাসরে। মৈত্রেয়ী যেমন বলেছিলেন যা আমাকে অমৃতত্ব দেবে না তা নিয়ে আমি কী করব, আমিও বোধহয় তেমনি ভাবতাম- য রবিবাসরের সদস্য হতে না পারলে এ সবই বৃথা। সেই আমার স্বপ্নলোকের রবিবাসর, যে রবিবাসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, যুক্ত ছিলেন জলধর সেন, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মণীষীরা।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭র মাঝামাঝি কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। জঙ্গিপুরে কর্ম-উপলক্ষ্যে দু'বছর ছিলাম। সেখানে নিমতিতা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বৈষ্ণব-কবি বিষ্ণু সরস্বতী। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নিমতিতা স্কুল থেকে অবসর নিয়ে তিনি কলকাতায় তাঁর মেজছেলে বিনায়কের বাসায় থাকতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে যেতাম। তিনিও কখনো কখনো কখনো নিজেও সোদপুরের বাড়িতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে নানা রকম আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। তিনি আমাকে হেমন্তবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ও বঙ্গীয় কবি পরিষদের সভ্য হতে বলেন। আমি সম্মত হই। বিষ্ণুবাবুর বাসায় কবি কৃষ্ণধন দের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি রবিবাসরের সভ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের অনুসরণে লেখা তাঁর কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ। কৃষ্ণধন দে ছিলেন যথার্থ কবি। তা যে কথা বলছিলাম। কবি কঙ্কণের সঙ্গে পরিচয় ও কবি পরিষদের সভ্য হওয়ার ফলে সোদপুরের লেখকগোষ্ঠী ও আগরপাড়ার ফণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো। বিষ্ণুবাবুব বাসায় রবিবাসরের আর একজন সভ্য শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্রের সঙ্গেও পবিচয় হয়েছিল। ফণীবাবু এবং হেমন্তবাবু দু'জনেই রবিবাসবের সভ্য।

ফণীবাবু আগরপাডার প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুলে, যতোদূর মনে পড়ে, ১৯৭৩ সালে রবিবাসরের একটি অধিবেশন ডেকেছিলেন। মূলতঃ তাঁর ও হেমন্তবাবুর চেষ্টায় আমি সেই সভায় উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সে আমন্ত্রণ পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। যথা সময়ে আসরে হাজির হলাম। একটি ছোট্ট কবিতা সঙ্গে নিলাম। যদি পডবার অনুমতি পাই তাহলে পডব। যথাসময়ে রবিবাসরের কাজ সুরু হলো। তার আগে একটি খাতায় উপস্থিত সভ্যবা ও অন্যান্যেরা সই করলেন। আমিও ভয়ে ভয়ে সই করলাম। কবিতা পাঠের জন্য যখন আমাব আহ্বান এল তখন কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে একটি সনেট পড়লাম। সম্পাদক সন্তোষবাবু সেটি পকেটস্থ করলেন। সেদিন ফণীবাবু আগরপাড়াব স্মৃতিচাবণ করেছিলেন। যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল তা হচ্ছে রবিবাসবের unsophisticated ঘরোয়া পরিবেশ ও সভাপতি ডঃ কালীকিংকব সেনগুপ্তেব বিভিন্ন বিষয়ে তাৎক্ষণিক শ্লোক ও সূত্র উদ্ধার। তাঁর বয়স তখন আশী শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। কী নির্ভুল উচ্চারণ, কী অদ্ভুত স্মৃতি ও মেধা এবং কী অপূর্ব নিষ্ঠা!

এরপব ১৯৭৪ সনে হেমন্তবাবু তাঁর বাডিতে যে অধিবেশন ডাকলেন তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। আমিও নির্দিষ্ট দিনে একটি সনেট পকেটে পুরে রওনা হলাম। এই আসরে বেশি সদস্য আসেননি। কিন্তু আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। আমাকে একটি কবিতা পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং পঠিত সেই কবিতাটি সন্তোষবাবু রবিবাসরের স্মারক গ্রন্থের জন্য

নিলেন। রবিবাসরে এই কবিতাটি ও পূর্বের কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। তখনও আমি রবিবাসরের সভ্য হইনি।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এল। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮১ (ইং ২৩।২।৭৫ রবিবাসরের ৪৫তম বর্ষের ২১তম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান পেলাম। ইতিপূর্বেই খবর পেয়েছিলাম যে আমাকে রবিবাসরের সভ্য করা হয়েছে এবং এই অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করা হবে। শীতের দিন। বৈকাল ৪টায় অধিবেশন বসবে কুমারেশ ঘোষের বাগুইহাটি বাগান বাড়িতে। জায়গাটি অপরিচিত। আনন্দের আতিশয্যে ছুটোর সময় বেরিয়ে পড়ে উলটোডাঙ্গায় নামলাম এবং সেখান থেকে পথ-পরিচয়ে যে বাসের নম্বর দেওয়া ছিল সেই নম্বরের বাসে চেপে বাগুইহাটি বাজারের সামনে নামলাম। জায়গাটি খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় গেল। আমি সাড়ে তিনটে নাগাদ যখন নির্দিষ্টস্থানে পৌছলাম, কুমারেশবাবু তখন চুরোটে টান দিয়ে বাইরে ফরাসপাতার আয়োজন করছেন। কুমারেশবাবুকে ইতিপূর্বে দেখেছি এবং 'যষ্টিমধু'র সুযোগ্য সম্পাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতির খবরও রাখি। তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে আহ্বান জানালেন, এবং নানা রকম গল্প গুজবে সময় কাটতে লাগল। সেদিন অন্যান্যদের সঙ্গে এসেছিলেন আশাপূর্ণা দেবী ও বনফুল। বনফুলকে ইতিপূর্বে কয়েকবারই দেখেছি। বঙ্গীয় কবি পরিষদের একটি অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। কবিতা ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ সেই সভায় পঠিত হয়। তিনি লেখাটির তারিফ করেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীকে ইতিপূর্বে দেখিনি। তাঁর ঘরোয়া চালচলন দেখে খুব ভালো লাগল।

আনুষ্ঠানিকভাবে আমি রবিবাসরের সভ্য হলাম। চল্লিশ একচল্লিশ বছর আগে যে প্রতিষ্ঠানের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং প্রতিনিয়ত যে প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলাম সেই প্রতিষ্ঠানের আজ আমি সভ্য। যে ইয়ারো নদীর কথা এত শুনেছি সেই ইয়ারো নদীতে আজ আমি স্নান করার অধিকারী। ভাবতেও অবাক লাগছিল। জীবন এই রকমই বটে। ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূরণ। প্রত্যাশার পর প্রাপ্তি।

আমি যখন সভ্য হলাম তখন মহারথীরা স্বর্গত। কিন্তু তখনও রবিবাসরের গৌরব করার মতো অনেক কিছুই ছিল। বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, জরাসন্ধ, মন্মথ রায় সভ্য। সভ্য_ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল

ও সুধীর মিত্র। ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরুব, অখিল নিয়োগী, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রমা চৌধুরী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, চিত্রিতা দেবী ও ভবানী মুখোপাধ্যায় এঁরাও সভ্য। প্রবীণতম সদস্য প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখেরা। এ ছাড়া আছেন বেলা দেবী, বিভা সরকার, হরেন্দ্র মজুমদার, কবিকঙ্কণ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সরকার, ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিভূতি রক্ষিত ও সৌরীন্দ্র দে। শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, অনিল ভট্টাচার্য, রামজীবন ভট্টাচার্য এবং ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রবিবাসরের সভ্য। যষ্টিমধু সম্পাদক কুমারেশবাবু যে সভ্য সে কথা তো গোড়াতেই বলেছি। আমার পরে সভ্য হয়েছেন হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডঃ প্রতুল গুপ্ত, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, মনোজ বসু ও ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি বনফুল প্রয়াত হয়েছেন ও কলকাতায় না থাকায় নারায়ণ সান্যাল সভ্যপদ ছেড়েছেন। সভ্য সংখ্যাও পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন করা হয়েছে। আর যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন রমেন্দ্র মল্লিক, লেডী রাণু মুখার্জী, নন্দকিশোর ঘোষ, নন্দদুলাল সাহা, দেডকুড়ি শর্মা, প্রভাত হালদার। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য অন্যতম প্রবীণ সদস্য। অধ্যাপক মনীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্যতম সভ্য। মধ্যমণি হয়ে আছেন সর্বাধ্যক্ষ ডঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত ও সম্পাদক সন্তোষকুমার দে। চিত্রগুপ্ত এই ছদ্মনামের আড়ালে যিনি রবিবাসরের সভ্য তাঁর নাম মনোমোহন ঘোষ। সংহতি সম্পাদক সুরেন নিয়োগী রবিবাসরের অন্যতম প্রবীণ সভ্য।

সুতরাং রবিবাসরের বর্তমান চালচিত্রটিও ফেলনা নয়। কবি-সাহিত্যিক ও মনীষীদের সমাবেশে রবিবাসর আজো উজ্জ্বল। আশ্চর্যের বিষয় যে রবিবাসরে সভ্য হওয়ার পূর্বে দু'বার যোগ দিয়েছি ও কবিতা পাঠ করেছি সেই রবিবাসরে যেদিন সভ্য হলাম সেদিন বেশ নাভাস বোধ করছিলাম। কুমারেশবাবু রঙ্গব্যঙ্গের লোক বলে আমি একটি হাসির কবিতা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। এটি হবুন্দ্র ও গবুচন্দ্র বিষয়ক একটি লিমারিক বা পঞ্চক। পড়তে গিয়ে গলা কেঁপে গেল, অক্ষরগুলো কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকছিল। যাই হোক এ দিনের অধিবেশন বেশ জমেছিল। আশাপূর্ণা দেবী একটি নূতন গল্প পড়েছিলেন; বনফুল তাঁর গ্রন্থ থেকে একটি গল্প পড়লেন। বনফুল মাঝে মাঝে আটকে যেতেন। তখন অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় সে আবর্ত থেকে রক্ষা পেতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটি সারল্য ও নিষ্ঠা ছিল যে ওসব ত্রুটি

বড়ো একটা কেউ খেয়ালই করত না। কত ভালো ভালো গল্পই না তিনি রবিবাসরে পড়েছেন।

কবিতা পাঠের আসর প্রতিটি অধিবেশনেই বসে। দু'একটি ক্ষেত্রে যে তার ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়। যেমন হরেন্দ্র মজুমদার মশায়ের গৃহে একটি অধিবেশনে দিলীপকুমার রায় এসেছিলেন সশিষ্যা। সেদিন কবিতা পাঠ হয়নি। দেড়কড়ি শর্মার গৃহে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে কবিতার আসর বসে নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে সম্প্রতি সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের প্রথম অধিবেশনে সভ্যদের কোনো কবিতা পাঠ হয়নি। এ রকম আরো একটা অধিবেশনে কবিতা পাঠের আসর বন্ধ ছিল। অশোককুমার সরকারের আহ্বানে যে অধিবেশন হয় তাতে গানের আসর বসে, কবিতা নয়। সুখাদ্যের আয়োজনে সে ক্রটি সভ্যরা বড়ো একটা গ্রাহ্য করেন না।

আগেই বলেছি বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫২। বাহান্নপীঠ নাকি বাহান্ন অক্ষর থেকে এসেছে। জানিনা আমাদের শাস্ত্রমতে সর্বাধ্যক্ষ সংখ্যাটিকে গভীর কোনো তাৎপর্য দেবার জন্য বাহান্ন করেছেন কিনা। তবে প্রাকৃতজনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বছরে বাহান্নটি রবিবার হিসেব করে এই নির্দিষ্ট। অনুষ্ঠান হওয়ার কথা দু'সপ্তাহ পর পর। সেই হিসেবে বছরে ২৬টি। সাধারণতঃ ২৫টি অধিবেশন বসে। এটাও বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। আর এই ভাবে রবিবাসর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পৌঁচেছে।

বছরে ২৬টি অধিবেশন বসলে প্রত্যেক সভ্যকে দু'বছরে একবার করে সভা ডাকতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা হয় না। চিত্রিতা দেবী, চপলাকান্ত বাবু ও সুধানন্দ বাবু প্রভৃতি বছরই ডাকেন। চিত্রিতা দেবী রবীন্দ্র জন্মোৎসব, চপলা বাবু বঙ্কিম জন্মোৎসব ও সুধানন্দ বাবু তাঁর স্বর্গতা পত্নীর স্মরণোৎসব হিসেবে নিজেদের অধিবেশনকে চিহ্নিত করেন। অ-কৃ-ব ও দেড়কড়ি শর্মা যদিও প্রতিবছর সভা ডাকেন না, কিন্তু স্ব স্ব অধিবেশনকে চিহ্নিত করেন যথাক্রমে"রয় দি মিষ্টিক" দিবস হিসেবে এবং 'শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য' দিবস হিসেবে। হরেন্দ্র মজুমদারের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ও মাদার প্রাধান্য পান।

মাঝে মধ্যে কোনো কোনো সভ্য নিজের নামে সভা ডাকেন বন্ধুগৃহে কিংবা অন্যত্র। কাশীর অনুষ্ঠান, কাচের মন্দিরে অনুষ্ঠান, শ্রীভূমিতে অনুষ্ঠান, শ্রীযুক্ত রাহা ও শ্রীইন্দু দাঁর গৃহে অনুষ্ঠান এই জাতীয়। অ-কৃ-ব ও চপলাবাবু বন্ধুগৃহে অধিবেশন ডাকেন। বেলা দেবীও তাই করেন।

বিভিন্ন অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্রে বিষয় হিসেবে যা উল্লিখিত হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটেছে। হয়তো প্রধান বক্তা কিংবা পাঠকই আসতে পারেন নি। তখন মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ হয়েছে। মোটামুটিভাবে সদস্য হওয়ার পর প্রথম ১০০টি অধিবেশনের মধ্যে আমি ৯৬টিতে উপস্থিত ছিলাম। চারটি সভায় যেতে পারিনি তার কারণ সরকারী কাজে অন্যত্র গমন কিংবা ঝড়বৃষ্টি। একটি সভায় হাজির হতে পারিনি একটু বিচিত্র কারণে। বাসে উঠে দেখি লঘু হস্তশিল্পীর শিকার হয়েছি। বাস থেকে নেমে পড়তে হলো।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সব রচনা আমাকে আকৃষ্ট করেছে সে প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করি নারায়ণ সান্যালের ‘হংসেশ্বরী মন্দির’ “আত্মজীবনী” ও ‘কী পড়ি’। এই তিনটি রচনাই স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে অভিনব। তাঁর পড়ার ভঙ্গিটিও চিত্তাকর্ষক। সম্প্রতি তিনি সাময়িকভাবে সদস্যপদ ছেড়েছেন যেহেতু সরকারী কাজে তাঁকে বর্তমানে প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়। শ্রীসান্যালের অভাব পূর্ণ হওয়ার নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তিনি যশস্বী হয়েছেন। এ যশঃ তিনি অর্জন করেছেন গভীর নিষ্ঠার দ্বারা। আমরা আশা করব আচিরে তিনি বিচিত্রের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের যশের অধিকারী হবেন। জরাসন্ধের রবীন্দ্র ও শরৎস্মৃতিচারণ অনবদ্য। যেমন সরসভঙ্গি তেমনি সাবলীল পাঠ। আশাপূর্ণা দেবী ও বনফুলের কথা নূতন করে কী বলব। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ। প্রতিদিনের দেখা জীবনকে এঁরা উদ্ভাসিত করেছেন। বনফুলের মৃত্যুতে রবিবাসরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বনফুলের স্মৃতিসভায় আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছি :

উদার প্রসন্ন চিত্তে জীবনের সব খুঁটিনাটি
দেখেছ বাজার গঞ্জে, শহরের বৈঠকখানায়,
মানুষের শোভাযাত্রা এঁকেছ নির্দিষ্ট পরিপাটি
যে মানুষ ভুল করে, নিচে নামে তবুও জানায়
জীবনের পরম মহিমা, যাতে না বিবরগর্ভে,
স্খলনকে করে না উজ্জ্বল, যারা করে বার বার
আত্মার বিকাশতীর্থে, সত্যিই যা অতি ক্ষুরধার
মনুষ্যত্বের পথ, সব গ্লানি অস্তিত্ববাদের
পেরিয়ে প্রকাশে সেই সত্য যা আছে হিরণ্যগর্ভে
অপূর্ব আলোক ধৌত মুক্তিস্নাত মর্ত্য মানবের।

বনফুল শুধু সব্যসাচী লেখকই ছিলেন না, দেশের কল্যাণচিন্তা যে কয়জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধ্যান করেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বনফুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ১৯৪৯এ যখন আমি জঙ্গিপুরে প্রথমবার পোস্টেড ছিলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ভাই অরবিন্দবাবুও ছিলেন। রবিবাসরের সদস্য হিসেবে এবং তারও কিছু আগে বঙ্গীয় কবি পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে যখন তাঁকে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের ব্যবধানে দেখলাম তখন তিনি স্থবির হয়ে পড়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলে তাঁকে রবিবাসরের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেই সভায় "প্রথম প্রতিশ্রুতি" নামে সনেটত্রয়ী পড়েছিলাম। পরে এটি রবিবাসর গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় সনেটের শেষ দশ পঙক্তিতে বলেছি :

নারীকে আপন ভাগ্য বিজয়ের সবল আশ্বাস
রবীন্দ্রনাথের বাণী ছত্রে ছত্রে হলো উদ্‌ঘোষিত,
পুরুষপ্রধান গৃহে নারী পেল নূতন আবাস,
নূতন চলার মন্ত্র অনির্বাণ শুভ্র শুচিস্মিত।
তবুও অনেক বাধা, সে বাধায় নারীও শরিক,
সত্যবতীদের ভাগ্যে জোটে তাই লাঞ্ছনা অশেষ,
অপমান, অনাদর, উপেক্ষায় একান্ত নির্ভীক
তবু যারা পথ চলে আদর্শের জ্বালিয়ে মশাল
তাদের প্রণাম করি, বিজয়িনী সমুন্নত ভাল
প্রতিশ্রুতি পথিকৃৎ, তুচ্ছ যারা করে সর্ব ক্লেশ॥

সম্পাদক সন্তোষ কুমার দেব বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র পথে সঞ্চরণ। আমেরিকা ঘুরে এসে সে দেশের পত্রপত্রিকা সম্বন্ধে তিনি যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েছিলেন তা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। রবিবাসর ও রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে কত তথ্যই না তাঁর জানা। সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি তথ্যের কারবারী সন্তোষ বাবু ছোটো গল্প ও কবিতায়ও সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। অতি সম্প্রতি "বান্ধবী" নামে যে কবিতাটি তিনি পড়েছেন সেটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

সর্বাধ্যক্ষ ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের কথা আগেই বলেছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে তাঁর ধর্ম সাধিদ। অত্যন্ত খাঁটি কথা। এই তিন বিষয়ে সংস্কৃত ভাবধারায় তিনি অবগাহন স্নান করেছেন। তার প্রমাণ প্রতি অধিবেশনেই

আমরা পেয়ে থাকি। ৮৮ বছর বয়সেও তিনি কর্মঠ, সময়নিষ্ঠ, নির্ভুল স্মৃতির অধিকারী ও উদার প্রসন্নচিত্ত। সকলকে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা ও ধৈর্যও তাঁর অসীম।

চিত্রগুপ্তের কবিতা নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু তাঁর চাইতেও ভালো তাঁর আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র বা ঐ জাতীয় রচনা কী রস দিয়েই না তিনি পাঠ করেন। অনিল ভট্টাচার্য ও রমেন্দ্র মল্লিকের কবিতা আধুনিক প্রকরণের, কিন্তু নির্বাধুনিক নয়। দুজনেই কবিতা লেখেন ও পড়েন ভাব দিয়ে। ভারী ভালো লাগে। বেলা দেবীর আটপৌরে কবিতায় নিষ্ঠা আছে। ঘরোয়া পরিবেশকে তিনি উদভাসিত করে তোলেন। শ্রীকৃষ্ণ মিত্র ছোটো ছোট কবিতায় নিজের অন্তর লোককে উদ্‌ঘাটিত করেন। তাঁর পড়ার ভঙ্গিটি কিঞ্চিৎ ভীরু ও সলজ্জ।

অরুর কম লেখেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি লেখা স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাঁর গান্ধী-গডসে সংলাপের তুল্য কবিতা খুব কমই পড়েছি। মনীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণতঃ রস রচনা পরিবেষণ করেন। চিত্রিতা দেবীর গৃহে তিনি যে রবীন্দ্র নাথের স্মৃতিচারণটি পাঠ করেছিলেন তা যারা শুনেছেন তাঁরাই তৃপ্ত হয়েছেন। চিত্রিতা দেবী রবীন্দ্র-অনুরাগিনী। তাঁর লেখার মধ্যে একটি শুভ্র সমুজ্জ্বল শুচিতা সর্বদাই লক্ষণীয়। আলোচনায় তিনি তীক্ষ্ণধী। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী মৃদুভাষী। এদের বক্তব্য ও প্রবন্ধ স্পষ্ট ও তন্নিষ্ঠ। পাণ্ডিত্য এঁদের ভার স্বরূপ না হয়ে প্রাঞ্জলতার সহায়ক হয়েছে।

ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই আমাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ শোনান। তাঁদের মত সব সময়ে গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও নিষ্ঠার প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। সুধানন্দের কবিতা গতানুগতিক, কিন্তু দেশ বিদেশের আলোচনা, বিশেষ করে খলিল জিব্রাইল সম্বন্ধে আলোচনাটি খুবই মনোহর হয়েছিল। কে মল্লিকের গান সম্বন্ধে তাঁর আলোচনাটি তথ্যপূর্ণ ছিল। প্রবীণ সদস্য ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ও প্রবন্ধ অতি উচ্চাঙ্গের। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র স্বনামধন্য। তাঁর বলার ভঙ্গিটি ভারী চিত্তাকর্ষক। অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও তাঁর আলোচনার গুণে সহজ ও সাবলীল হয়ে ওঠে। পাণ্ডিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সহজ সঞ্চরণ। আমার অনুযোগ তিনি কবিতা পড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, অথচ তিনি একজন প্রথম সারির কবি। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষক। তাঁর প্রবন্ধ কিন্তু গবেষণার

জটিলতায় দুরূহ হয়ে পড়ে না। অতি স্বাদু তার প্রবন্ধ। ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ সব সময়েই বিশিষ্ট। তাঁর "শ্যাম্পু" শীর্ষক প্রবন্ধটি যেমন তথ্যনিষ্ঠ তেমনি সরস। রঙ্গব্যঙ্গের ক্ষেত্রে কুমারেশ বাবু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যঙ্গে মধু ও হুল দুই-ই আছে, অথচ স্বভাবকে তা কখনই অতিক্রম করে না। চপলা বাবুর লেখায় স্বদেশ চেতনা অতি শিক্ষনীয় বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি ভোলার নয়। এই সেদিনও তিনি রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা"র অপূর্ব বিশ্লেষণ করলেন। ভবানী মুখোপাধ্যায় কৃতী প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখায় ধার ও ভার দুই-ই আছে। অখিল নিয়োগী মুখ্যতঃ শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের জন্য তাঁর লেখা বয়স্কদেরও আনন্দ দেয়। অল্পকথার সরস বক্তৃতায় তাঁর স্বভাবপটুত্ব বিস্ময়কর।

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার একজন উৎসাহী সভ্য। নানা রকম সরস মন্তব্যে তিনি সভাকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। তাঁর কবিতা কিছুটা পুরনো ধাঁচের, কিন্তু পড়ার গুণে সকলেরই শ্রুতিনন্দন। ডঃ বিভূতি রক্ষিত আজকাল তেমন আসতে পারেন না। তাঁর ছোটোগল্পগুলি বিশিষ্ট স্বাদের। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বিচিত্র ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তথ্যপূর্ণ ভাবে পরিবেষণ করেন। ডঃ রমা চৌধুরী শাশ্বত ভারতীয় ভাবধারার ব্যাখ্যান করেন সহজ ও সবলভাবে। সুধীর মিত্র মূলতঃ ঐতিহাসিক। দুষ্প্রাপ্য দলিল উদ্ধার, পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র তথ্যের আবিষ্কারে তিনি সিদ্ধহস্ত। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোক বাবুর আলোচনায় বিরুদ্ধ মত বেশ খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত হয় এবং আসরকে ঝাঁকি দেয়। রোগ সারানোর জন্য "Shake the bottle"-এর মতো। পুরাতন স্মৃতিচারণে প্রেমোৎপল বাবু ও পূর্ণবাবুর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রেমোৎপল বাবু বর্তমানে সর্বজ্যেষ্ঠ সভ্য, রবিবাসরের বয়স হিসেবে। জ্যোৎস্নাবাবু নূতন সভ্য। তিনি সাহিত্যের খোঁজ খবর খুব ভালো জানেন। তাঁর কাছ থেকে কবি কুমুদরঞ্জন ও কবি করুণানিধান সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি।

নাট্যকার মন্মথ রায় শারীরিক কারণে ইদানীং বেশি আসতে পারেন না। ক্বচিৎ কদাচিৎ আসেন। তাঁর লেখার জোর কিছুমাত্র কমেনি। তাঁর পড়ার ভঙ্গিও চমৎকার। প্রভাত হালদার অন্যতম উৎসাহী সভ্য। রবিবাসর সম্বন্ধে অনেক টুকরা কথা তাঁর ঝুলিতে আছে। দুইবার তিনি সেই ঝুলি থেকে আমাদের কিছু উপহার দিয়েছেন। বড়ো ভালো লেগেছিল।

দেড়কড়ি শর্মার আসল নাম জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইনি এবং রামজীবন

ভট্টাচার্য সংস্কৃতজ্ঞ। জিতেন্দ্র বাবু সংস্কৃত ছন্দ বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। রামজীবন বাবুর লেখা তাত্ত্বিক ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ। মহিলা সদস্য বিভা সরকারের কবিতা ও প্রবন্ধ সকলেরই প্রিয়। হরেন্দ্র নাথ মজুমদারের শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা ও সাবিত্রী আলেখ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে।

রবিবাসরে শুধু যে সভ্যরাই অংশ গ্রহণ করেন তা নয়। প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনে সদস্যদের বন্ধু বান্ধবও কেউ কেউ হাজির থাকেন। পরিবারের লোকজনও থাকেন। কোনো কোনো অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরা আসেন ও ভাষণ দেন। বিভিন্ন অধিবেশনে যারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন দিলীপ কুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডঃ সুশীল রায়, ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তরুণ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখেরা। শিবরামবাবু লেখায় কী তীক্ষ্ণ ও কথার মারপ্যাচে কী পটু। কিন্তু সভায় ভাষণ দিতে তিনি একেবারে অনভ্যস্থ ও সলজ্জ। একটি অধিবেশনে প্রবোধ সান্যাল মশায় রবিবাসরে পঠিত কবিতায় প্রাচীন পন্থার অনুসৃতি দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। আমি তাঁকে একটি স্লিপে লিখি: "আপনি যে পোষাক পরে এসেছেন সেও তো দুশো বছর আগেকার পোষাক। পোষাকের রুচি যেমন ক্ষণে ক্ষণে বদলালেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন হয় না, কবিতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটে।"

যে একশ'টি অধিবেশনে গত চার বছরে আমি উপস্থিত ছিলাম তার পুরো সালতামামি করতে গেলে মহাভারত লিখতে হয়। তা লেখার সময় যদিবা আমার আছে, শোনার ধৈর্য আপনাদের নেই। সুতরাং সংক্ষেপেই সে পর্ব শেষ করছি।

রবিবাসরের কথা অমৃত সমান
শ্রীঅমল গুপ্ত ভনে, শুনে পুণ্যবান।

এপ্রিল, ১৯৭৯

গুরুদেবের বিভিন্ন প্রকৃতির নাটকে গান

শান্তিদেব ঘোষ

শ্রীঅশোক কুমার সরকারের গৃহে রবিবাসরে (27.1.1980)
সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রাক্ভাষণ

সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককে বলা হোয়েছে "দৃশ্যকাব্য" অর্থাৎ চোখে দেখার কাব্য। এর আর এক নাম "রূপক"। গঠনের তারতম্য বিচারে "রূপক"-কে মূল দুই ভাগে ভাগ কোরে তার একটিকে প্রাচীনেরা বল্‌তেন "রূপক", অপরটিকে বলতেন "উপরূপক"। প্রাচীন যুগের পণ্ডিতেরা বোলে গেছেন সেযুগে "রূপক" ছিল দশ রকমের, আর উপরূপক ছিল আঠারো রকমের। এখন আমরা যাকে গীতনাট্য বা নৃত্যনাট্য বলি, সেই প্রকারের কতগুলি "উপরূপক" নাকি সে যুগেও ছিল। কারণ নাচ ও গান ছিল এই দলের নাটকের প্রধান অঙ্গ।

নাটকে গানকে প্রাধান্য দেবার রীতির কারণ আছে। কবিরা যখন তাঁদের নানা প্রকার হৃদয়াবেগকে গদ্যের ভাষায় প্রকাশ কোরে তৃপ্তি পাননা তখন তাকে কবিতার ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। সঙ্গীতজ্ঞ কবিরা চান সেই ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে আরো মর্মস্পর্শী করবার উদ্দেশ্যে সুর ও তালে তাকে সাজিয়ে গানে পরিণত কোরতে। গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য বোলতে আজকাল আমরা যা বুঝি, তা হোলো, সঙ্গীতজ্ঞ কবিদের এই মনোভাবের সর্বশেষ পরিণত রূপ।

নাটকের গানের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীতে অভিনয় করবার প্রথাটিও ভারতে বহুকালের প্রচলিত একটি রীতি। দর্শকদের মনে এইরূপ নাটকের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ছিল বোলেই গানকে নাটকে বিশেষ স্থান দেওয়া হোতো এবং নৃত্যভঙ্গীতে তার অভিনয়ের জন্য নর্তক ও নর্তকীদের উৎসাহিত করা হোতো। প্রাচীন যুগ থেকে দর্শকদের মধ্যে নৃত্যাভিনয়-যুক্ত নাটকের অত্যধিক প্রসারের এটিই ছিল মুখ্য কারণ।

নানা প্রকারের গান-যুক্ত রূপক ও উপরূপকরূপী নাটক রচনা কোরে এযুগের বাংলার নাট্য জগতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি স্থান অধিকার কোরে

আছেন। নাটকে গানকে যে কতভাবে কাজে লাগানো যায় গুরুদেবের রচিত নানা প্রকার নাটকে তার পরিচয় সুস্পষ্ট এবং সব ক্ষেত্রেই তা সার্থক হোয়েছে। আমাদের দেশের আর কোনো নাট্যকারের রচনায় বৈচিত্র্যের এই রূপ সার্থকতার পরিচয় মেলেনা।

গুরুদেব ছিলেন একাধারে কবি, গীতকার, নাট্যকার ও অভিনেতা। এই কারণেই তিনি তাঁর নাটকে গান নানাভাব ব্যবহার না কোরে থাকৃতে পারেন নি। নৃত্যাভিনয়কে তিনি একই কারণে, তাঁর অধিকাংশ নাটকের গানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন এবং নৃত্যনাট্য কটি হোলো গুরুদেবের নাট্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সংখ্যার বিচারে গুরুদেব প্রায় অর্দ্ধশতের উপর নানা প্রকার নাটক রচনা কোরে গেছেন। তার মধ্যে প্রাচীন যুগের "উপরূপকে"র ধারাটিকে এযুগের উপযোগী কোরে সাজিয়ে বিশেষ একধরণের যে সব আধুনিক নাটকের সৃষ্টি করে-ছিলেন, গান ব্যবহারের বিচারে সেগুলিকে পাচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, প্রথম দলে স্থান দেওয়া চলে,—

"বিসর্জন", "রাজা ও রাণী", "রাজা", "শারদোৎসব", "অচলায়তন", "ডাকঘর", "চিরকুমার সভা", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী", "অরূপরতন", "পরিত্রাণ", "তপতী", "নটীর পূজা", "বাঁশরী" ও "চণ্ডালিকা"। এই সব নাটকের সঙ্গে যুক্ত গানগুলি শুনে মনে হবে, নাটকের সাধারণ কথার ভাষায় পাত্র-পাত্রীরা তাদের মনের কথাকে তেমন স্পষ্ট কোরে প্রকাশ কোরতে না পারার দরুণ কবিতার ভাষার সঙ্গে সুর ও ছন্দ মিশিয়ে কথাটিকে পরিষ্কার কোরে বোঝাবার যেন চেষ্টা কোরছেন। সাধারণ কথাটি যেন বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, সহযোগী গানটি যেন তারই বিস্তারিত এবং মাধুর্যমণ্ডিত ব্যাখ্যা। পদাবলী গানের সঙ্গে "আখর" যে উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়, গুরুদেবের নাটকের গানগুলির উদ্দেশ্যও যেন তাই। আমাদের দেশের যাত্রা ও থিয়েটারে এই একই কারণে প্রচুর গান ব্যবহার করা হোতো। নাটকে গান ব্যবহারের এই রীতিটিকে গুরুদেব নিজের নাটকে কি ভাবে ব্যবহার কোরেছেন, সেটা বোঝাবার জন্য এবারে তাঁরই রচিত উপরোক্ত কটি নাটক থেকে একটি করে গান পাত্র-পাত্রীদের কথা সমেৎ শোনাচ্ছি। শুরু করছি "শারদোৎসব" নাটকের গান দিয়ে।

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

(ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তকে লেখা)

(বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তীর পত্র)

জয়মঙ্গল

টেলিফোন—৪৬-২৫০৫ ১১৭.১, সাদার্ণ এভিনিউ

কলিকাতা—২৯

১২।১।১৯৭০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রথমেই আপনার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করে নিই। আপনার আগেকার চিঠিটির কোনো উত্তর দিতে পারিই নি, এবারের চিঠিটির উত্তর দিতেও অসঙ্গত বিলম্ব হয়ে গেল, তবে নিজের সম্পর্কে বলতে পারি যে আমি এখন কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি এমকি উত্থানশক্তিও হারিয়ে প্রায় একটা জড়পিণ্ডের মতো পড়ে আছি। চিঠি লিখব অথবা লেখাব কি? আমি এখন সামান্য কিছু ভাবতেও পারি না, ভাবতে গেলে চিন্তার সূত্র বার বার ছিন্ন হয়ে যায়।

আনন্দের সহিত লক্ষ্য করছি যে আপনি আবারও সভাসমিতিতে যোগদান কচ্ছেন এবং আপনার স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে সভাজনদের তৃপ্ত কচ্ছেন। সুতরাং অনুমান করি আপনার দেহে অসুস্থতার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলি অপসৃত হয়ে গিয়েছে। আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থেকে শতায়ু লাভ করুন, সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি।

বর্তমানকালের লেখকদের লেখা সম্বন্ধে আপনার যে ক্ষোভ, আমারও সেই ক্ষোভ। আমার বিবেচনায় আধুনিক কবিতা, আধুনিক গান এবং আধুনিক চিত্রকলা সবই এক পর্যায়ের পদার্থ, অযোগ্য ও অক্ষম লোকদের অপসৃষ্টি। আপনি কুরুচি ও অর্থশূন্যতার উল্লেখ করেছেন, আমি তার সঙ্গে বাংলা ভাষার বিকৃতি যোগ করব। বাংলা গদ্যের যে একটা ছন্দ আছে, তাদের যেন সে জ্ঞানই নাই, গদ্যছন্দের কান নাই-ই। কবিতার কথা না বলাই ভালো। কবিতা নাম দিয়ে যে অজস্র লেখা আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলিকে পাগলের প্রলাপ বললে পাগলদের অবমাননা করা হয়। একবার 'বনফুল' নানা অসংলগ্ন উক্তি ও অবোধ্য শব্দ একত্র জড় করে আধুনিক কবিতার একটা Parody লিখেছিলেন,

আপনার নজরে পড়েছিল কিনা জানিনা। আপনার সঙ্গে আমি একমত যে বর্তমানে স্পষ্টভাষী এবং প্রয়োজন হলে রূঢ়ভাষী একজন বা একাধিক বিদগ্ধ সমালোচকের বড় প্রয়োজন ছিল। এককালে সুরেশ সমাজপতি, তার পরে যতীন্দ্রমোহন সিংহ এবং তারও পরে সজনীকান্ত দাস সাহিত্যের সম্মার্জনা কিছুটা করেছিলেন, যদিও তাদের কেউই প্রথম শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মতো সমালোচক বর্তমানে কাউকে দেখতে পাই না।

আপনি আমাকে সাহিত্য সমালোচকেব ভূমিকা নিতে আহ্বান করেছেন। আমার কি যোগ্যতা ? তা ছাডা আমাব তো শবীরেব এই অবস্থা। সমসাময়িক লেখা বিশেষ পডতেই পাবিনা, সেগুলির গুণ বিচাব করার দুঃসাহস কি করে হবে ?

এবারে শেষ করি। আপনি কৃপা পূর্বক আমাকে একদিন দেখতে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ কবেছেন, এলে আমি সত্যই বাধিত ও আনন্দিত হবো। ইতি

প্রীতিধন্য

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

(ডঃ নবেশচন্দ্র সেনগুপ্তেব পত্র)

36 Giris Mukherji Road
Calcutta Oct. 8, '31

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,

আপনাব 'মন্দিরেব চাবি' এই মাত্র পেলাম। কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তারই মাঝে একবাব চোপ বুলিয়ে দেখতে গিয়ে শেষ না ক'বে ছাড়তে পারলাম না— প'ডে বইল কাজ।

আপনার প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি হীবার টুকবা। যেমন দবদ দিয়ে লেখা তেমনি সঙ্গীতময়ী ভাষায় স্বচ্ছ সৌষ্ঠবে গবীয়ান। প'ড়তে প'ড়তে চোখ জলে ভেসে গেছে।

আপনার সাধনা সার্থক হোক। দেশের ঘবে ঘরে যদি পড়ে সবাই আপনার কবিতা, প্রাণের ভিতব গেঁথে রাখে তাকে, তবে প্রাণ তৃপ্ত হবে—দেশ মুক্তি পাবে জন্মজন্মান্তবের অভিশাপ থেকে।

কি ব'লে আপনাকে অভিনন্দন কববো জানিনা। ইতি

বিনীত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

Sardar Hrishikesh Chatterjee M.A.
Principal
D.A.V. College.

14. Church Road
Lahore
13.2.32

হে বন্ধু,

কাব্য যখন মুদগর হোয়ে ক্লাসের মধ্যে আজ আমাকে শ্রম ক্লান্ত করে তুলেছিল, যখন কবি বিশেষের অতি দার্শনিকতার গুরুভাবে ক্লিষ্ট হোয়ে পড়েছিলাম ও তার অমিত্রাক্ষর সুন্দর কলাকৌশল বিচার কর্তে গিয়ে মুহ্যমান হোয়ে শুধু 'থোড়ের' সন্ধানই মাত্র পাচ্ছিলাম—ঠিক সেই সময়ে আপনার পার্শেলটি পেলুম। বক্তৃতার মধ্যে খোলাও হোলো না। চাপরাশির হাতে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কলেজের পর নানা কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আপনার 'সাজের প্রদীপ' জ্বাললুম আমার পড়বার ঘরে। কী যে আনন্দ পেলুম তা আর বলে উঠতে পাচ্ছিনে।

এখন রাত্রি দুটো—বই দুখানিই শেষ করেছি, করেই চিঠি লিখতে বসেছি।

গীতিকার সঙ্গে যেন আপনার অনায়াস মিতালী—না আছে দ্বিধা, না আছে সঙ্কোচ—না আছে আড়ষ্ট ভাব। সে যেন আপনার আদিম যুগের বান্ধবী—যেন আপনার "দেখন হাসি"। সহজকে সহজ বলে গ্রহণ করতে না পারার অপরাধে আধুনিক বাঙলা কাব্য ভারাক্রান্ত। আপনার কবিতা পড়ে তাই এত আনন্দ পাচ্ছি। গীতি কবিতা হিসেবে আপনার কতকগুলি কবিতার তুলনা নেই। অনুভূতি আপনার যেমন গভীর ততখানি খাঁটি। আধুনিক বেদন-বিলাস একেবারে নেই। আর তা ছাড়া আপনার lyric sense—অর্থাৎ Sense of lyric unity খুব পরিস্কার বলে মনে হোচ্ছে।

'ধূপ' বলে কবিতার তুলনা নেই। আর শুধু 'ধূপ' কেন? যেটা পড়ি সেইটেই ভালো লাগে। বৈষ্ণব কবিতাগুলিও খুব সুন্দর লাগল। আর স্বদেশী কবিতাগুলি পড়ে মুগ্ধ হোয়েছি। আপনি প্রতিভাশালী এতে আমার সন্দেহ নেই। প্রবাসী বন্ধুকে মনে করে যে বই দু'খানি পাঠিয়েছেন এতে আনন্দে অন্তর ভ'রে উঠেছে। একটু অহঙ্কারও যে না হোচ্ছে তা কি করে বলি? আপনার ভাষার উপর অসম্ভব দখল দেখছি আর দার্শনিক ভাব ভাবনাকে অনুভূতি ও আবেগের মধ্যে একেবারে গলিয়ে ফেলে,—পরিপূর্ণরূপে রূপান্বিত করে—সেইগুলিকে গীতিপ্রবণ করে তোলার চাতুর্য আপনার অসাধারণ।

কাব্যের মধ্যে দর্শন যদি লোহার ভীমের মতো স্থাবর হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তা হলে সে দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। তখন কাব্য শুধু নিরর্থক কথামালা হোয়ে দাঁড়ায়। আপনার কবিতায় তত্ত্ব কথাগুলি অগ্নিবীণার সুরে সুরবদ্ধ হোয়ে সঙ্গীতের দীপালী হোয়ে উঠেছে। তবে প্রেমের কবিতাগুলি পড়ে একটি কথা মনে হোলো। আপনি তো বড় ভালমানুষ নন দেখছি !! ভিতরে এতো ছিল তাতো আগে বুঝিনি ? গোপনে বুঝি এই সব হোয়েছে—আর আমাদের কাছে একেবারে 'গঙ্গাজল' সেজে বসে ছিলেন ? তা ভালো। এখন বুঝলাম-যে কবিগুলি বড ভীষণ জীব। Mood of love have been excellently expressed through tiny little songs of exquisite art and in these poems lilts come as easy to you as cooing of the dove.

আজ কয়েকদিন থেকে ছেলেগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছিলুম—that a scientist is but a Poet turned inside out। আজ প্রমাণ পেলুম। ধারাটা আলাদা দু'জনের—যাত্রা এক পথেই এবং লক্ষ্য এক। একজন দেখবে সুন্দরকে বুদ্ধি দিয়ে—আর একজন প্রাণ ও অনুভূতি দিয়ে। একজন চাইবে সুন্দরকে নিরাময় করে শুভের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখতে—আর একজন চাইবে তাকে মরমিয়া সাধনার মধ্যে বরণ কত্তে—অর্থাৎ একজন সুন্দরের কুলপুরোহিত আর একজন সুন্দরের "মালঞ্চের মালাকর"। আপনি বৈজ্ঞানিক ও কবি—কাজেই দুইই।

আজ "রাভি" নদীর স্রোত বেয়ে আপনায় "সাঁঝের প্রদীপ"টি এই প্রবাসী বন্ধুর কূলে এসে লেগেছে। আমি আদর ক'রে তুলে নিলুম। আমার আঙিনাতে অনির্বাণ হোয়ে জ্বলুক এই প্রার্থনা তাঁর কাছে যিনি আপনার প্রদীপ জ্বেলেছেন। আর এখানে অন্ধকার যদি কখনো বেশী ঘনিয়ে আসে, তবে আমার দেয়ালির দেবতা যেন দীপগুচ্ছের সঙ্গে আপনার শিখাটিকে এক করে আমার অঙ্গনের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ইতি সুরমুগ্ধ
শ্রীহৃষীকেশ*

(* প্রথিতযশা ইংরাজি অধ্যাপক, লাহোরের D A V College-এর Principal শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় নিজেও একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন।)

পুনশ্চ:—আপনি বৈষ্ণব কবিতা ও 'কণিকা'-র মতো ছোট কবিতা লিখেছেন দেখে আমার দু-একটা ঐ ধরণের কবিতা পাঠাচ্ছি, দেখবেন—

(১)

রূপ কহে মোর মাঝে অরূপের শ্যামল প্রকাশ
রস কহে আমি যে গো বিরাটের অন্তর-বিলাস।
গন্ধ কাঁদি বলে—আমি শ্যাম অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন
শব্দ বলে আমি তার বাঁশরীর মধুর গুঞ্জন।
স্পর্শ কহে—তাঁর দেহে পুলকের ছন্দে আমি বাঁধা,
প্রেম কহে হাসি হাসি—আমি তাঁর বিনোদিনী রাধা॥

(২)

নভঃ গর্বে বলে—'মোর তারার মতন
হে পৃথ্বি, তোমার কিছু আছে কি রতন?
ধরণী শতধা হেল মূক বেদনায়
অশ্রু জলে ফুটাইল রজনীগন্ধায়।

(৩)

চৈতন্যের আবির্ভাব সঙ্গীত

তোমার আরতি রাই বুঝিনা কেমন তাই
বিস্ময় লাগিছে বড় মনে;
শ্যাম অঙ্গ তেয়াগিব রাধিকার কান্তি নিব
পিরীতি করিব কালা সনে।
ঝুরিবে তোহারি পারা অঝোরে নয়নধারা
গোরা হবে কালিয়াবরণ
কৃষ্ণমুখী হোয়ে রব আন্ কথা নাহি কব
কানু হবে জীবন মরণ।
পিরীতির লীলা মাঝে সাজিব নবীন সাজে
এক অঙ্গে হব কৃষ্ণরাধা
অন্তর যমুনা কূলে প্রেমের কদম্বমূলে
বেণু বাজে মোরি নামে সাধা॥

(৪)

কূল বলে নদী তোরে রাখি বাহু পাশে
দূর হোতে মহাসিন্ধু মৃদু মৃদু হাসে॥

Senate House
Calcutta
(31 Southern Avenue, 21.7.46)

সুহৃদ্বরেষু

প্রিয় ডাঃ সেনগুপ্ত,

আপনার প্রবর্তকে প্রকাশিত "ছন্দের মূল্য" কবিতাটি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। অনেকদিন এমন চমৎকার কাব্য গুণোপেত, ভাষায় ও ভাবে মনোহর কবিতা পাঠ করি নাই। ভাবের মৌলিকতা ও প্রকাশের সংযত গাম্ভীর্য ও অনবদ্য শব্দ নির্বাচন কবিতাটিকে বড়ই উপভোগ্য করিয়াছে। অতি আধুনিকদের তথাকথিত বাস্তবতা-কণ্টকিত, কথ্যভাষায় অপপ্রয়োগে আভিজাত্যচ্যুত, কল্পনার রিক্ততায় কঙ্কালসার কবিতা পাঠ করিয়া কবিতার উপরেই একটা অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। আপনার সংস্কৃত-শব্দপ্রধান কবিতাটি পাঠ করিয়া মনে হইল কবিতা উহার স্বভাবমহিমা এখনও হারায় নাই।

এ বৎসর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠ করিয়াছি—তাহা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'অরবিন্দের প্রতি' 'সোনার বাংলা'র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত। এই সমস্ত শুভলক্ষণ দেখিয়া কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদ অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর কবিতাটির জন্য আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

অনেকদিন দেখা হয় নাই। শ্রীমান্ কাননবিহারী অনেকদিন সাড়া দেয় নাই। জানিনা শ্রীমান্ বনে গিয়া নিজ অভিধানের সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে কিনা। ভরসা করি শীঘ্রই দেখা হইবে।

ইতি ভবদীয়
শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আসামের প্রতি*

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আসাম কি তবে
আসামী সে হবে
ফরিয়াদী হবে বঙ্গ ?
হায় মা ভারত! হায় মা ভারতী।
এ কি কদর্য রঙ্গ !
মহাপ্রভুর পিতৃভূমি সে
তীর্থভূমি যে আজো
কামাখ্যায় যে মহাপীঠ বলি
মহাদেবী তুমি বাজো।

অহমিয়াদের অহমিকা কি মা
লঙ্ঘিয়া গিয়া পবিমাণ সীমা
প্রতিবেশী সবে ডাকিবে আহবে
'যুদ্ধং দেহি'—রবে,—
কবিবে নূতন কুরুক্ষেত্রে
নব-রণ তাণ্ডবে ?

এক ভাবতেব স্তন্যে লালিত
পালিত সকলে তাবা
নাড়ীতে নাড়ীতে হয় প্রবাহিত
একই রক্তধারা।

বসবাস কবে এক আঙিনায়
আসে যায় হেথা সেথা,—
একই অন্ন ভাগ কবে খায়—
যে পায়—যেমন—যেথা।

সম্প্রতি জিনি স্বাধীনতা বণ
সম্প্রীতি বিনা নহে বক্ষণ
ছাঁটিয়া পরিধি, বাঁটিয়া সীমানা
কাটিলে পরস্পরে—
গৃহ বিপ্লবে শত্রু হাসিবে
পড়শী পলাবে ডবে।

বিবেক কি আজ চক্ষু ঢেকেছে
অন্ধ ছেলেবা মায়েরে ভুলেছে
করিছে দ্বন্দ্ব মন্দ ভাগ্য
কহিছে মন্দ ভাষা
সাক্ষ্য মঞ্চে কহিছে বাক্য
ঘরের ঐক্য নাশা।

যে ভাষা ভাষিয়া ডেকেছো মা বলি
যে ভাষা পৃথক্ নহে
সে-ভাষা সকল ভাষার পিছনে
ফল্গুর মত রহে।

(* সাম্প্রতিক আসাম আন্দোলনের সময়ে সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের এই কবিতাটি সর্বপ্রথম রবিবাসরে পঠিত হয় এবং এর মর্মস্পর্শী আবেদন অতিশয় সময়োচিত বিবেচিত হওয়ায় কবিতাটি ছেপে বিভিন্ন পত্রিকায় ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে বিতরিত হয়। বহু পত্রিকাতে সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি প্রকাশিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ শাসক মহলেও সমাদৃত হয়। এটি সংকলনে রাখবার জন্য আমরাও ছাপলাম।—স.)

সে ভাষা ভাষিছ অন্নপ্রাশনে
চিতায় অগ্নিদানে
নান্দীমুখে ও বিবাহ-বিধানে
স্বস্তি বাচনে গানে।

হায় রে! আত্ম বিস্মৃত জাতি
পরাধীনতার পায়ে মাথা পাতি
সাতশো বছর ঘুমায়ে ভুলেছো
নিজ গৃহ সম্মান,—
শত্রু হাসায়ে নিজে হাসিতেছো
রসিকতা করি জ্ঞান!

ওৎ পেতে আছে সিংহ ব্যাঘ্র
চির জিঘাংসু তারা
এ মহাদেশের দুর্গতি নিয়ে
ব্যবসায় করে যারা।

পর পদতলে থাকি এতকাল
মাখি পর পদধূলি,—
শুভ্র তুষার কিরীটিনী, মার
মুকুটে দিবে তা' তুলি?

মায়ের অঙ্গে আঘাত যে করে
ভগিনীরে অপমান
ভায়ের শোণিত প্রবাহে যে করে
ক্রূর হিংসায় স্নান—
হিন্দু সে নয়, মুসলিম নয়—
এরা দেখিতেই নর
'নর'.এরা নয় দ্বিপাদ দ্বিভুজ
নরাকার স্থলচর।

নির্দোষীদের প্রতি রোষ ভরে
গৃহদাহ করি রোশ নাই করে—
বিকৃত-প্রকৃতি স্বভাব তাহারা
শ্বাপদ বিবর্তন,—
মনুষ্যত্বে পশুর সত্তা
পাইল পশুর মন।

যারে হানিয়াছো, টানি নাও কোলে,
মানিয়া ভগ্নী-ভাই
তারা বিনে আর বিপদের দিনে
আপনার কেহ নাই।
তাদেরে কাঁদায়ে বাঁধিবে যে ঘর
বুনিয়াদ তার কাঁচা
"ভাই-ভাই" এক ঠাঁই না হইলে
'ঠাঁই-ঠাঁই' মিছে বাঁচা।

কত অজানারে করেছো আপন
কেমনে ত্যজিবে আপনার জন?
জননীর মুখে মসী মাখাইয়া
নিজে মাখি পাউডার
ব্রহ্মপুত্রে ডুবেও পাবে না
সে পাপের নিস্তার।

হউক উদয় শুভ বুদ্ধির
ম্লান মুখ পানে চাহো জননীর
সন্তান সবে হও একপ্রাণ
খুলিয়া চোখের ঠুলি
বুঝিবে তোমার আমার সবার
একই মাতৃ বুলি।
এক ভারতের ভারতীয় মোরা
সে কথা কভু না ভুলি।

ইংলণ্ডের জাতীয় রঙ্গালয়

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি. ঈ., সি. ঈ.,

আমাদের দেশে জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য সরকারকে বারম্বার আবেদন নিবেদন ক'রে বিফল মনোরথ হ'য়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমাব প্রয়াত হয়েছেন। সরকারেব নিষ্ক্রিয়তা ও দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদে তিনি সবকারী উপাধি 'পদ্মশ্রী' পরিত্যাগ করেন। তবু আজও কংগ্রেস, যুক্ত-ফ্রন্ট, এমনকি কমিউনিষ্ট সরকারের আমলেও শিশিরকুমারের জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন সফল হয় নি।

টেম্‌স নদীর দক্ষিণ পাডে পুরাতন লণ্ডন বন্দবের গুদাম ভেঙ্গে নবনির্মিত 'জাতীয় বঙ্গশালা' গডে উঠেছে। এর বারান্দা থেকে টেম্‌স নদীর অপরপারে পার্লামেণ্ট বিল্ডিং ও 'বিগ বেন' ঘডি দেখা যায়। আর দেখা যায় দিগন্ত রেখায় বহু নবনির্মিত হর্ম্য। আশ্চর্য লাগে তখনই যখন শুনি, ১৯৭৬ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনটি থিয়েটারের সমন্বয়ে গঠিত 'জাতীয় থিয়েটারেব' নিজস্ব ভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন কবলেন ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী এলিজাবেথ II। সেক্সপীয়রের নাটকের দেশে জাতীয় রঙ্গশালার নিজস্ব বাড়ী গডে উঠতে লেগে গেল কয়েকশ বৎসর। এই নতুন জাতীয় রঙ্গশালার পরিকল্পনা কবেন স্যার ডেনিস লাসডান, এর তিনটি বিভিন্ন বঙ্গমঞ্চের নাম হ'ল যথাক্রমে। (১) অলিভিয়ার থিয়েটার (২) লিটলটন থিয়েটার ও (৩) কটিসলো থিয়েটার।

অলিভিয়ার থিয়েটার :—এটি ইংলণ্ডের খ্যাতিমান সেক্সপীয়রের নাটকের সুবিখ্যাত নট ও বর্তমানে ছায়াচিত্র শিল্পী লড অলিভিয়ারের নামানুসারে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নটের অপূর্ব নাট্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি দেন ও পরে তাঁকে 'লর্ড' করা হয়। তিনি একসময়ে জাতীয় থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন, তখন 'জাতীয় থিয়েটার' 'ওল্ড ভিক্' থেকে পরিচালিত হত। এই রঙ্গমঞ্চের আসনেব পরিকল্পনা হাতপাখার মত। মেঝে থেকে ক্রমোচ্চ আসনের ব্যবস্থা আছে। এটিতে এগারোশ' ষাটজন দর্শক বসতে পারে। মঞ্চটী মেঝেব সঙ্গে আনুভূমিক সাজানো। কিন্তু দর্শকের আসন এ্যাম্পি থিয়েটাবের মত খাডাই উঠে গেছে। বৃটিশ রঙ্গমঞ্চের এই নবতম বিন্যাস

আমায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোম রাজ্যে এ্যাম্পি থিয়েটারের চলন ছিল, যার নিদর্শন জর্ডনের আম্মানে, পেত্রায় ও জেরাস প্রভৃতি রোমক অধ্যুষিত স্থানে দেখতে পাই। আর দেখতে পাই লেবাননের বাল্বেকে এ্যাম্পি থিয়েটার আনন্দ বিনোদনের স্থান হিসেবে।

লিট্‌লটন থিয়েটার :—এই রঙ্গমঞ্চটি আটশো নব্বইটি আসন সংযুক্ত। প্রচলিত নাট্যশালা নির্মাণের কলাকৌশল প্রয়োগে এটা প্রস্তুত। এই প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্তে মঞ্চটি একটু উচ্চ স্থাপিত। এটি অলিভার লিটল্‌টনের নামানুসারে লিটলটন থিয়েটার' রাখা হয়েছে। এই লিটলটন ছিলেন জাতীয় নাট্যশালা বোর্ডের প্রথম সভাপতি। উনি পরে লড চেণ্ডোস নামে যশস্বী হন।

কটিসলো থিয়েটার :—এটি ক্ষুদ্রতম প্রেক্ষাগৃহ। এতে ৪০০ জন দর্শক বসতে পারে। এটি চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ যার তিনদিকে দর্শকদের বসার আসন। মাঝের জায়গাটুকু নাটকের উপযোগী করে নির্মিত যেখানে দৃশ্যপটের কোন বালাই নেই। কেন্দ্রস্থিত মঞ্চটি কিন্তু সংকুচিত করে দর্শকের আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এটিতে দুটি স্তরে বসার গ্যালারী। এই রঙ্গমঞ্চটি অবলোকনে এদেশে গ্রামীন সংস্কৃতি ও যাত্রার পালা (বর্তমানের নয়) আসরের মত। সাজঘর থেকে নটনটী বেরিয়ে আসবে কেন্দ্রস্থিত মঞ্চে যেখানে দর্শক পরিবৃত হয়ে নটনটীরা তাঁদের অভিনয় কলা প্রদর্শন করবেন। যাঁর স্মরণে এই রঙ্গমঞ্চটি তিনি হলেন সাউথ ব্যাংক বোর্ডের প্রথম সভাপতি 'লড কটিসলো'। তাঁরই প্রচেষ্টায় এই জাতীয় নাট্যশালা সরকারের অনুমোদনে নির্মিত হয়।

এই জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার বিপুল অর্থব্যয় শুধু থিয়েটারের টিকিট বিক্রী করে সম্ভব নয়। এতে আর্থিক সাহায্য আসে—গ্রেট ব্রিটেনের 'আর্ট কাউন্সিল' থেকে ও 'গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল' থেকে। এই জাতীয় নাট্যশালা গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল ভূমির উপর স্থাপিত। এর গঠনকার্যে হ্যাণ্ডসন ট্রাস্ট থেকে প্রচুর অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পরিচালন ভার 'ন্যাশনাল থিয়েটার ফাউণ্ডেশনের উপর। এটি 'দাতব্য অছি পরিষদ' যার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল জাতীয় থিয়েটারের বহুমুখী কার্যসূচী রূপায়িত করা ও দুস্থ কর্মীদের প্রয়োজন মত যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া। এর সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ, সেটি রবিবার ছাড়া সবদিনই খোলা থাকে, এখানে সাত পাউণ্ড ব্যয়ে সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত 'ডিনার' পাওয়া যায়। ওই সাত পাউণ্ডের মধ্যেই সার্ভিস চার্জ ও পনেরো শতাংশ (VAT) ভি. এ. টি. ও ধরা আছে।

শনিবার বেলা সওয়া বারোটা থেকে বিকেল আড়াইটা পর্যন্ত সওয়া চার পাউণ্ড ব্যয়ে পর্যাপ্ত 'বুফে লাঞ্চ' করা যায়। বাচ্চাদের জন্য কিছু মূল্য হ্রাসও আছে। এই রেস্তোর াঁয় ২০০ জনের উপযোগী ককটেল পার্টি ও বুফে লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। বসে খাওয়াতে গেলে ১১০ জনের উপযোগী আসনের ব্যবস্থা হ'তে পারে। এই জাতীয় নাট্যশালার বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনের জন্য দিনে পাঁচবার একঘণ্টা ব্যাপী কর্মসূচী আছে। এ সংবাদ লিটলটন থিয়েটারের অনুসন্ধান অফিসে পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে এসে একদিন স্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থেকে তাঁর আগে-থেকে-কাটা লণ্ডন থেকে গ্লাসগোর যাতায়াতের টিকিট নিলাম। পরের দিন সপরিবারে স্বকুমার আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। আমি তাঁকে জাতীয় রঙ্গালয়ের এবং একটি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখার জন্য পাঁচখানি ক'রে টিকিট কেটে রাখতে বলেছিলাম। গ্লাসগো থেকে লণ্ডনে ফিরে আসার পরের দিন ও তার পরের দিনের জন্য। স্বকুমারের দুই মেয়ে ও স্ত্রী স্বকুমার ও আমি এই পাঁচজন স্বকুমারের গাড়িতে জাতীয় থিয়েটারে আর্থার স্নিজলারের মূল রচনা ও টম ষ্টপার্ড কর্তৃক নাট্যরূপ দেওয়া 'আন্‌ডিসকভারড্ কান্ট্রি' (Undiscovered Country) দেখতে গেলাম। এই নাটকটি পরিচালনা করেন পিটার উড, সংগীত পরিচালনা জন হোয়াইট, আলোক-সম্পাত রবার্ট ব্রায়োণের; সাজসজ্জা ডেভিড ওয়াকার এবং শব্দ পরিবেশন ডেরিক জিবার।

এই নাটকটি চল্‌ল মাঝখানে বিশ্রামের সময় ধরে পৌণে তিন ঘণ্টা। এটি পাঁচটি অঙ্কের নাটক; প্রথম অঙ্কে দৃশ্যপট এমন সাজানো, মনে হবে একটি ভিলার মধ্যে আছি। এই ভিলাটি হল ভিয়েনার সন্নিকটে বেডেন নামক স্থানে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য হোফ্রীটারের ভিলা। দ্বিতীয় অঙ্কে হোফ্রীটারের বাগান। তৃতীয় অঙ্কে ডলোমাইটের একটি পার্বত্য হোটেলে বাইরে বসার জায়গা। চতুর্থ অঙ্কে হোফ্রীটারের বাগান ও পঞ্চম অঙ্কে প্রথম অঙ্কেরই দৃশ্য।

এয়ার-ইণ্ডিয়ার ধর্মঘটের জন্য আমার লণ্ডনে অবস্থিতি কিছু দীর্ঘায়িত হল। তখন আমরা চারজনে জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রীতা ব্যতিরেকে একদিন 'টম ষ্টপার্ডে'র "ডার্টি লিনেন" (Dirty Linen) দেখতে গিয়েছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দে মাতরম্

ডঃ শিবদাস চক্রবর্ত্তী

প্রখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে যেমন ইতালীয় ঐক্যের স্বপ্ন বুকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত রচনার সময় ভাবতে পারেন নি যে, ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে তাঁর রচিত সঙ্গীত একদা ইতালীয় জনগণের রাজনৈতিক বিবর্তনে এক মহান ভূমিকা পালন করবে, তেমনি কবি বঙ্কিমচন্দ্রও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনার সময় বুঝতে পারেন নি তাঁর সঙ্গীত স্বদেশী আন্দোলনের সময় এবং তারপর ভারতের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন্ বিধি-নির্দিষ্ট গৌরবময় ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'এ নেশন্ ইন্ মেকিং' গ্রন্থে স্মৃতি চারণার সূত্রে 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। রাষ্ট্রগুরুর এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। তাঁর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, দান্তের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর যে ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রায় সেই ভূমিকা। বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ হচ্ছেন 'বন্দে মাতরম্' মহা-সঙ্গীতের আদি যুগের দুই মহা ভাষ্যকার এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মহান্ প্রচারক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'-এর গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। তার আগে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাস যখন 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি আনন্দমঠের অঙ্গীভূত হয়ে 'বঙ্গ দর্শন'এর পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে। পাদটীকায় লেখা ছিল 'সুর—মল্লার'। কিন্তু কবিতাকারে এটি রচিত হয় আরও বছর পাঁচেক আগে, অনেকের মতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। শোনা যায়, বঙ্গদর্শনের কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ-দর্শনের স্তম্ভ পূরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি লেখা চান। তাঁর তাগিদেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' কবিতাটি রচনা করে বঙ্গদর্শনের জন্য দেন। কিন্তু চাটুয্যে মশায় নাকি বলেন যে অত অল্পে বঙ্গদর্শনের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটবে না; তার জন্য চাই উপন্যাস। ফলে 'বন্দে মাতরম্'-এর আত্মপ্রকাশ বিলম্বিত হয়।

সে যা'ই হোক, 'আনন্দ মঠ'-এর অঙ্গীভূত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ার দিকে বঙ্গদর্শনে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি স্বদেশী আন্দোলনের আগে জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। স্বদেশী যুগেই বন্দে মাতরম্ জাতির মুক্তি সাধনায় বীজমন্ত্র স্বরূপ হয়ে ওঠে। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে প্রথম সুর-সংযোজনার প্রসঙ্গটিও বিতর্কের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে হুগলী চুঁচুড়া সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ 'সংহতি'র পক্ষ থেকে 'বন্দে মাতরম্—একটি সঙ্গীতের জন্মকথা' নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে যে কবিতার আকারে 'বন্দে মাতরম্'-এর জন্ম হয় কাঁঠালপাড়ায় কিন্তু সঙ্গীতরূপে তার পুনর্জন্ম হয় হুগলী—চুঁচুড়া শহরে। ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চুঁচুড়ার একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বন্দে মাতরম্-সঙ্গীতে প্রথম সুর সংযোগ করেন। তিনিই বন্দে মাতরম্-এর প্রথম গায়কও বটে। কিন্তু সেই সুরের নমুনা কবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের অনুরোধে উদীয়মান তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম্-এ সুর দিয়ে গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন! সম্ভবতঃ এটা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ একই সুরে বন্দে মাতরম্ গান করে শ্রোতাদের অভিভূত করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গানটিতে সুর দেন নি, 'সুখদাং বরদাং মাতরম্' পর্যন্ত সাতটি পংক্তিতে সুর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সুরের স্বরলিপি স্বরবিতানের ছেচল্লিশ সংখ্যক খণ্ডে বিধৃত আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিদুষী বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে যে শিশু মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় (বৈশাখ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ), তার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রতিভাসুন্দরী দেবীর নামে 'বন্দে মাতরম্'-এর একটি স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই স্বরলিপির সুরও যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির এত সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার আগে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তি সঞ্চারিত হয় নি কিংবা বন্দে মাতরম্ জাতীয় মুক্তিমন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেনি। এ সম্পর্কে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্তর অভিমত সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় কিংবা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার ও কারাদণ্ডের সময়ে (১৮৮৩) বেত্রাহত ছাত্র সম্প্রদায়ের কণ্ঠে

বন্দে মাতরম্ একবারও উচ্চারিত হয় নি।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বয়কট ও স্বদেশীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সভায় সমবেত অসংখ্য মানুষের কণ্ঠে সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' নব্য জাতীয়তাবাদের জপ মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রফুল্ল কুমার সরকার তাঁর 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' (২য় সং, ১৯৪৭, পৃঃ ৬৫) গ্রন্থে বলেছেন যে সেদিন (৭ই আগষ্ট) যে সমস্ত উৎসাহী ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তাদের কণ্ঠেই 'বন্দে মাতরম্' প্রথম সঞ্জীবনী রাজনৈতিক ধ্বনি রূপে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্র-ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী অবশ্য ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'জীবনের ঝরাপাতা' নামে তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেনঃ 'বন্দে মাতরম্ শব্দটি মন্ত্র হল সব প্রথম যখন মৈমনসিংহের স্বজন-সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দু'টি হুংকার করে করে যেতে থাকেন। সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল…'। কিন্তু সম্ভবতঃ সরলা দেবীর এই ধারণা ঠিক নয়। তবে 'বন্দে মাতরম্' গানের তাৎপর্যের ভারতীয় করণে সরলা দেবীর অবদান অনস্বীকার্য।

বঙ্গভঙ্গের বছর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সেই অধিবেশনে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে সমাগত প্রতিনিধিদের দাবি পূরণের জন্য গোখলে সরলা দেবীকে 'বন্দে মাতরম্' গানখানি গাইতে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে বলা হয়েছিল সরলা দেবী যেন সমগ্র গানখানি না গেয়ে সংক্ষেপ করে গান। সরলা দেবী সেই সুযোগে 'সপ্ত কোটি কণ্ঠ'র জায়গায় 'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ' কথা ক'টি বসিয়ে সংক্ষেপেই 'বন্দে মাতরম্' গাইলেন। উপস্থিত শ্রোতারা আনন্দে উদ্বেল হয়ে 'বন্দে মাতরম্'কে স্বাগত জানালেন। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে যে মাতা দিলেন বঙ্গ মাতা, তিনি ভারত মাতায় রূপান্তরিত হলেন। পরাধীন ভারতের মুক্তি মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি রূপে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বভারতীয় স্তরে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট 'বন্দে মাতরম্' নব্য জাতীয়তাবাদের জপ মন্ত্ররূপে সর্বপ্রথম হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়; একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর দু'মাসের মধ্যেই (অক্টোবর, ১৯০৫) উত্তর কলকাতায় 'বন্দে মাতরম্ ভিক্ষু সম্প্রদায়' নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। সম্ভ্রান্ত বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের চেষ্টায় এই সংস্থা গড়ে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই দলে দলে তরুণেরা এতে যোগদান করে। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র, সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। প্রতি রবিবারে এই সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ বন্দে মাতরম্ গান করতে করতে পথ পরিক্রমা করতেন এবং গৃহস্থদের কাছ থেকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান গ্রহণ করতেন। কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই শোভা-যাত্রায় যোগদান করতেন। এই সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাবাদী চেতনার সঞ্চার করা।

শুধু কলকাতাই নয়, অচিরেই মফঃস্বল শহর, এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বাণী অনুসরণ করে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন ঘিরে যেভাবে 'স্বদেশী আত্মা'র নব জাগরণ ঘটেছিল, তাতে এমন দিন ছিল না যেদিন বন্দে মাতরমের সোচ্চার ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস মুখর হয়ে ওঠেনি। সমস্ত মফঃস্বল শহরের মধ্যে বরিশাল শহর সেদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিকায় বরিশালে এই আন্দোলন কী প্রবল আকার ধারণ করেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ১৯০৫-এর এপ্রিল মাসে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনস্বরূপ যজ্ঞভঙ্গ। সভার আগে জেলা-শাসক 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারী করেন। এই নিষেধ অমান্য করবার অপরাধে পুলিস লাঠি চালনা করে। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার বালক পুত্র চিত্তরঞ্জনকে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করবার অপরাধে পুলিশ নির্মমভাবে মারতে মারতে রাস্তার ধারে পুকুরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। রক্তে ভেজা ক্ষত বিক্ষত দেহেও সে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে থাকে। সে এক করুণ অথচ গৌরবময় ইতিহাস।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মধ্যে যে বৈপ্লবিক সুর, যে নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনা নিহিত ছিল, তার ব্যাপক প্রচারে অগ্রণীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল ১৯০৬-এর আগস্ট মাসে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি প্রচ্ছন্নভাবে দু'টি পন্থায় বইতে শুরু করে। সে সময় যাঁরা চরমপন্থী মত পোষণ করতেন, তাঁরা সর্বভারতীয় স্তরে

নিজেদের ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যমের অভাব বোধ করতে থাকেন। এই সময় মনীষী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের প্রচেষ্টায় 'India for Indians' এই আদর্শ বাণী শিরোধায করে 'বন্দে মাতরম্' দৈনিকের আবির্ভাব ঘটে। বিপিনচন্দ্রই ছিলেন বন্দে মাতরম্-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বিপিন চন্দ্রের অনুরোধে অচিরেই শ্রীঅরবিন্দ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই পত্রিকার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। একের পর এক অতি উচ্চ মানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে শ্রীঅরবিন্দ সে সময়কার যুব বাংলার বৈপ্লবিক মনোভাবকে অননু-করণীয় ভঙ্গীতে বাঙ্ময় করে তোলেন। স্বদেশী যুগে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হাতিয়াররূপে বিপিনচন্দ্র যে সুসংগঠিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-এর (Passive Resistance) কৌশল ঘোষণা করেন, শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম-এ প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তার তাত্ত্বিক রূপ রচনা করেন। বলা বাহুল্য, গান্ধী যুগের 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' স্বদেশী যুগের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' এরই উত্তরসূরী। প্রসঙ্গতঃ বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' ফৌজদারী মামলার কথাও উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন, এই মামলায় প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং সেই মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবার ফলে বিপিনচন্দ্রকে কারাবরণ করতে হয়েছিল।

যুব বাংলার প্রাণস্পন্দন বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বন্দে মাতরম্ এর মধ্যে এমন গতিবেগ প্রবাহিত হতে থাকে যে অচিরেই তা' বাংলার সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বে, পুনা, মহারাষ্ট্র, নাগপুর, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ সর্বত্র ভারত মাতার মুক্তিকামী সন্তানেরা বন্দে-মাতরম্ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে উত্তরবঙ্গে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সময় এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া শুরু হলো তখন সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ কর্মাধ্যক্ষেরা সমস্ত্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজের উর্দিপরা সৈন্যরা শহরের মধ্যে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা 'বন্দে মাতরম্'—ধ্বনি উচ্চারণ করে অভ্যর্থনা করত।

শুধু বাংলা এবং ভারতবর্ষই নয়, ভারতের বীর সন্তানেরা 'বন্দে মাতরম'কে সুদূর সাগরপারেও প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লণ্ডনের ভারতীয় যুবকেরা বীর সাভারকর এবং হরদয়ালের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলে কথিত সিপাহী বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী

পালন করেন। সেই সময় বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে লণ্ডনের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রের শিরোনামে লেখা হয় 'বন্দে মাতরম্' সভা শুরু হয় বন্দে মাতরম্ গান গেয়ে, সভা চলাকালে মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে সভাকক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভীত ও বিব্রত ব্রিটিশ সরকার সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের জন্য The News papers (Incitenent to offences) Act (অপরাধে উস্কানি দান-দমন মূলক সংবাদপত্র আইন) পাশ করল। এই আইনের প্রথম বলি হলো 'যুগান্তর'! তারপর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা। ১৯০৮-এর ২৯-এ অক্টোবরের পর 'বন্দে মাতরম্'-এর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্'-এর অকাল মৃত্যুর পর বিখ্যাত বিপ্লবিনী মাদাম কামা (শ্রীযুক্তা ভিখাজী রুস্তম কামা) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্যারিস থেকে 'বন্দে মাতরম্' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হলো। মাদাম কামার উদ্যোগে সেখান থেকে ভারতের যে জাতীয় পতাকা তৈরি হলো, তার বুকে দেবনাগরী হরফে লেখা হলো 'বন্দে মাতরম্'। ইউরোপ ভূখণ্ড অতিক্রম করে 'বন্দে মাতরম্'-ধ্বনির ঢেউ যে আমেরিকার উপকূলে গিয়েও পৌঁচেছিল, গদর আন্দোলন তার সাক্ষ্য বহন করে। শোনা যায় গদর আন্দোলনের নেতারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতেন 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত তথা বন্দে মাতরম্-চেতনার দু'জন মহাভাষ্যকার ছিলেন বিপিনচন্দ্র এবং শ্রীঅরবিন্দ এ কথা এই প্রবন্ধের সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে। একালের ইতিহাসকার মুখার্জি দম্পতির মতে অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র ছিলেন 'kindred spirits in the political field, bound together by strong ties of devoted allegiance to a common political creed'. স্বভাবতঃই বন্দে মাতরম্-মহামন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে দু'জনেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ শুধু 'বন্দে মাতরম্'-এর ইংরেজী অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, 'বন্দেমাতরম্'—পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে বন্দে মাতরম্-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন। আর বিপিনচন্দ্র করেছিলেন 'Bande Mataram' (জুলাই, ১৯০৬) এবং 'Mataram in Bande Mataram' (অক্টোবর, ১৯০৬) নামে দু'টি ইংরেজী প্রবন্ধে এবং শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত 'ধর্ম' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩১৬

বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ মাসে প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' শীর্ষক একাধিক ধারাবাহিক প্রবন্ধে। বিপিনচন্দ্রের ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধের মূল সুর অনেকাংশে এক বলে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করা হলো। বিপিনচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বলেছেন—'বন্দে মাতরম্ গান নহে, মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের একজন ঋষি ও এক বা ততোধিক দেবতা থাকেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি সন্তান-সম্প্রদায়, প্রবর্তক মহাপুরুষ, পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতা জন্মভূমি।'[৫] তবে সমগ্র সঙ্গীতটির মধ্যে শুধু বন্দে মাতরম্ কথাংশই যে মন্ত্র তা' পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'যে শক্তিশালী সঙ্গীতের পুরোভাগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমগ্রটা মন্ত্র নহে।' বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন—'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত মায়ের সাধন মন্ত্র নহে, স্তব। মন্ত্র স্বল্পাক্ষরে, স্তব যত দীর্ঘ হউক না কেন, তাহাতে তাহার স্তুতিগুণ নষ্ট হয় না। মন্ত্র অন্তরঙ্গ সাধন, স্তব বহিরঙ্গ সাধন; মন্ত্র সূত্র, স্তব বৃত্তি।...আগে মন্ত্র, পরে স্তব। মন্ত্র প্রভাবে দেবতা প্রকাশিত হইলে স্তব সেই প্রকাশের ছবি আঁকিয়া তাহার রূপ-গুণের বর্ণনা করে।' তাঁর মতে মন্ত্র ধ্যানের বিষয়, ধ্যানের রাজ্য অপ্রাকৃত, আর স্তব মনের বিষয়, মনোরাজ্য প্রাকৃত। বিপিনচন্দ্রের কথায়—'ধ্যানের বিষয় মনোরাজ্যে প্রবেশ করিলেই তাহাকে প্রাকৃতের নিয়মাধীন হইয়া রূপরসাদিতে সন্নিহিত হইতে হয়। ধ্যানলব্ধ অপ্রাকৃত মাতৃরূপ মানসপটে এই জন্য—'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং—।'

বঙ্গভঙ্গ রহিতের সঙ্কল্পকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রূপান্তরিত,'বন্দে মাতরম্'' ধ্বনিতে যখন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, তখন সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ-রাজ বাঙালীর দর্প চূর্ণ করার জন্য, ভারতবাসীর স্বপ্ন-সৌধকে ভেঙে চুরমার করবার জন্য ঘৃণ্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো। সেই কূটনীতির ছায়াতলে উপ্ত হলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরূপ বিষবৃক্ষের বীজ। সেই বীজ অচিরেই অঙ্কুরিত হয়ে কেমনভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে 'মুস্লিম লীগ' রূপ মহীরুহে পরিণত হয়েছিল এবং তার ফলাফল কী হয়েছিল, তা' সকলেরই জানা। একই সময় চেষ্টা হয়েছিল অপব্যাখ্যানের মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম্'-এর মর্যাদাহানির। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে যিনি প্রকাশ্যে অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বলে প্রখ্যাত গ্রীয়ারসন (জি. এ. গ্রীয়ারসন) সাহেব। তিনি 'বন্দে মাতরম্-এর মধ্যে বন্দিতা মাতাকে 'The

Goddess of death and destruction (মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী) বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে প্রাজ্ঞ গ্রীয়ারসন সাহেব নিজের অজ্ঞতাকে অনাবৃত করে মন্তব্য করেছিলেন যে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা হিন্দুদের জ্ঞানের অগোচর ছিল—'The idea of a "mother land" is wholly alien to Hindu ideas'. 'মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তি' কিংবা 'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র-বচন বা বেদ-বাণী হয় তো গ্রীযাবসন সাহেব জানতেন না, অথবা জেনেও না-জানার ভান কবেছেন। সে যাই হোক্, গ্রীয়ারসন সাহেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'বন্দে মাতরম্'-এর অপ-ব্যাখ্যানের সূচনা করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পরবর্তীকালে এদেশেও মানুষের অভাব ঘটেনি।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'ব অপরিহার্য ফলস্বরূপ লীগপন্থী বলে পরিচিত ভারতীয় মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশ ভারতের স্বাধীনতার সাধনার মূল প্রবাহ থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হবার স্বর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। মুসলিম লীগ ক্রমশঃ জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিরূপে দেখা দিতে লাগল। লীগ-সদস্যগণ বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়ে জাতীয়তার স্তবে 'বন্দে মাতরম্-এব ভূমিকার বিরোধিতা কবা শুরু করলেন। কারণ, ওব মধ্যে হিন্দুদের দেবীর নাম রয়েছে, রয়েছে 'প্রতিমা', 'মন্দিব' ইত্যাদি। অপৌত্তলিকদেব চোখে পৌত্তলিকতার জয়গান অপরাধের সামিল বলে গণ্য হওযাই স্বাভাবিক। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য কংগ্রেসকে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হতে হলো।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের 'ওয়ার্কিং কমিটি' এবং 'নিখিল ভারত কমিটি' এ বিষয়ে আলোচনা কবে 'বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদ কবে সমস্যা সমাধানেব জন্য তৎপর হলেন। জওহরলাল নেহেরু তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কবির মূল্যবান অভিমত প্রার্থনা করলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিখানি রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১) অথবা জগদীশ ভট্টাচার্য মশায়ের 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যাবে। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আদি পর্বে 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আহত না করে 'বন্দে মাতরম' গানের প্রথম দু'টি স্তবক জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে রাখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে অতঃপর যে কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম'-এর প্রথম দু'টি স্তবক গাওয়া হবে। তা' ছাড়া 'বন্দে মাতরম'-এর পরিবর্তে অন্য কোন অবিতর্কিত গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করার স্বাধীনতাও ওয়ার্কিং কমিটির থাকবে। এই জন্য একটি উপসমিতি গঠন করা হলো। সেই উপসমিতির সদস্য হলেন জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং নরেন্দ্র দেব। কথা রইল, উপসমিতি রবীন্দ্রনাথের অভিমত নিয়ে কাজ করবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি'র অধিবেশনেও গৃহীত হলো কিন্তু তাতেও মুসলিম লীগকে খুসি করা গেল না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লীগের পক্ষে যে এগারো দফা দাবি উত্থাপিত হলো তার প্রথম দফাতেই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত বর্জনের দাবি উচ্চারিত হলো।

'বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদের পর এবং রবীন্দ্রনাথের বন্দে মাতরম্ সম্পর্কিত চিঠিখানি প্রকাশিত হবার পর বাংলার স্বদেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। সে দীর্ঘ ইতিহাস এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। যাঁরা এ বিষয়ে কৌতূহলী, তাঁরা জগদীশ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক গবেষণা গ্রন্থ 'বন্দে মাতরম্' পড়ে দেখতে পারেন। এখানে সেই ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করে আলোচ্যমান প্রসঙ্গ শেষ করা হচ্ছে।

কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পত্রোক্ত বিষয়ে সমালোচনা করে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ তা' পড়ে বুদ্ধদেব বসুকে একখানি পত্র লেখেন। তাতে এক জায়গায় তিনি বলেন; "তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোন গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয়, কিন্তু মুসলমান, খ্রীষ্টান—এমন কি ব্রাহ্মও—শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও 'ত্বং হি দুর্গা', 'কমলা কমলদলবিহারিণী', বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবীনামধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাতিক গান মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি জোরালো, এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোন অর্থই নেই।"

অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মসমন্বয়ের ঋষিকল্প পুরুষ মহাত্মা গান্ধী চিরদিন 'বন্দে মাতরম্'-এর উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। তিনি কোনদিন

বন্দে মাতরম্-কে 'হিন্দু সঙ্গীত' বলে মনে করেন নি: 'It never occurred to me that it was a Hindu song or it was meant only for the Hindus'. অ-পৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও 'বন্দে মাতরম' -এর পৌত্তলিকতার গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারেন নি। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসী'র প্রসঙ্গ কথায় 'বন্দে মাতরম্' শীর্ষ নামে রামানন্দবাবু একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন। তা'থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁর মনোভাব ও যুক্তিধারার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হচ্ছে:

(১) "বহুদেববাদ হইতে উদ্ভূত শব্দ ব্যবহার মাত্রই পৌত্তলিকতা নহে। ইংরেজী Jovial, Son of Mars, Mammonite, Votary of Muses, Cupid's arrows ইত্যাদিও বহুদেববাদ প্রসূত। তাহা হইলেও এগুলির ব্যবহার হেতু ইংরেজদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলিবে না।...মুসলমান অনেক কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনা করায় কিংবা আধুনিক কোন কোন মুসলমান কবি 'প্রেম বৃন্দাবন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায় কেহ মুসলমানদিগকে পৌত্তলিক বলিলে ঠিক হইবে না। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে ও ব্রহ্মসঙ্গীত-এ শিব, শঙ্করী, শম্ভু, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। কতকগুলি কবিতা পড়িয়া 'শ্বেতভুজা ভারতী'কে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি পৌত্তলিক হইয়া যান নাই।"

(২) "গানটি যে মুসলমান বিদ্বেষপ্রসূত বা মুসলমান বিদ্বেষজনক নহে, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ...গানটি রচনার সময় বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার সহিত যুক্ত ছিল এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা তখন সাত কোটি ছিল। এইজন্য গানটিতে সপ্তকোটি কণ্ঠ এবং দ্বিসপ্তকোটি ভুজের উল্লেখ। পরে যখন গানটিকে সমগ্র ভারতের উপযোগী করিবার নিমিত্ত 'সপ্ত'কে 'ত্রিংশ' করা হয়, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি। সপ্ত কোটি এবং ত্রিংশ কোটি উভয়ের মধ্যেই মুসলমান আছেন। জাতি যে মুসলমানের বলেও বলীয়ান্, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।"

(৩) "মাতৃভূমিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ, চেতনা আরোপ, অহিন্দু অভারতীয় সভ্য জাতিরাও করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিয়াছে ও করে। ইহা পৌত্তলিকতা নহে। মাতৃভূমিকে নমস্কার করাও পৌত্তলিকতা নহে।"...

(৪) "কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্, সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত করিবেন জানি না। সকল পক্ষের সকল কথা শুনিয়া বিচার করিলে কাজটি সুবিবেচিত হইবে।"

কোন কবিতা ও গানের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার মর্মগত ভাবটির দিকেই, তাহার প্রাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কমিটি তাহা করেন নাই। তাঁহারা ইহার আক্ষরিক ও শাব্দিক অর্থের প্রতিই বেশী দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাহা ঠিক হয় নাই* ।......

এর দশ বছর পরে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এই অন্তর্বর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু দু'জনেই বন্দে মাতরম্-এর পরিবর্তে 'জনগণমনঅধিনায়ক' কে-ই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণের জন্য মন স্থির করে ফেলেছিলেন। 'প্রতিমা' বলতে যে শুধু দেবদেবী মূর্তিই বোঝায় না, 'মন্দির'-এর যে দেবালয় ছাড়াও ভিন্ন অর্থ আছে, একথা সম্ভবতঃ দু'জনের কেউ-ই ভেবে দেখেন নি। শব্দ দু'টিকে জনপ্রিয় অর্থে ধরে নিয়েই লীগপন্থীদের উষ্মা প্রশমনের জন্য তাঁরা ভিন্ন পথের সন্ধান করেছিলেন। জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে যোগ্য জাতীয় সঙ্গীত রচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সে সময় 'জনগণমন' গানটির কথা তাঁর মনে উদিত হয় নি। আর সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'র কণ্ঠে 'জনগণমন'র হিন্দী অনুবাদকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে অর্পণ করেছিলেন।

গণ পরিষদে যখন সংবিধান রচনা শুরু হলো, তখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে স্বভাবতঃই স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এ ব্যাপারে সমগ্র প্রাদেশিক সরকারের মতামত আহ্বান করলেন। উত্তরে অধিকাংশ প্রদেশই 'জনগণমন'কেই জাতীয় সঙ্গীত করবার জন্য অভিমত প্রকাশ করলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪-এ জানুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশন বসল। সেই অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতি দিয়ে বললেন: 'The composition consisting of the words and the music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations in the words as the Government may authorise as occasion arises; and the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. I hope this will satisfy the members.' সদস্যগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে বিনা আলোচনায় সভাপতির বিবৃতি গৃহীত হলো। খোদার পরে খোদকারি করবার

অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে 'জনগণমন' গণপরিষদে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হলো। অতীতের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতাবশতঃ 'বন্দে মাতরম্'-এর স্থান তার পরে নির্দিষ্ট করা হলো। তখন কিন্তু আত্মনিঃন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' পাকাপাকিভাবে বহাল হয়ে গেছে। Constituent Assembly Debates Repoıt (Vol XII, No. I, 24th June 1950) থেকে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বন্দে মাতরম্'-এ মন্তব্য করেছেন: 'কিন্তু যা' আলোচনা-সূচীতে স্থান পেয়েছিল, আলোচনা দ্বারা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা গণতন্ত্রসম্মত হয়নি। তা'ছাড়া তৎকালীন গণপরিষদের অভিমতই চিরকালীন ভারতের অভিমত নাও হতে পারে। সেই আশা মনে নিয়েই 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনেব স্মরণ উপলক্ষ্যে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করি।

পল্লীসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের দান

সুনীলকুমার দত্ত এম-এ

পল্লী উন্নয়নের দিকে আজকাল সকলের দৃষ্টি পড়েছে, জাতীয় পরিকল্পনাতে অবহেলিত গ্রামগুলির উন্নতির প্রয়োজনীয়তাব গুরুত্বটা দেশেব নেতারা নূতনভাবে অনুভব করছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বহুপূর্বে প্রাকস্বাধীনতার যুগেও এ সম্বন্ধে ভেবেছেন। তাঁর ভাবধাবা ও কল্পনাকে রূপায়িত কবতে চেয়েছিলেন শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ৪৪ বছব আগে রবিবাসরের সভ্যেরা যখন ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবিবাসরে যোগ দিতে যান তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে তুলে ধরেছিলেন কবি-রবীন্দ্রনাথকে নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথকে। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার কিছুটা তুলে ধরছি :—

"আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন, আপনাদের সহজে ছাড়ছিনে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান।...আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান কবেছি। তারপরে এই কাজ একার নয়। এই কাজ বহু লোককে নিয়ে......কিন্তু এই যে ব্রত, এই যে কর্মের অনুষ্ঠান.......তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়। অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

"এই যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি—এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভাব দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়?"

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীনিকেতনকে গড়েছিলেন ও তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু এতদিনেও তার পরিধি বিশেষ বাড়েনি এবং আজকের জাতীয় পরিসরে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা সে রকম স্বীকৃতি পায় না। এত বছর ধরে শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে (রবীন্দ্রনাথ এ কাজটা পুনর্গঠন বলে ভাবতেন, উন্নয়নের চাইতে), কিন্তু সমগ্র রাঢ় অঞ্চল

বাদ দিয়ে খালি বীরভূম জেলা বা বোলপুরের পাশাপেশি ক্ষেত্রে তার অবদান খুবই সীমিত রয়েছে। এই ব্যাপারে কয়েকমাস আগে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিলো—সে সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে বলবো।

গ্রাম সংগঠনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এত বেশী আধুনিক যে তাকে তাঁর সামগ্রিক যুগের মতামতের মধ্যে অনেকাংশে এক বৈপ্লবিক মনের নিদর্শন হিসাবে দেখা যায়—তখনকার সুধীসমাজে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কতটা গ্রহণীয় হয়েছিল তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। গ্রামীন পুনর্গঠনের বিষয় সম্বন্ধে একজন নামী চিন্তাবিদ শ্রী বি. ভেনকাটাপায়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন "In the ideas he propounded about village welfare, Tagore was more than half-a-century in advance of the rest of the country"। যে কয়েকটা ক্ষেত্রে কবির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় তা হলো :—

(১) পল্লীকে বাইরে থেকে উন্নত করবার চেষ্টা না করে পল্লীবাসীদের আপন শক্তির উপর নির্ভর করে পল্লীসংগঠনের কাজে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(২) জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ জমিদারের নয়, চাষীর, এবং

(৩) সমবায়নীতিতে চাষের ক্ষেত্র একত্র না করলে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ না করলে সামগ্রিক কৃষির উন্নতি হবে না —[illegible] ভাষায় "মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল দিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল ঢালা একই কথা।"

এ প্রসঙ্গে শ্রী বি. ভেনকাটাপায়া বলেছেন "when he founded Sriniketan in 1922, Tagore had in mind certain principles which combined the humanity of Science with the limitednees of practicality।" কবির দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী এক না হলেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে খুব উচ্চ মান দিতেন এবং গ্রাম সংগঠনের কাজে বিজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে পল্লী-পুনর্গঠনের কাজে আগে মানুষকে চাই, তারপরে বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্যের প্রয়োজন। তাঁর নিজের ভাষায় "The villagers are waiting for the living touch of creative faith and not for the cold aloofness of science।"

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে তাঁর গ্রামসংগঠনের কাজেরও মূলনীতি ছিল (১) ভিক্ষার

ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায় (২) জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয় এবং (৩) কর্মীরা মিথ্যা ভান ত্যাগ করে যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সমাজনীতির ক্ষেত্রে এই ত্রিধারার গুরুত্বটা কবির রচনাতে প্রকাশিত হয়েছিলো, পরে গ্রামসংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারায় এর পূর্ণ-বিকাশ ঘটে। কবি জানতেন যে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে একে রূপায়ণ করা খুবই দুরূহ—বস্তুতঃ চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে দাঁড় করানো খুব দুর্গম পথের যাত্রা।

বিদেশী শাসকের দ্বারা পদে পদে বাঁধা সৃষ্টি, জমিদার, জোতদার ও মহাজন সম্প্রদায়ের জোট বাঁধা, পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা—এই সকল বিবিধ অন্তরায়ের জন্য তিনি যে যজ্ঞ সুরু করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় তা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো এটা তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে এত বছরেও তাঁর আদর্শে-গঠিত শ্রীনিকেতন বিশেষ সফলতা দেখাতে পারল না। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ সিংহ তাঁর "রাঢ় পরিকল্পনা ও বিশ্বভারতী সমাজ" নামক পুস্তিকাতে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগে বাংলার সুধীজন ও ছাত্র সমাজের কাছে যে আবেদন করেছিলেন এতকাল পরেও তা বিশ্বভারতীতে কার্যতঃ কল্পনার পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে এবং সমস্ত রাঢ় অঞ্চলের জন্য শ্রীনিকেতনে কোনও সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অনুসরণ করা হয় নি, কারণ বিশ্বভারতীতে যে সব বিচ্ছিন্ন গবেষণা হয়েছে তা গভীর আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের সূত্রে এক সুসংহত ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রথমে উত্তর রাঢ় নিয়ে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের কাজ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা সুরু করবে—পরে দক্ষিণ রাঢ়কে নেওয়া হবে। সংগৃহীত তথ্য নিয়ে বিরাট তথ্যভাণ্ডার হবে এবং আগেকার সঞ্চিত তথ্যাদির সমন্বয়ে বহুমুখী গবেষণা হবে। এই গবেষণা দ্বারা যে জ্ঞান সমৃদ্ধি হবে তা নিয়ে সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের স্বয়ংক্রিয় পুনর্গঠনের চেষ্টাকে অনুধাবন করে নূতন কর্মসূচী নির্ধারণ করা হবে। আশা করা যায় যে এই পরিকল্পনায় নূতন পথ ও চিন্তার উদ্ভব হবে।

এই পুস্তিকা প্রকাশের পরে যে বির্তকের সৃষ্টি হয় কয়েক মাসের আগের দেশ পত্রিকাতে কিছু সংখ্যায় তা দেখা যায়। কবির স্নেহধন্য শান্তিদেব ঘোষ এ নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাতে ক্ষোভ, হতাশা এবং কিছুটা ব্যঙ্গ ও শ্লেষ প্রকাশ পেলেও, যুক্তির দিক থেকে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সঠিক।

তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল যে তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা ও আলোচনার দ্বারা গ্রাম বাসীদের দূরে রেখে কোনও গ্রামোন্নোয়নের কাজ হবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে চেয়েছিলেন গ্রামবাসীদের যুক্ত রেখে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সেভাবে কাজ করে শ্রীনিকেতনে প্রথম যুগে যথার্থই আশানুরূপ ফল পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে বুদ্ধিজীবীরা তাঁর নির্ধারিত পথ থেকে দূরে সরে আসায় উন্নয়নের কাজ আর এগোয়নি। শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই দুই গুণীর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নপ্রকারের হলেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকেরই ভাব-ধারার ও বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে। যেমন উন্নয়নের জন্য বহুপ্রকারের এবং ব্যাপক পরিধি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনি—এটাও সত্য যে খালি গবেষণার জন্য যতটা গভীর তথ্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ আবশ্যক, বাস্তব ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে ততটা না হলেও চলে। উদাহরণ হিসাবে বলছি যে অধুনা কেন্দ্রের শিল্পমন্ত্রী শ্রীচরণজিৎ চানানার অনুপ্রেণিত Habitat India পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কয়েকটা গ্রামের পুনর্গঠনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছিল এবং তার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল খুব সহজভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্য সুরজিৎবাবুও মেনে নিয়েছেন যে নিছক তথ্যসংগ্রহ করেই উন্নয়নের কাজ হবে না, নূতন কর্মপন্থারও প্রয়োজন। এই দুই গুণীজনই কিন্তু নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীনিকেতনের অসাফল্যের জন্য তার কর্মকতাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু দুজনেই উপেক্ষা করেছেন একটা বাস্তব সত্য যে কবির জীবদ্দশাতে তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন যে পল্লীউন্নয়নের বিরাট কাজ যা তিনি সামনে রেখেছিলেন তা আশানুরূপ হয়নি। সুপরিকল্পিতভাবে এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে যুগোপযোগী কর্মপন্থার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিকেতন ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করলে কবির আশা অবশ্য সফল হবে।

কিন্তু পল্লীসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের মূল্যায়ন করতে গেলে যদি খালি শ্রীনিকেতনের কথা ভাবা হয় তা হলে অস্বীকার করা হবে এই ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানকে। এটা প্রকটভাবে সত্য যে শ্রীনিকেতনের গৌরব ও অসাফল্য দুটোর মূলেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও আদর্শবাদ। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে আদর্শবাদ মিশেছিল সেটা কিন্তু সব সময়ে বাস্তবপন্থী ছিল না। যে সামাজিক পটভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের কাজ আরম্ভ করলেন তার প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না এবং তখনকার দিনে এতটা পরিকল্পনার গুরুত্বও ছিল না। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে আজ সুরজিৎবাবু যে সুপরিকল্পিত

কর্মসূচীর কথা ভেবেছেন, শ্রীনিকেতনের কর্মপন্থাতে গোড়া থেকে কোনও plan-এর শাসন ছিল না—কবির নিজের ভাষায় "কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না।" এটাও ঠিক যে পরে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হলেও সেরকম কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় নি—যার জন্য জাতীয় পরিকল্পনাতে শ্রীনিকেতনের কর্মোদ্যোগ যথোচিত স্বীকৃতি পায় নি। তবে এইসঙ্গে এটাও ঠিক যেটা কবি অনেক আগেই বুঝেছিলেন ও বলেছিলেন যে উপর থেকে চাপানো পরিকল্পনাতে গ্রামোন্নয়নের কাজ সফল হয় না। এই ধ্রুব সত্য আজ অনেকেই নূতন করে বুঝছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা সব গ্রামেই হবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে—উপর থেকে চাপানো হবে না। বীরভূম জেলাতে শ্রীনিকেতনের কাজ সীমাবদ্ধ দেখে অর্ধশতাব্দীর পরে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত কয়েকজন উৎসাহী লোককে নিয়ে Tagore Society-র মাধ্যমে স্বল্পক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করার পরে যখন C.A.D.P. গঠন করে বাইরে থেকে চাপানো পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলেন তখন সেরকম সাফল্য পাওয়া গেল না। তাই আজ রাজ্যসরকার C.A D.P.-র যে মূলনীতি ছিল আইন করে জমির একত্রীকরণ করা, গ্রামবাসীদের ভাবধারণা ও Social mileu-র বিপক্ষে বলে এটা পরোক্ষভাবে পরিবর্জন করেছেন এবং সেইসঙ্গে কবির যে মত ছিল "আসল কাজটা গাঁয়েই থাকবে, খালি গবেষণা করেই সে কাজ সুরু হবে না কারণ সেটাকে গ্রামবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় মনে করে না" সেটাকেই যেন মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ সব দেখলে কবির দৃষ্টিভঙ্গী খুবই আধুনিক ও বাস্তববাদী বলে মনে হয়। কিন্তু যে জমি একত্রীকরণের নীতি রাজ্যসরকার অন্ততঃ সাময়িকভাবে পরিহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এটা সুরু করবার কথা বারে বারে বলেছেন। আদর্শের দিক থেকে সমবায়নীতি দুর্বলদের সমষ্টি গড়ে তাদের শক্তিমান করা আপাতদৃষ্টিতে সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে হলেও এর সাফল্য নির্ভর করে গ্রামের নেতাদের চারিত্রিক সরলতা এবং সকলের উদারদৃষ্টিভঙ্গির উপরে। সেইরকম জমির একত্রীকরণ গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত হলে সফল হবে যখন এর ভেতরে পরস্পরের সাহায্যের একটা প্রয়াস থাকবে। ভারতবর্ষের খুব কম জায়গাতেই এই রকম পরিস্থিতি থাকায় সমবায়ের মাধ্যমে জমি একত্রীকরণ সেরকম বহুল সফলতা লাভ করেনি।

এটা যেরকম একটা আদর্শবাদের ক্ষেত্র—সেইরকমই ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের কর্মসূচীর—যেটা সমবায়নীতির উপর দাঁড় করানো। শ্রীনিকেতনের কর্মের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে এই কো-অপারেটিভ, যেটাকে কবি নীতিগতভাবে এবং আদর্শবাদী হিসাবে গ্রামসংগঠনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়ে বারে বারে হতাশ হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন—"আমি অনেক বার বলেছি—কবি বলে আমার কথা কেউ শোনে নাই—আমি বলেছি সমাজের ভেতর থেকে সমাজের শক্তি জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা শক্তি লাভ করবে।...এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন্ জায়গাতে আমাদের গলদ। গগনস্পর্শী পার্লিয়ামেন্ট হলে হবে না। আমাদের অভাব এখানে নয়। আমাদের অভাব ভিতরে যার উপরে গড়তে পারবো।"

আদর্শবাদী হিসাবে তিনি সমবায় সমিতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারাই গ্রামীন পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। যখনই হতাশ হয়েছেন দেখে যে বোলপুরের কো-অপারেটিভ সোসাইটি বিশ্বভারতীর হাতে এসেও কোনও উন্নতি হল না তখনই দোষ দিয়েছেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত লোকদের। আদর্শবাদের ধোঁয়ায় তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে আসল গলদটা—যেটা কো-অপারেটিভের কাঠামো, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও কর্মপরিধির মধ্যে সদাই বিদ্যমান। গ্রামের সব কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূতভাবে জড়িত না থাকায় কো-অপারেটিভগুলো প্রধানতঃ ঋণদানের কাজ দ্বারা উন্নয়নের কাজে কোনও চিহ্ন রাখতে পারে না এবং এদের স্থান ততটা গুরুত্ব পায় না। এছাড়া মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার বদলে কর্মকর্তারা স্বার্থ-প্রণোদিত হওয়ায়, যেসব রাজ্যে সমবায়সংস্থা খুবই শক্তিশালী বলে বিদিত, যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি, সেখানের সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনের মান ততটা উন্নত কিন্তু হয় নি। উভয়ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের চারিত্রিক দুর্বলতা বাদ দিলে, গ্রামসংগঠনের হাতিয়ার হিসাবে বরঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতগুলি বেশী উপযোগী কারণ এগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড় করানো এবং সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কার্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে হাতে নিলে হয়তো সুফল লাভ করা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শ পঞ্চায়েতের কথা ভেবেছিলেন এগুলি তা না হলেও, প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাবে এই পঞ্চায়েতগুলি উপযোগী ও কার্যকরী হবে যখন গ্রামবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থার জন্য এদের ঠিকভাবে কাজে লাগাবেন এবং এর জন্য যে জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করবেন সেটা ন্যায়ভাবে উন্নয়নের জন্য

ব্যবহার করবেন, ব্যক্তিস্বার্থের বা গোষ্ঠীস্বার্থের জন্য নয়।

যখন গ্রামবাসীরা বুঝবেন যে জমি একত্রীকরণ তাঁদের জীবনের মানের উন্নতির সহায়ক হবে তখন একাজ তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করবার কথা ভাববেন। যতদিন না পঞ্চায়েত বা সমবায় সংস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গ্রামবাসীদের কর্মপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করবে ততদিন তো কবির কথায় সেই ফুটো কলসীতে জল ঢেলে যেতে হবে।

খালি শ্রীনিকেতনের অসাফল্যের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের অবদানের কথা ভাবা যায় না। শ্রীনিকেতনে কাজ আজও অসমাপ্ত—সেরকম দৃষ্টান্ত এখন কিছু দিতে পারেনি। তথ্যসংগ্রহ ও ক্ষেত্র পরিকল্পনা এখনও ব্যাপক কর্মপন্থায় পরিণত হয়নি, কর্মের পরিধিও খুব সীমাবদ্ধ হয়েছে। হয়তো সামর্থ্য ছিল না, সকলের সৎপ্রয়াসও ছিল না। এসব দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা কল্পনাতেই রয়ে গেলো, বাস্তবে রূপায়ণ করা গেলো না। এখানে যেমনি কবির অসাফল্য, তেমনি তাঁর চিরনূতন ভাবধারা এইক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত অবদান। এই ভাবধারা কিন্তু নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়—সাফল্য পায়নি ঠিকই, কারণ সামাজিক কাঠামোর উপরে নির্ভর করে অনেক কর্মসূচীর সফলতা।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে অনেকেরই আদর্শবাদ বাস্তবে রূপায়ণ করা যায়নি—যেমন টলষ্টয়ের বা রোঁমা রোঁলার মানবতাবাদ বা মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীন কাঠামো বা শিল্পের অছিগিরির নীতি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শতাবাদ কিছুটা এ ধাঁচের হলেও বহুলাংশে বাস্তবমুখী ছিল। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা কিন্তু যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির হামারটিয়া (Hamartia) প্রভাবিত—বিরাট মহিমা বা উচ্চ মানসিকতার মধ্যেই রোপিত হয়েছে সেই বীজ যা মহান গরিমার সঙ্গে আনে অসাফল্য।

শ্রীভেনকাটাপায়ার একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি—"Tagore's dreams however remain largely unfulfilled. That is bound to be so. If his ideals were those of the practical reformer, his dreams were those of the poet and the humanist."

একটি বেআইনি ইনটারভিউ

জরাসন্ধ

সালটা বোধহয় ১৯৩১। শীতকাল, দার্জিলিং-এর শীত।

জেলের আফিস বসে সকাল বেলা। দুপুরে বিরাম। বিকেলে একটা সংক্ষিপ্ত দ্বিরাগমন থাকে। সেইটুকু কোন রকমে সেরে বেরিয়ে পড়ব, এই মনে করে তৈরী হয়ে এসেছি এবং দ্রুততালে কলম চালাবার চেষ্টা করছি। তাব কি জো আছে? হাতে ডবল-নিটিং ভুটিয়া উলেব দস্তানা। দুটো আঙুলের ডগাটুকু শুধু বেরিয়ে আছে; কলম ধরবার জন্যে সেখানটা অসাড় হয়ে আসছে। চেয়াবের পাশে রাখা তোলা-উনুনে কাঠকয়লা পুড়ছে। মাঝে মাঝে হাতটা সেঁকে নিচ্ছি।

গুর্খা গেটকীপার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। টেবিলের এপারে 'অ্যাটেনশন' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বুটে বুট ঠুকে সেলাম জানাল।

মনে মনে বিরক্ত হলাম। কি খবর নিয়ে এল কে জানে? একটা-না-একটা ঝামেলা তো লেগেই আছে। বেরোনাটা বন্ধ না-হয়।

গেটকীপার হিন্দী মেশানো নেপালী ভাষায় জানাল, 'একজন জেনানা আদমী' আমার দর্শন প্রার্থী।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকাতে যোগ করল, 'আমি বলেছিলাম, 'সাব' এখনই বেরোবেন। তিনি 'স্রেফ' পাঁচ মিনিটের জন্য আসতে চান।'

'আচ্ছা, নিয়ে এসো।'

ঘরে ঢুকলেন একটি প্রৌঢ়া মহিলা! দীর্ঘাঙ্গী; দোহারা গড়ন। গায়ের রং থেকে মনে হবে মেমসাহেব। কিন্তু পরনে মোটা খদ্দরের শাড়ি, তারই পুরোহাতা ব্লাউজ। শালটাও তাই। মৃদু হেসে 'গুড আফটারনুন' জানালেন। আমি সামান্য একটু উঠে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

তিনি নিখুঁত সাহেবী উচ্চারণে ইংরেজীতে বললেন 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি। তবু না এসে থাকতে পারলাম না। শুনলাম

মিস্টার সতীন সেনকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। তিনি কেমন আছেন জানতে এলাম। দয়া করে যদি—'

বলতে বলতে খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর। চোখে ও গলার স্বরে উদ্বেগ!

আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম 'আপনি কি তাঁর কোন আত্মীয়া?'

'আত্মীয় বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নই। তাঁর অসংখ্য দেশবাসীর মত আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, একান্ত প্রিয়জন বলে মনে করি। স্বভাবতই তাঁর জন্যে আমাদের উৎকণ্ঠা রয়েছে। তার ওপরে এখানে যে-সব ঘটনা ঘটেছে—'

'কোন্ ঘটনার কথা বলছেন আপনি?

'শুনেছি ঐ জেলে থাকতে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। আঘাত কি খুব বেশী? চলাফেরা করতে পারছেন? আশা করি এ খবরটুকু জানাতে আপনার কোনো বাধা নেই।'

আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাত্র কয়েকদিন আগে সিভিল ডিস-ওবিডিয়েন্স আন্দোলনে বন্দী এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে দল থেকে আলাদা অর্থাৎ সরকারি ভাষায় Segregate করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এই দূর দুর্গম পাহাড়ী জেলে চালান দেওয়া হয়েছে। কোলকাতার মত শহরে অনেক চেষ্টা করেও বাইরের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ বন্ধ করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। এখানে তার সম্ভাবনা নেই, অথবা সুদূর, এ আশাও করে থাকবেন। সেটা যে সফল হয়নি তার প্রমাণ তো আমার সামনেই বসে আছেন।

এই খদ্দরধারিণী মেমসাহেবটি এই রকম একজন রাজনৈতিক বন্দীর চলা-ফেরার খবরই শুধু পাননি, মারধরের ব্যাপারটাও জেনে বসে আছেন।

সতীন সেনের কাছে মারধরটা অবশ্য জলভাত। সেই পটুয়াখালি আন্দোলনের সময় থেকে পুলিসের লাঠি এবং জেলের ব্যাটনের বহু ব্যবহার চলেছে তার উপর, বাগ মানাতে বা কাবু করতে পারেনি। ওটা বোধ হয় ওর কোষ্ঠিতে লেখে না। এবারকার ডোজটা শুনেছি আগেরগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

স্বভাবতই সঙ্গী-সাথীদের ছেড়ে নির্বাসনে আসতে চাননি ভদ্রলোক, সতীন সেন একবার 'না' বললে তাকে 'হাঁ' করানো সরকারের পক্ষে সভ্য উপায়ে সম্ভব নয়। তাই ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার নামক দুটি ফিরিঙ্গি পুঙ্গব এই বেয়াড়া

কয়েদীটিকে হাতকড়া লাগিয়ে পিছন থেকে বুটের ঠোক্কর মারতে মারতে সেল থেকে গেট পর্যন্ত এনে পুলিসের কালো গাড়িতে পুরে দিয়েছিল। সেখান থেকে শিয়ালদা স্টেশনে রিজার্ভ করা রেলের কামরা। সারা পথে পুলিসের ব্যারিকেড। কাকপক্ষীরও জানবার কথা নয়, অথচ ইনি জেনে গেছেন!

'মেমসাহেবে'র আগ্রহ-দীপ্ত চোখ দুটির দিকে চেয়ে কিছুটা সত্য গোপন করতে হল। তখনো সেরে ওঠেননি ভদ্রলোক। সংক্ষেপে জানালাম, 'তিনি ভালো আছেন।'

'একবার দেখা করতে পারি?'—সঙ্গে সঙ্গে অনুনয় প্রার্থনা।

'দেখা করতে হলে আপনাকে এস. পি.-র কাছে দরখাস্ত করতে হবে।'

'হোয়াই? হি ইজ ইন জেল কাস্টডি। ইউ ক্যান গ্রাণ্ট দ্য ইণ্টারভিউ। এখন যদি সম্ভব না হয়, আপনি যখন বলবেন আমি আসবো। পিটিশন আমি নিয়ে এসেছি।'

ব্যাগ খুলে একখণ্ড টাইপ করা কাগজ আমার সামনে রাখলেন।

আমি কেমন করে বোঝাই যে সতীন সেনের বেলায় আমাদের ক্ষমতার দৌড় ঐ 'কাস্টডি' পর্যন্ত শুধু আটকে রাখা। বাকী সব পুলিসের হাতে। তবু বলতে হল, 'আমরা এ বিষয়ে নিরুপায়।'

পিটিশনের উপর চোখ বুলিয়ে যোগ করলাম, 'চান তো আমরা এটা ফরোয়ার্ড করতে পারি। ফল কি হবে বলতে পারি না। তার চেয়ে এস. পি কিম্বা ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো সহজে কাজ হবে। আপনার বেলায় বোধহয় ওরা আপত্তি করবেন না।

'যেহেতু আমার নাম দেখছেন মিসেস ব্লেয়ার এবং আপনার সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলছি?' বলে একটু হাসলেন। 'হি ওয়াজ ইন দ্য আরমি।' ছেলেবেলা থেকে ঐ দেশেই আমি মানুষ। এখানকার ইংরেজ ডি. সি. এবং এস. পি.-র সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট জানাশোনা আছে। কিন্তু আমি এ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতে চাই না। আপনারা যখন পারবেন না বলছেন তখন আর কি করা যায়। আচ্ছা চলি। ধন্যবাদ।

দিন দুই পরে বেলা দুটা নাগাদ বাজারের দিকে উঠছিলাম। চাঁদমারির ভিতর দিয়ে খানিকটা গিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা সিঁড়ি বাঁধানো সর্টকাট্ ধরতে যাচ্ছি পাশের বস্তি থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ব্লেয়ার। হাতে একটা বেশ বড় আকারের কাপড়ের ব্যাগ।

'হ্যালো, মিস্টার 'চৌধুরি', এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন এবং আমি উত্তর দেবার আগেই বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। সেদিন কম আলোতে ঠিক বুঝতে পারিনি। সবে চাকরিতে ঢুকেছ বোধহয়?'

তাঁর অনুমান ঠিক। কিন্তু উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনি এই দিকে থাকেন নাকি?'

'না, আমি থাকি অনেক দূরে। জলাপাহাড়। এই বস্তিতে মাঝে মাঝে আসতে হয়।'

কাছে এসে স্বর নামালেন, 'উনি কেমন আছেন?'

'আগের চেয়ে অনেকটা ভালো।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার কাছ থেকে খবর নিয়ে আসবো। আচ্ছা দু-একখানা বই যদি দিই, নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবে না। পলিটিক্স-টলিটিক্স নয়, হার্মলেস বুক্স্!'

জেলখানায় বই পড়তে পাওয়ার প্রথম সর্ত হচ্ছে গুড কণ্ডাক্ট্। সতীন সেন প্রেসিডেন্সি থেকেই বেশ গোটাকয়েক শাস্তি নিয়ে এসেছেন। সরকারি মতে তাঁর কণ্ডাক্ট্ ব্যাড এবং বই তাঁর কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু মিসেস ব্লেয়ারের দিকে চেয়ে কথাটা বলতে বাধল। বললাম, 'বেশতো, দেবেন।'

ব্যাগটা নিয়ে চড়াইপথে উঠতে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে বললাম, 'ওটা আমার কাছে দিন।'

'না, না; তুমি কেন নেবে? এ আমার অভ্যাস আছে। যা ভাবছ তা নয়। এতে ভারী কিছু নেই। গোটাকয়েক জাম্পার। উল আমরা দিই, বস্তির পাহাড়ী মেয়েরা বোনে। সামান্য কিছু পায়। বড্ড গরিব তো। কাল তোমাদের পাড়ায় যাবো।'

'আমাদের পাড়া মানে?'

'মানে তোমাদের কাছাকাছি। চাঁদমারি। কয়েকটি বাঙালী পরিবার আছে। চরকায় সূতা কাটে। ফাইন সুতো, সেগুলো নিয়ে আসবো; নতুন কিছু তুলোও দিয়ে আসতে হবে।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তাদের অবস্থা অবিশ্যি এদের মত এতটা খারাপ নয়। বাবুরা চাকরি-বাকরি করে। তবে তেমন কিছু তো নয়। মেয়েরা কিছু বাড়তি রোজগার না করলে চলে না।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করবেন না?'

'না, না; মনে করবো কেন? বল না, কি জানতে চাও?'

'ওঁদের সঙ্গেও কি আপনি ইংরাজিতে কথা বলেন?'

'যারা বোঝেনা, তাদের সঙ্গে বাংলা বলি। তবে সে এমন বাংলা, শুনলে তুমি হাসবে। কী করবো বল। আমারই দুর্ভাগ্য। মাতৃভাষাটাও শেখবার সুযোগ পাইনি।'

'মাতৃভাষা! আপনি কি বাঙ্গালী?'

মিসেস ব্লেয়ার হেসে উঠলেন—'তুমি ভেবেছিলে বুঝি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান? আমার বাবা-মা দুজনেই বাঙালী।'

পরদিনই এলেন আমার কোয়ার্টার্সে। জেলের খানিকটা উপরে। হাতে তেমনি খদ্দরের ব্যাগ। তবে আকারে ছোট।

তার ভিতর থেকে বের করলেন কাগজে জড়ানো কয়েকটা ফুলের চারা, একটা টিফিন-বক্স আকারের কৌটো আর একখানা 'বুক অব নলেজ।' বললেন, 'এগুলো ডায়াস্থাস। সেদিন তোমার বাগান দেখে গেছি। তোমার 'কেটার' সঙ্গে আলাপ হল। বলল, 'সাব' নিজে হাতে সব করেন। খুব ভালো লাগল। আমারও বড্ড বাগানের সখ। বড় একটা সময় পাই না। এগুলো দেয়ালের ধারে দিও। নাইস ব্যাক্-গ্রাউণ্ড হবে। বইটা সেনকে দিও। এর মধ্যে কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচ আছে। তুমি চিকেন খাও তো?'

'তা খাই। কিন্তু আমার জন্যে আবার কষ্ট করে—'

'কষ্ট কিসের? নিজেদের জন্যে তো করতে হয়। তারই সামান্য ভাগ দিচ্ছি তোমাকে। একা একা বিদেশে পড়ে আছ।·· ····তোমার মা আছেন?'

'আছেন।'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বুটের শব্দে দুজনেই দরজার দিকে তাকালাম। একজন সিপাই জানিয়ে গেল, 'টেলিফুক আয়া হুজুর।'

'তার মানে তোমাকে অফিসে যেতে হবে। আমিও উঠি। বইটা পড়া হয়ে গেলে তোমার কাছে এনে রেখো। পরে যেদিন আসবো ওটা বদলে অন্য বই দিয়ে যাবো।'

বলা হল না, বই আর আনবেন না, এটাও আমার কাছে থেকে যাবে, যাঁকে দিতে চাইছেন তাঁর হাতে পৌঁছাবে না। সেদিন নেহাৎ দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছিলাম।

এটাও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাত সরল না। হয়তো আমার অসহায় অবস্থা বুঝে কিছু বলবেন না, কিন্তু ভীষণ নিরাশ হবেন। নিজেও বড় খেলো হয়ে যাবো ওঁর কাছে।

ঠিক পথে, যাকে বলে through proper channel, দিতে গেলে আমাদের বড়কর্তা অর্থাৎ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি দরকার। বই-এর উপর রবার স্ট্যাম্পের ছাপ পড়বে—Passed, তার নীচে তাঁর সই। সেটা তিনি কখনো দেবেন না। ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। ব্যাপারটা তাঁর বিবেচনা বা discretion-এর এলাকা। কিন্তু তাঁকে তো চিনি। অতি বশংবদ সরকারি কর্মচারী। সরকারের শত্রুকে নিজের শত্রু বলে মনে করেন। অতএব ?

অতএব গোপন পথ অর্থাৎ improper channel-এর আশ্রয় নিতে হল।

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। সোজাসুজি smuggling, বে-আইনী পাচার। আমার কাজ সেটা বন্ধ করা। আর আমি নিজেই তাই করে বসলাম।

কিন্তু করবার পর, অর্থাৎ বইখানা যখন সতীনবাবুর হাতে পৌঁছে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও যেন বেশ হালকা হয়ে গেল। যা করলাম আইন-বিরোধী হতে পারে কিন্তু ন্যায়-বিরোধী নয়। যখন দেখা হ'ল সতীনবাবু জানতে চাইলেন, কোত্থেকে এই লোভনীয় বস্তুটি পেলাম। বললাম। শুনেই ওঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীব শ্রদ্ধাভরে বইখানা কপালে ঠেকালেন। আমার চোখে একটু বিস্ময় লাগল। কদিন থেকেই তো দেখছি ওঁকে। বুদ্ধিদীপ্ত সুরসিক মানুষ। বাস্তববাদী, কথাবার্তায় matter-of-fact, উচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ নেই। এই মহিলাটি এবং তাঁর দেওয়া একখানা সামান্য বইকে ঘিরে সতীন সেনের এই আকস্মিক ভাবাবেগ একটু আশ্চর্য বৈকি ?

কারণটা পরে বুঝেছিলাম।

দিন তিনেক পরে সকালে অফিসে রয়েছি। ফোন এল।

মিসেস ব্লেয়ারের গলা—'দুটো নাগাদ বাড়ি থেকো। আমি আসছি।'

তৈরী হয়েই ছিলাম। ঘরে ঢোকামাত্র বললাম, 'চলুন।'

'কোথায় ?' বিস্মিত হলেন। হবারই কথা।

বললাম, 'আসুন না'।

আফিসে নিয়ে গিয়ে বসালাম। আর কেউ নেই সেখানে। উনি আগের সুরেই জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কী বল তো ?'

আমি শুধু একটু হাসলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যে একজন হেড-ওযার্ডারের সঙ্গে ঘরে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে সুপুরুষ বলা চলে। দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন। পরনে জেলের পোষাক—ব্লু সার্জের গলাবন্ধ কোট এবং সেই একই কাপড়ের ট্রাউজার্স। পায়ে স্লিপার।

মিসেস ব্লেয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আপনাকে দেখতে পাব, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি।'

আমার দিকে ফিরে কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'you naughty boy, you didn't tell me anything !'

সতীনবাবু বাংলাতেই বললেন, 'আপনার বইখানা যে আমাকে কত আনন্দ দিয়েছে, বোঝাতে পারবো না।'

'ও কিছু না। আপনার শরীর বেশ সুস্থ তো?'

'হ্যাঁ, এখানে আমি খুব ভালো আছি।'

সতীনবাবুকে আগেই বলে রেখেছিলাম, মিনিট পাঁচকের মধ্যেই ইণ্টারভিউটা সেরে ফেলতে হবে। আমাকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেই উঠে পড়লেন। এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে হাতটা পায়ে ছোঁয়াতেই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন মিসেস ব্লেয়ার, 'এ কী করছ?'

'আপনার পরিচয় আমি জানি। আপনি আমাদের সকলের নমস্য।'

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে দাঁড়ালেন সতীনবাবু, 'হ্যাঁ, একটা কথা। আমাদের দেখা হল, এটা যদি প্রকাশ পায়, আমাকে যে শাস্তি পেতে হবে তার জন্যে পরোয়া করি না, কিন্তু আমার এই বন্ধুর পক্ষে সেটা বিপজ্জনক। উনি তো চাকরি করেন।'

মিসেস ব্লেয়ার বললেন, 'সে কথাও কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে? কিন্তু জেলের গার্ডস যারা জানল—

'তারা কিছু বলবে না। তারা আমাকে ভালবাসে।'

মিসেস ব্লেয়ারকে বিদায় দিয়ে সোজা চলে গেলাম সতীনবাবুর সেলে-এ।—'কে বলুন তো?'

'ডবলিউ সি ব্যানার্জির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট।'

বললাম, 'তা শুনেছি বৈ কি।'

'ইনি তাঁর মেয়ে।'

আশাপূর্ণা দেবীর গৃহে রবিবাসরে লেখক কর্তৃক পঠিত।

রবিবাসরে বনফুল জন্মদিন

(আনন্দবাজার পত্রিকা—২৩ জুলাই ১৯৮০)

গত ৪ঠা শ্রাবণ সকাল ৯টায় বনফুলের জন্মদিনে লেক টাউন বনফুলের বাসভবনে কবি কৃষ্ণ মিত্রের আহ্বানে রবিবাসরের ৫১ বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বনফুলের জন্মোৎসব পালিত হয়। সুসজ্জিত মঞ্চে বনফুলের প্রতিকৃতিতে রবিবাসর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষে মালাদান করা হয়। বনফুলের নিজ কণ্ঠের আবৃত্তি—কবিতা ও ছোট গল্প পাঠের টেপ বাজিয়ে সভার উদ্বোধন করা হয়। স্বরচিত কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, বেলা দেবী, কৃষ্ণ মিত্র, অখিল নিয়োগী, অনিল ভট্টাচার্য, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, ডঃ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ও রমেন মল্লিক। সম্পাদক সন্তোষকুমার দে রবিবাসরের সঙ্গে বনফুলের নিবিড় সম্পর্কের কথা বিস্তারিত ভাবে বলেন। তিনি জানান, এই দিন বিকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বনফুলের চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং বনফুলের "স্মারক বক্তৃতা" শুরু হবে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও "বনফুল স্মারক বক্তৃতার" ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে। এদিন তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধে বনফুলের উপন্যাস সম্পর্কে বলেন সুনীলকুমার দত্ত, ছোট গল্প সম্বন্ধে বলেন অজিতকৃষ্ণ বসু (অকুব) আর পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে বনফুলের মধুর সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন হিমানীশ গোস্বামী*। যুগল সেনও স্মৃতিচরণ করেন।

সভা শেষে বনফুল-অঙ্কিত চিত্রের একটি সুন্দর প্রদর্শনী সকলকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সভায় বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

* হিমানীশ গোস্বামীর প্রবন্ধটি এই সঙ্গে ছাপা হল। সুনীলকুমার দত্ত এবং অকুব-র প্রবন্ধদ্বয় পরবর্তী খণ্ডে ছাপা হবে।

'বনফুল'-স্মারক বক্তৃতামালা

বাঙালীর হৃদয়ে বনফুলের পুণ্যস্মৃতি চিরদিন জাগ্রত থাকবে। তাঁর রচিত বিপুল পরিমাণের সাহিত্যে যে অজস্র বৈচিত্র্য আছে তাই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

তবু আমাদের মন মানতে চায় না। আমরা চাই যে-লেক টাউনে তিনি জীবনের শেষ অংশে বসবাস করেছেন সেই লেক টাউনের নামকরণ করা হোক 'বনফুল-নগর'। অন্ততপক্ষে তাঁর বাসগৃহটির সংলগ্ন রাস্তাটিতে যাওয়ার প্রধান সড়ক, যা ভি. আই. পি. রোড ও যশোর রোডকে সংযুক্ত করেছে, সেই লিংক রোডটির নামকরণ হোক 'বনফুল সরণি' এবং যে ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কটির দুইপাশ ঘিরে লিংক রোড ভি. আই. পি. রোডে গিয়ে যুক্ত হয়েছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হোক বনফুলের একটি মর্মর মূর্তি। লেক টাউনে বা অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হোক একটি 'বনফুল ভবন'—যেখানে বনফুলের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থের সকল সংস্করণ, বনফুলকে প্রদত্ত বিবিধ মানপত্র, বনফুলকে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত উপহারসমূহ এবং বনফুলের ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রভৃতি সুরক্ষিত হবে, পরিচালিত হবে একটি 'বনফুল সমিতি' যেখানে বনফুলের সাহিত্য নিয়ে পঠন পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে—তার জন্য সম্ভব হলে বনফুলের নিজস্ব বিরাট গ্রন্থাগারটিও ওখানেই সংরক্ষিত হতে পারবে।

দেশবাসীর আগ্রহে এবং আমাদের জাতীয় সরকারের পূর্ণ সমর্থনে এই সব কাজ ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। রবিবাসরের সীমিত সামর্থ্যে আমরা বনফুলের স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট আবেদন করি। সুখের বিষয় বনফুলের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এগারো হাজার টাকা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ছয় হাজার ছয়শত টাকা—একুনে সতের হাজার ছয়শত টাকা জমা দিয়ে দুটি এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড গঠন করেছি। ঐ টাকায় ব্যাঙ্কে দুটি স্থায়ী আমানতে প্রতি বৎসর যে সুদ পাওয়া যাবে তার দ্বারা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরে তিনটি বক্তৃতা

এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে প্রতি বৎসব দুটি বক্তৃতা উপযুক্ত বক্তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এই বক্তৃতা ১৩৮৭ সাল থেকেই সুরু হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবৎসর বক্তৃতা বনফুলের জন্মদিন ৪ঠা শ্রাবণ আরম্ভ হয়। বক্তা—ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচায, এম. এ. কাব্য কোবিদ, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়। তিনি দুদিনে দুটি বক্তৃতা দেন।

৪টা শ্রাবণের বক্তৃতার বিষয় ছিল—'কবি বনফুল'।

১১ই শ্রাবণের বক্তৃতাব বিষয় ছিল—'নাট্যকার বনফুল'।

ডক্টব ভট্টাচার্য বনফুল সম্পর্কে একখানি গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন কবেছেন—এই বক্তৃতাদ্বয় তাবই অংশ বিশেষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে এবৎসবেই বনফুলের একখানি বহুবর্ণ তৈলচিত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৩৮৭ সাল থেকেই এই বনফুল স্মারক বক্তৃতামালা প্রবর্তিত হওয়ার প্রস্তাব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েব কাউনসিলে অনুমোদিত হয়েছে। এই সংবাদ লেখাব সময় (১ ভাদ্র, ১৩৮৭) পযন্ত বক্তৃতাব বিষয়, বক্তাব নাম ও বক্তৃতাব তাবিখ ঘোষিত হয়নি বটে, তবে এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই এ বৎসবের বনফুল স্মাবক বক্তৃতামালা রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবর্তিত হবে।

—সন্তোষকুমার দে

বাবা ও বলাইকাকা

হিমানীশ গোস্বামী

আমার বাবা পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে বলাই কাকার সম্পর্ক ছিল অসাধারণ। তার সবটা বলার ক্ষমতা আমার নেই। তার পরিচয় আমার পক্ষে আংশিক দেওয়াও অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমি যদিও ছোটবেলা থেকেই দু'জনের বন্ধুত্বের সঙ্গে পরিচিত, তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যেকার সত্যিকারের সম্পর্ক আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, আমার মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে কৌতূহল কিছু থাকলেও তা অদম্য ছিল না। বাবার স্মৃতিশক্তি ছিল ভাল। তা ছাড়া, তিনি ডায়েরিতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি লিখে রাখতেন। আমার স্মৃতিশক্তিও ভাল না, আমার ডায়েরি রাখারও তেমন উৎসাহ হয়নি। ফলে কোনো কিছুতেই আমি জুতসই প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি না। বাবার আর একটা গুণ ছিল, তিনি তাঁর কাছে পাঠানো বহু চিঠি সযত্নে রক্ষা করতেন। একটা টুকরোও এদিক ওদিক করতে দিতেন না। আরও একটা গুণ ছিল, তা হল জেদ। তিনি তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন, এবং অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও তা পেরেও ছিলেন। সেগুলির মধ্যে এবং চিঠিপত্রগুলির মধ্যে একবার চোখ বুলোলেই অবশ্য আমাদের আর দুঃখ থাকে না। বাবার সঙ্গে বলাইকাকার সম্পর্কের অনেকখানিই তা থেকে বেরিয়ে আসে। আমিও তার বাইরে যাব না। তার বাইরে আমার লেখার তেমন সাধ্যও নেই। তবে আজকের আলোচনা, তাঁদের সাহিত্যজীবন নিয়ে নয়, তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে।

বাবা বলাইকাকাকে দেখে, পরিচিত হয়ে, মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। অদ্ভুত চরিত্রের উপর বাবার আকর্ষণ ছিল খুব। বোধ হয় ছোটবেলায় এমন একটা আশ্চর্য মানুষ চোখের সামনে তিনি দেখতে পাবেন তা ভাবতেও পারেননি। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা বাবার লেখায় পাই; "শীতকাল, মনে আছে। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাস। বোর্ডিং হাউস থেকে আমার চলে আসার সময় মনিহারী ঘাট থেকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মাইনর পাস করে সাহেবগঞ্জে এসে ভর্তি হল, এবং ঐ বোর্ডিং হাউসে এসে উঠল। হয়ত

একদিনের পরিচয় ঘটেছিল সে সময়। বলাইচাঁদের কবিতার খাতায় নাম ছিল 'বনফুল'। ....তখন আমরা কেউ জানি না পরবর্তী জীবনে আমরা পরস্পর এত কাছে এসে পড়ব।"

পরবর্তীকাল, অর্থাৎ পরবর্তী আরও ৬২ বছর (বাবার ১৯৭৬-এ মৃত্যু পর্যন্ত) বাবা এবং বনফুলের মধ্যে সম্পর্ক বরাবর বজায় ছিল। এই প্রসঙ্গে বাবা এবং বলাইচাঁদের মধ্যে পরিচয়ের একটি সেতু হিসেবে উল্লেখ করছি আমাদের গ্রামের প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাহেবগঞ্জে বাস করতেন, রেলের চাকুরী করতেন। বলাইচাঁদের ভাই ভোলানাথের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। সেই সূত্রেও বাবার সঙ্গে বলাইচাঁদের ঘনিষ্ঠতাব একটা সুযোগ হয়েছিল।

এরপর বাবা তাঁর স্মৃতিচিত্রণে কলকাতার জীবন প্রসঙ্গে বলাইকাকা সম্পর্কে লিখেছেন: "এই কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। পরিচয় আগেই ছিল, কিন্তু এবারে গলায় গলায় ভাব হল। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল আইন অমান্য করে চলার দিক দিয়ে আমাদের দুজনের চরিত্রে অনেকখানি মিল ছিল। দুজনেই অনিয়মিত এবং এলোমেলো। বলাই এ বিষয়ে আমার চেয়ে কয়েক ডিগরী বেশি।"

তারপর বলাইকাকা সম্পর্কে বাবার লেখা একটি আশ্চর্য ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি। বাবা লিখছেন, "শিবের জ্বর হয় একবার, জ্বরের পর অন্ন পথ্য দরকার। বলাই সম্ভবত শিবকে ওষুধ দিয়েছিল, অতএব বলাই-এর খেয়াল হল মেসের ভাত তো ভাল নয়, ভাল ভাত কারো বাড়ি থেকে ভিক্ষে করে আনা যায় না? বলাই তৎক্ষণাৎ মেস থেকে একখানা থালা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভাত ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। ...বলাই এক অপরিচিতের বাড়িতে ঢুকে সোজা গিয়ে বলল, 'এক বন্ধু আজ অন্ন পথ্য করবে, মেসের ভাত অখাদ্য, তাই ভাল ভাত ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি, সম্ভব হলে এই থালায় কিছু ভাল ভাত দিন।' একেবারে সোজা কথায় সোজা প্রস্তাব, প্রস্তাবে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দীনতা নেই।"

ঐ সময়ে বাবার বর্ণনায় দেখা যায় বলাইকাকার ওরিজিন্যালিটির আর একটি দৃষ্টান্ত। তাঁদের বন্ধুর বিয়েতে বলাইকাকা উপহার দিয়েছিলেন এক বোতল কড লিভার তেল।

১৯২৯-৩৬ সালে বলাইকাকা কেমন ছিলেন? বাবার বর্ণনায় পাই—

"...সে তার গুরু ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া হক, গ্রাহ্য নেই। মাটিতে বসে পড়ত যেখানে সেখানে। চুলে চিরুনি পড়ত না আদৌ। ধুলো পায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ত। দাড়ি গজাচ্ছে মুখে, ভ্রূক্ষেপ নেই।"

এই সময়ে বাবা বলাই কাকার চরিত্রের একটি আশ্চর্য দিক দেখিয়েছেন। সেটা কেবল মজা নয়। রাস্তায় এক দাড়িওলা ব্যক্তিকে দেখে বলাই কাকার মনে হল লোকটির কুষ্ঠ হয়েছে। বলাই কাকা তাকে সোজাসুজি বললেন, অবিলম্বে পরীক্ষা করান। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল ব্যাপারটি কুষ্ঠ নয়, তবে রোগ হিসেবে তাও সেকালে মন্দ ছিলনা। যৌন রোগ। বলাই কাকা সেই অপরিচিত ব্যক্তির চিকিৎসা করেছিলেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এরকম ডাক্তারের কথা আমাদের দেশে আজকের দিনে ভাবা যায়?

১৯২৮ সালের বলাইকাকাকে কেমন দেখেছিলেন বাবা? সেটিও চমৎকার। "হ্যারিসন রোড ধরে চলতে চলতে সেদিন সেই রাত্রি এগারোটায় বলাইএর মাথায় কিছু পাগলামি জাগল। তার পায়ে সদ্য কেনা এক জোড়া উৎকৃষ্ট জুতো ছিল, চট করে জুতো জোড়া খুলে ফেলে একটা দোকানের দরজায় খাড়া করে রাখল এবং বলল দেখা যাক চুরি যায় কিনা।"

হ্যা, আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন। পরদিন সকালে সে জুতো জোড়া অন্তর্হিত হয়েছিল। এটা অবশ্য হবেই জানা ছিল। কিন্তু বলাইকাকা বোধ হয় ভাবতেন কোনো এক মিরাকল-এর কথা।

বলাই কাকার জীবনের মোড় ঘোরানো সম্পর্কে বাবা একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

বলাইয়ের জীবনের মোড় ঘোরাব অব্যবহিত কারণ আমার ল্যারিনজাইটিস।

"শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের তিন মাস পরে ভাগলপুরে যাই স্বাস্থ্যের জন্য এবং বলাইকে সাহিত্য পথে পুনঃ প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করতে। বলাই তখন প্রায় আট বছর হাইবারনেট করছিল ডাক্তারি শাস্ত্রে ডুবে। এতদিন তার লেখা প্রায় বিয়ের প্রীতি উপহার লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলাইকে নতুন করে লেখানোর ব্যাপারে আমাকে যে সব প্রক্রিয়া করতে হয়েছিল তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই, তবে আমাকে খুব যত্ন নিতে হয়েছিল। ক্ষমতা আত্ম প্রকাশে ব্যাকুল, অথচ অনাভ্যাসে ঠিকমতো প্রকাশ হচ্ছে না, এ অবস্থা অবশ্য বলাইয়ের খুব বেশি দিন ছিল না। ফুল আপন প্রাণধর্মেই ফুটেছিল, আমি শুধু সতর্ক

দালালীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম কিছুদিন। বলাইয়ের পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল।...২২-১১-৩৫ তারিখ সে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে বলছে "তুমি পাটনায় গেলে দেখিতে পাইতে যে তোমার হাতে-গড়া বনফুল কত লোকের মনোহরণ করিয়াছে। গড়িয়াছ বলিয়া গর্ব করিতেছি। চুম্বন লও।"

বাবা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। এবং চিঠিপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে দেখছি বলাইকাকাও বেশ অসুস্থ হতেন। তবে বাবা অসুখ হলেই হৈ চৈ করতেন বেশি। আমরা ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছে শুনতাম বাবা আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যাবেন। প্রায়ই জ্বর হত কিন্তু বাবার কথা বিশ্বাস করতাম না। প্রচুর ওষুধ খেতেন আবার সেরেও উঠতেন। ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়ম পালন তাঁর অভ্যস্ত হয়েছিল। ক্রমশ তিনি ভালর দিকে গিয়েছিলেন। যত দিন যেতে লাগল ততই অসুস্থতার দৈর্ঘ্য এবং পরিমাণ কমতে থাকে। অবশ্য শেষ অসুখ ছাড়া। শেষ অসুখ সর্বদাই অন্য অসুখের চাইতে মারাত্মক। তবে বাবা সাধারণ কোনো অসুখে মারা যাননি, মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা ভেঙে এবং তার থেকেই নানা অসুখের সূত্রপাতে। বাবার অসুস্থতার কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাবার সঙ্গে বলাইকাকার সম্পর্কের মধ্যে বাবার অসুখ বেশ বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। অবশ্য কখনও কখনও বলাই কাকাও তাঁর অসুখের কথা জানাতেন বাবাকে। হয়ত বাবার সঙ্গে অসুখের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে চাইতেন না বলেই কিছু অসুখের কথা লিখতেন।

বাবা বলাইকাকার চিকিৎসা সম্পর্কে লিখেছেন—"কিন্তু তবু সুখে হক বা অসুখে হক, খাওয়া ব্যাপারে একেবারে কালাপাহাড়। প্রাচীন পথ্য দেবতার যাবতীয় মন্দির চূর্ণ করে মুদ্গর হাতে বসে আছে সে। তার কাছে গেলে যেমন তার আদর্শে খেতে হবে (তার প্রধান খাদ্য প্রচুর মাংস প্রতিদিন, এবং আরও মাংস এবং আরও) তেমনি সে আমাকে শুয়ে থাকতেও দেবেনা।..."

বাবা অসুস্থ হলে বলাইকাকার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে শনিবারের চিঠি-র সম্পাদনার ভার পেয়ে এক ঢিলে দুটি পাখি মারতে চেষ্টা করলেন, ভাগলপুর চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বলাইকাকার লেখা এবং নিজের স্বাস্থ্য এই দুইই উদ্ধার তার উদ্দেশ্য। এই সময় সম্পর্কে বাবা লিখছেন, "...অনেকদিন পরে তার নতুন করে লেখা। অনেক লেখায় দুজনের পরামর্শ ছিল, এমনকি যখন সে ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করল (বনফুলের ছোট গল্প অনেক সময় কাগজের আধা পৃষ্ঠা) তখন কয়েকটিতে তার দুর্বলতা ধরা পড়ল।

বললাম গল্পগুলি ছন্দে লিখলে সহজে জমে উঠবে !..."

অসুস্থতার কথা বললাম। বলাইকাকাও নিজের অসুখের কথা লিখতেন বাবাকে। ১৯৬৬ সাল লিখেছেন...হাটু আমার বাতাতুর হয়েছে...। ১৯৭০ সালে লিখছেন ..৮ই মে নার্সিং হোম থেকে ফিরেছি। পেটে ২৩টি স্টোন ছিল।

বাবা বলাই কাকাকে ১৯৩৯ এর সেপটেমবর মাসে লিখছেন—হস্ত বাহিত চিঠি। "আশা করি আসিয়া পৌঁছিয়াছ। আমি কয়েকদিন সর্দিজ্বরে কাতর ছিলাম—আজ একটু ভাল। কাল রাত্রি হইতে non-stop লেখা চলিতেছে—মাথা ঘোরাটাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি পত্রপাঠ একবার আসিবে।—বিশেষ দরকার। এখান হইতে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া যাইও।...ভাল চা প্রস্তুত হইতেছে। দেরী করিওনা।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিঠিরই পেছনে দুলাইন উত্তর : "আসিয়াছি। আমি ও তারাশঙ্কর এখনই যাইতেছি।"

বাবার অসুস্থতা সম্পর্কে বলাইকাকার উদ্বেগপূর্ণ ছন্দ-চিঠি (সঙ্গে নিজের কথাও !)

....পেটটা কেমন আছে ?
কটা রোজ গিলিতেছ পিল ?
বর্ধিত রক্তের চাপ,
তাই আমি কিঞ্চিৎ কাবু,
মাত্র একটি মুরগী খাই
ধরিনি এখনো ভাই সাবু।

১৯৬৭ তে বলাই কাকার লেখা :

আগামী ১লা অকটোবর পুরী এক্সপ্রেসে ফিরব লক্ষ্মী পূজার আগে। এসে আরও তিন চারদিন থাকব। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—হবেনা। কারণ তোমার হার্ট, আমার হাঁটু।

১৯৬৫ সালে বলাই কাকা লিখছেন : পবি, বাত এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। খুঁড়িয়ে হাঁটছি। খুব কম খাচ্ছি। সকালে চার পাঁচখানা লুচি বাসি তরকারী দিয়ে। দুপুরে ভাত, তিন চারখানা মাছ দিয়ে। বিকেলে শুধু চা। রাত্রে তিন চার খানা রুটি+সামান্য কিছু ভাত+মুরগীর মাংস বা মাছ+সন্দেশ।

এবারে বলাইকাকার চিঠি থেকে এলোপাথারি কিন্তু স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৫৭: "তোমার হার্টের খবর কি? কি করছ? মানে কি ওষুধ খাচ্ছ জানিও।" ১৯৬৫: "তোমার ওখানে আর যাওয়া হয়নি, কারণ পা বাতাহত হয়েছিল।" ১৯৬৬: "হাঁটু আবার বাতাতুর হয়েছে আজ।" ১৯৬৭: "পা অনেক ভাল আছে। হেঁটে চলে বেড়াতে পারছি।...তোমার urine এ যদি albumen না থাকে তাহলে CHESTON নামক পেটেনট ওষুধটি কিনে খাও।

যদি সহ্য হয় ORISUL প্রত্যহ তিনটা করে ৪ দিন খেও। আর উপবাসে দেহ ক্ষীণ কোরো না। যতটা পার Protein food (এ অবস্থায় দুধ বা ডিমই ভাল) খাও। Cheston খেলে আশা করি উপকার পাবে। কাসিটা অন্তত কমবে। জ্বর কমাবার জন্য ORISUL কিংবা পেনিসিলিন দরকার।

এই চিঠিতে আমার সম্পর্কে একটু আছে: "হিমানীশকে বোলো তার কথার যাথার্থ্য দেখে বাঙালী জাতির সম্বন্ধে আশান্বিত হলাম। তার হয়ত explanation আছে, কিন্তু আমি তা শুনতে চাইনা।"

এই লেখাটি পড়ে আমার কিছুই মনে পড়ছে না। আমি কি বলেছিলাম তাও ভুলেছি, কি প্রসঙ্গ তাও মনে পড়ে না। মনে না করতে পারার ক্ষমতা আমার অসাধারণ। আগেই বলেছি আমার ডায়েরিও নেই। যাই হক, এটা আমার বক্তব্যের প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

১৯৬৭র আর একটি চিঠি: "জিভের তলার growth দুটোকে অগ্রাহ্য করো না। ডাক্তার দেখাও। বাতে ভুগছি।"

বাবার সঙ্গে অসুখের প্রতিযোগিতায় বলাইকাকা প্রায় সর্বদাই বাতের সাহায্য নিয়েছেন। সাধারণত মানুষ দেখা হলে, কেমন আছেন? এর উত্তরে যত খারাপই কেউ থাকুক না কেন, তার উত্তর শতকরা আটানব্বইটি ক্ষেত্রে হয়—ভাল আছি। বলাই কাকা এবং বাবার মধ্যেকার আদানপ্রদান একটু অন্য পর্যায়ে চলত, তোমার এত খারাপ অবস্থা? দেখো আমিও কম যাইনা, এইরকম একটা ভাব!

বাবার গলা সম্পর্কে ১৯৬১ এও দেখতে পাচ্ছি বলাই কাকার উদ্বেগ: "তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি—I mean, your গলা। ওটা তুমি এভাবে negleet করছ কেন বুঝতে পারছি না। যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা কর।"

১৯৫৯ সালে লিখেছেন: "সব পেয়েছি, সব দেখেছি, এখন তোমার শরীরটা ভাল থাকলে বাঁচি।"

১৯৬৩: "তোমার হার্টের খবর পেয়ে চিন্তিত হলাম। আমারও শরীর ভাল নয়। High B. P. এবং gout এ কাবু আছি।" ১৯৬০: "পূজার লেখা-সমুদ্রতে নাকানি-চোবানি খেয়ে তোমার বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। আমারও খুব সর্দি হয়েছিল। এখন অনেকটা সামলেছি।" ১৯৬০ এর আর একটি চিঠি, "অনেক দিন তোমাব কোনও চিঠি না পেয়ে আশঙ্কা হচ্ছে তুমি হয়ত অসুস্থ। কেমন আছ অবিলম্বে জানাও।"

ভাগলপুর থেকে কেবল নয়, কলকাতা থেকেও চিঠি এবং তাতেও স্বাস্থ্য, কিংবা অস্বাস্থ্য-সংবাদ। ১৯৬৬-এ লেখা মদন চ্যাটারর্জি লেন থেকে ; "এই মাত্র তোমার চিঠি পেয়ে উদ্বিগ্ন হলাম। তুমি CIBA কমপানির PRISCOPHEN tablet খেয়ে দেখ। হয়তো উপকার হবে। সকালে ১টা, দুপুরে ১টা, রাত্রে ১টা।"

একটি তারিখহীন খসড়া চিঠি দেখেছি সংগ্রহে রয়েছে। বাবার লেখা বলাই কাকাকে, তবে এটাতে অসুস্থতা নেই, শুয়ে থাকাটা অবশ্য আছে।

বলাই,

শ্রাবণ অলস দিনে কিছুই না করি
ছিনু পড়ি
বিছানায়।
কর্তব্য পর্বতপ্রায়
চেপে আছে ঘাড়ে
অকর্মণ্য মগজেতে বিবেক চাবুক শুধু মারে।
করি ফষ্টিনষ্টি
মহতী বিনষ্টি
করিয়াছি সময়ের
একদিন মজা টের
পাইব ইহার
যত ভাবি তত চোখে ঘুম আসে নাহি।
অবশেষে রুখিতে বিবেক
দাঁড়ালাম বেঁকে।
সময়ের বোতলের মুখে
ঠুকে ঠুকে

উন্মত হইনু কসে এঁটে দিতে ছিপি
হেনকালে এল তব ছন্দোময় লিপি।
সব কিছু হল গণ্ডগোল
ভাঙিনু বোতল।
পূর্বমত
সময়ের স্রোত ;
চলিতে লাগিল প্রবাহিয়া
পাদদেশ দিয়া।

…ইত্যাদি

মনে হয় এই কবিতাটি ১৯৪৮-এ লেখা। কেননা, এরই সঙ্গে রয়েছে বলাই কাকার একটি কবিতা-চিঠি, তাতে এই লাইন দুটিও রয়েছে—

গদ্যে পদ্যে—যাহা চায় প্রাণ—
প্রাপ্তি সংবাদ কোরো দান।

এতে রয়েছে ১৯৪৯ এর উল্লেখ।

চিঠি দেখতে দেখতে আরও চোখে পড়ছে, স্বাস্থ্য-চিঠি—১৯৬০ এ বলাই কাকা লিখেছেন ; "তুমি ২৪ ঘণ্টায় কখন কি খাও তার List পাঠাও। ভাল করে না খেলে দুর্বলতা কমবেনা। Achromycin ভাল ওষুধ।" ১৯৬১ এ ; "গতবার যা লিখেছিলে তাতে সুখবর দাওনি। আশাকরি একটু সেরেছে। অবিলম্বে জানাও এখন কেমন আছ।" ১৯৫৯ এ লিখছেন ; "কেমন আছ অবিলম্বে জানাও।"

১৯৫৭ সালে লিখছেন, এবারে ছন্দে।

ভাই পরি
'ইতশ্চেত, পড়ি
কি করিয়া বল মনে করি
জ্বরাহত আছ শয্যা-পরি
তবে
এই ভবে
শিশু-চাঁদ জনমিল যবে
তখন
"Come on—"

খলিয়া সর্ব অসম্ভবকেই
চ্যালেঞ্জ করিতে বাধা নেই।
মোদ্দা কথা বলে গেছে
শ্রীশঙ্কর ভায়া
সবই মায়া।

—ইত্যাদি।

১৯৫৪: "তুমি ছুটি নিয়ে দিন কয়েক এখানে বিশ্রাম করে যেও না? অবশ্য হার্টের ব্যাপারে বেশী নড়াচড়া করা ঠিক নয়, কিন্তু কোলকাতায় শয্যাগত থাকলেও যে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে! যা ভাল বোঝ কর…।"

১৯৪৯ সালে বলাইকাকা বাবাকে অতি মধুর একটি সম্বোধন করেছেন। চিঠিতেই তার প্রমাণ। চিঠিটার অংশ: "…কিন্তু স্বাস্থ্য একটু ফিরিয়াছে মনে হইতেছে। এখন বল দেখি তুমি নিজে কেমন আছ, রাসকেল?"

বলাইকাকার হাঁটুর বাত আবার পত্রে। ১৯৬২তে লিখছেন, "হাঁটুর ব্যথায় শয্যাগত হয়ে আছি। gout।"

১৯৫৭এ স্বাস্থ্যচর্চা: "তুমি অনেকটা ভাল আছো জেনে সুখী হলাম। তুমি কি ওষুধ খাচ্ছ জানিও। এখানে আমরা Sedonal নামক ওষুধে ফল পাই এ সব কেসে। বিশ্রামও দরকার।" ১৯৭০র সালে পেটের পাথর সম্পর্কে বলাইকাকার মন্তব্য অতি চমৎকার—"আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দারুণ প্রস্রাবাঘাত, একেবারে gallstone! এখন অনেকটা ভাল আছি। খাওয়া দাওয়া কমাতে হয়েছে। সিদ্ধ fat-free অখাদ্য খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছে! হোমিওপ্যাথী ওষুধ খেয়ে ভাল আছি। ব্যথা আর হয়নি।"

১৯৬৭-এর চিঠি: "ভাই পরি
হয়েছ নির্জরী
এ সংবাদ সন্দেশ
উপভোগ করলাম বেশ।
…আমিও জ্বর থেকে
ভুগে উঠলাম
ফুটলাম
ঠিক বলতে পাচ্ছিনা।

মুরগি ভাল পাচ্ছিনা
তাই খাচ্ছিনা···
যতটা পার খেয়ে যাও
ব্রাদার
ওছাড়া গতি নেই আর।

১৯৭০এ আবার: "আগামী ১৯ এপ্রিল আমার অপারেশনের দিন ধার্য হয়েছে। ১৭ই এখান থেকে গিয়ে বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি হব। ...তুমি ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর। দুর্বলতা সারাবার ওই একমাত্র ওষুধ।" ১৯৬৭এর আর একটা চিঠি: "আমি মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সামলেছি। লিখছি এবং ছবি আঁকছি।" ১৯৬৬ এর লেখা: ভাল করে খাও আর দুনিয়াকে কলা দেখাও।"

১৯৭০এ বাবাকে লিখছেন: "তোমার চিঠি পেয়ে চিন্তিত হলাম। তোমার এই slow-fever এর কারণ কি সেটা কি নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে তোমার Lungs X' Ray করানো উচিত। Urine culture এবং Total and diff W. B. C. পরীক্ষা এগুলোও করা দরকার। আন্দাজী ওষুধ খেলে কোনও ফল হবে না। ···আমি ভালই আছি। ···হাতে জোর পাচ্ছিনা।·· তোমার খবরের জন্য উন্মুখ রইলাম।"

১৯৭০ এর অন্য একটি চিঠিতে; "ব্যথাটা এখন নেই। কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। শয্যাগত হয়ে আছি।" ১৯৬৪ এ লেখা; "আমার শরীর ভাল যাচ্ছেনা। বাত এবং Blood প্রেসার ডায়েবিটিস তো আছেই। আজকাল মাঝে মাঝে পেটের ডান দিকে একটা ব্যাথা অনুভব করছি। ."

এরকম অসংখ্য চিঠি। বর্ণনা দিয়ে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবনা। আমি যে চিঠিগুলো থেকে এসব হীরের টুকরো সংগ্রহ করেছি সে চিঠি পরপর যে ভাবে পেয়েছি সেভাবেই নিয়েছি—তারিখের হিসেব আগে করিনি। তা ছাড়া, আমি খামের চিঠিগুলো খুলিইনি। প্রধানত পোস্টকার্ডের এক তৃতীয়াংশ চিঠি থেকে যা এতক্ষণ বলেছি তা সংগ্রহ করেছি। বাকী গুলিতেও নিশ্চয়ই রাশি রাশি উদাহরণ পাওয়া যাবে। শ্রোতারা প্রশ্ন করতে পাবেন, দুজন রস সাহিত্যিকের শারীরিক বর্ণনা দেওয়ার এত কি দরকার ছিল? এর মধ্যে সাহিত্যিক মর্ম কোথায়? অনুভূতি, সমাজ-দর্শন এসবই বা কোথায়? দুজন ব্যঙ্গ সাহিত্যিক শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কার উৎসাহ হবে?।

হয়ত কারুরই উৎসাহ হবে না। তবে একটি কথা—বাবা এবং বলাই কাকার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য রকম হত যদি যুবক বয়সে বাবার ল্যারিনজাইটিস এবং জ্বর না হত। তাহলে বাবাও ভাগলপুরে যেতেন না, আর বলাই কাকাও প্রবল বিক্রমে শনিবারের চিঠিতে লিখতে সুরু করতেন না। এটা অবশ্যই আমার ধারণা, এ ধারণা অন্যদেরও গ্রহণ করতে হবে সে দাবি আমার নেই।

উপমার প্রয়োগ বৈচিত্র্য

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ডি. লিট্

এখন আর মদনমোহন তর্কালংকার রচিত 'শিশুপাঠ' কেউ পড়ে না। আমাদের শৈশবেও কিন্তু তা জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। তার প্রথম ভাগের প্রথম কবিতার প্রথম চার লাইন আমার এখনও মনে আছে :

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।

কবিতাটি প্রভাতকালের অনবদ্য ছবি এঁকেছে। তবে এতে শুধু তথ্য আছে, কল্পনার এতটুকু স্পর্শ লাগে নি। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে একে স্বভাবোক্তি বলে। কিন্তু যেহেতু তা বিশুদ্ধভাবে তথ্য নির্ভর, তার হৃদয়বৃত্তির নিকট আবেদন নাই। তা কবিতা বলে বিবেচিত হবার যোগ্য কিনা বিবেচনার বিষয়।

এই প্রভাতেরই বহু বর্ণনা ঋগ্‌বেদের মধ্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে উষার বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলা হয়েছে : "গৃহিণী জেগে যেমন সকলকে জাগান, উষা তেমন বিশ্ববাসীকে জাগায়।"[১] এখানে একটি উপমা প্রয়োগ করে প্রভাতের বর্ণনাকে সরস করা হয়েছে। ফলে তা সত্যই কবিতা বলে স্বীকৃতি পাবার দাবী করতে পারে, কারণ তা রসাত্মক রচনার নিদর্শন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত তথ্য যদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, তার ভাষা অন্য রকম হয়ে পড়ে। কারণ হৃদয় তাকে সরস না করে গ্রহণ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। ধরা যাক পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখতে গেছে। পাত্র সেখানে হাজির ছিল না; কিন্তু তার বন্ধু ছিল। ফিরে এসে সে পাত্রকে পাত্রীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে

১। জদযদয় সমতো বোধয়ন্তী। ঋগ্‌বেদ। ১।১২৪।৪

বলল, পাত্রীর দাঁতগুলি ধবধবে সাদা। এটা হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহৃত তথ্য মাত্র। কিন্তু সেই পাত্রী যখন পরিণীতা বধূ হয়ে আসবে, তার রূপমুগ্ধ স্বামী প্রেমে অভিভূত হয়ে কবি জয়দেবের অনুসরণে বলবে: কথা বলতে যখন তোমার দাঁত অনাবৃত হয় তখন ঘোর আঁধারও আলোকিত হয়ে যায়;

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্। [২]

এ হল অনুভূতি মিশ্রিত ভাষা। তাই এমন অলংকারে ভূষিত এতখানি উচ্ছ্বাস।

এই কারণেই শিল্পতত্ত্ব রসিক আই এ রিচার্ডস বলেছেন যে ভাষার দুরকম ব্যবহার হতে পারে; একটি বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার [৩] অপরটি হৃদয়বৃত্তির ব্যবহার। [৪] বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের নিদর্শন পাই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসে; আর হৃদয়বৃত্তির পাই রসসাহিত্যে। দ্বিতীয়টি হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে। তাই ডিকুইনসি বলেছেন, তা শক্তির ভাষা। [৫]

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা হল বিশুদ্ধ সত্য; কিন্তু হৃদয় বৃত্তির ভাষায় বিশুদ্ধ সত্যের প্রবেশ নিষেধ। কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সরস হলে তবেই তা হৃদয়বৃত্তির ভাষায়, অর্থাৎ রস সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পায়।

তাঁর প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করেছেন। নাইট্রোজেন মানবদেহের পুষ্টির একটি আবশ্যিক উপাদান। বায়ুমণ্ডলে বিশুদ্ধ আকারে তা ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই আকারে মানবদেহ তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। জীব বা উদ্ভিদদেহের উপাদান হিসাবে তা রূপান্তরিত হলে তবেই মানবদেহ তাকে গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেছেন, অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ সত্য রসসাহিত্যে দুষ্পাচ্য, তাকে কল্পনার সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির রসে রঞ্জিত করলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"যা বলতে চেয়েছিলুম তা হল এই যে, যদি কোনো দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তবে তাকে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের সন্দেহ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে, আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের সঙ্গে নিহিত করে দিতে হবে; নইলে যতক্ষণ তাকে স্বপ্রকাশ

২। গীতগোবিন্দ ৩। Scientific Use ৪। Emotive Use ৫। Literature of Power

সত্যের আকারে দেখব ততক্ষণ তার অন্য নাম। যেমন নাইট্রোজেন তার আদিম আকারে বাষ্প, উদ্ভিদ অথবা প্রাণী শরীরে রূপান্তরিত হলে তবেই সে আমাদের খাদ্য, তেমনি সত্য যখন মানবজীবনের সঙ্গে মিশে যায়, তখনি সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।" ৬

রস সাহিত্যে বিশুদ্ধ সত্যকে মানব জীবনের মেশাবার উপায় হল অলংকার, বিশেষ করে অর্থালংকার। শব্দালংকার এখানে গৌণ ভূমিকা অবলম্বন করে; তা শব্দমাধুর্য সৃষ্টি করে, ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। জয়দেব যাকে বলেছেন 'কান্তকোমল পদ' তারই অবলম্বন হল যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকার। তা বাহির মহলের জিনিষ। অন্দরমহলের জিনিষ হল অর্থালংকার। তা সত্যকে কল্পনার সহিত মিশ্রিত করে মানবজীবনের কাছে টেনে আনে। বৈজ্ঞানিক এইভাবে সত্যের সঙ্গে মানবজীবনকে সংযুক্ত করতে পারেন না; কিন্তু রসসাহিত্যিক পারেন। কোনো মহিলার মাথায় কালো কেশের বিপুল বিস্তার দেখলে বৈজ্ঞানিকের কালো মেঘের কথা মনে হয় না; কিন্তু কবির মনে হয়। সুন্দর মুখ দেখলে বৈজ্ঞানিকের কমলের কথা মনে হয় না, কিন্তু কবির হয়।

অর্থালংকারের রাজা হল উপমা। তা সাদৃশ্যের সূত্র ধরে মানুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটায়। এই ভাবে তা তথ্যকে রসসাহিত্যে গ্রহণের উপযোগী করে তোলে। অবশ্য তার অন্য ভূমিকাও আছে, যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতিকে পরিস্ফুট করা এ প্রসঙ্গে আলংকারিক দণ্ডীর উদ্ধৃত সেই বিখ্যাত উপমাত্রয়ীর উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত একটি গানে এই লাইনটি পাই: 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী।' কিন্তু এখানে আঁধারের ঘনত্ব শুধু বিশেষণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। দণ্ডীর উদ্ধৃতিতে তা উপমার প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে আঁধার এমন ঘন যে তা যেন গায়ে আঠার মত লেগে যাচ্ছে, আকাশ যেন কাজল বর্ষণ করছে, আর ফলে, অসৎপুরুষের সেবা যেমন নিষ্ফল হয় তেমন দৃষ্টি শক্তি নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে।

লিম্পতীব তমোঽপাসি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষ সেবের দৃষ্টিবিফলতাং গতা ॥

এখন উপমার মুখ্য ভূমিকা হল মানব জীবনের সহিত সত্যকে মিশিয়ে দেওয়া বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানব রসের সহিত মিশ্রিত করা।' এই প্রতিপাদ্যের

৬। আলোচনা, পত্র (লোকেন পালিতকে লিখিত পত্র হতে উদ্ধৃত)

সমর্থনে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন মুখ দেখলে কমলের কথা মনে পড়ে, যেমন খরস্রোতা নদী দেখলে নটিনীর কথা মনে পড়ে যায় বা অভিসারিকা নারীর কথা মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'চঞ্চলা' কবিতায় দুটি উপমারই ব্যবহার করেছেন।

উপমা বিশুদ্ধ সত্যকে কি ভাবে মানবরসের সহিত মিশ্রিত করে' তাকে রসসাহিত্যের উপাদানে পরিবর্তিত করে, তা ভালভাবে বুঝতে হলে, উপমার সহিত প্রথমে একটু নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উপমার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে, উপমেয় অর্থাৎ যাকে উপমা করি, উপমান অর্থাৎ যার সঙ্গে উপমা করি এবং সমানধর্ম অর্থাৎ যে বিষয় উপমা করি। কোনো প্রেমিক যখন বলে তার প্রেয়সীর মুখচন্দ্র ঘর আলোকিত করছে, তখন প্রেয়সীর মুখ হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে উপমা করি সেই চন্দ্র হয় উপমান. আর যে বিষয় উপমা করি সেই আলোকিত করবার ক্ষমতা হয় সমানধর্ম।

যেখানে তিনটি উপাদানেরই উল্লেখ থাকে সেখানে উপমার পরিপূর্ণ রূপটি পাই। তাই তাকে বলা হয় পূর্ণোপমা। যেমন কালিদাস রায় বলেছেন:

নবনীর মত শয্যা কোমল পাতা।

বা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

এও যে রক্তের মত রাঙা
দুটি জবা ফুল।

এখানে দুটি বস্তুর সাদৃশ্যে বর্ণনাকে শুধু পরিস্ফুট করে না, পরস্পরের এই সঙ্গতির উপলব্ধি মনকে আনন্দ দেয়। কিন্তু দেখা যাবে উপমা যত প্রচ্ছন্ন আকারে স্থাপিত হয় তত তার উৎকর্ষ বাড়ে, তা তত রসদীপ্ত হয়। সেটা ঘটানো যায় উপমার উপদানগুলির এক বা একাধিক উপাদানকে লুপ্ত রেখে। এই শ্রেণীর উপমাকে এই কারণে লুপ্তোপমা বলে।

লুপ্তোপমা প্রধানত চার শ্রেণীর হতে পারে:

(১) উপমিত সমাসে সমান ধর্ম অনুপস্থিত থাকে।
যেমন 'মুখ কমল'। এখানে সমানধর্ম অনুপস্থিত।

(২) উপমান সমাসে উপমান ও সমানধর্মের উল্লেখ থাকে কিন্তু উপমিত অনুল্লিখিত। তেমন 'তুষার ধবল'। এখানে উপমিত অনুপস্থিত।

(৩) রূপকেও উপমিতের মত সমানধর্ম অনুপস্থিত থাকে তবে উপমিতের প্রাধান্য থাকে না, পরিবর্তে উপমানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

যদি বলা হয় মুখচন্দ্র দেখতে ভাল লাগে, তা হবে উপমিত। আর যদি বলা হয় মুখচন্দ্র ঘর আলোকিত করে, তা হবে রূপক।

(৪) এখনি বলা হয়েছে যে উপমা যত প্রচ্ছন্ন হয়, বর্ণনা তত সুন্দর হয়। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে কালিদাস রচিত 'রঘুবংশম্'-এর চতুদশ সর্গ হতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেখানে পাই সীতাকে উদ্ধার করে রাম তাঁকে নিয়ে পুষ্পক রথে আকাশ মার্গে দাক্ষিণাত্য পবিক্রমা করছেন। সেখানে একটি বিশেষ স্থানেব প্রতি সীতাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে রাম বলছেন:

এই হল সেই স্থান যেখানে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি মাটিতে তোমার একটি নূপুব পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, তা তোমার চরণ-অরবিন্দ হতে বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখেই যেন মৌন হয়ে ছিল।

সৈষা স্থলী যন বিচিন্ততা ত্বাং
অদৃশ্যত ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্।
ত্বচ্চরণারবিন্দ বিশ্লেষদুঃখাদ্
ইব বদ্ধ মৌনম্॥

এই উক্তিটি মনকে স্পর্শ করে, রামেব বিরহ দুঃখ যেন জড়ধর্মী নূপুরকেও স্পর্শ করেছে। কিন্তু 'ইব' এই অব্যয়টি যদি তুলে দেওয়া হত, তা হলে বর্ণনাটি আরও হৃদয়গ্রাহী হত। তখন বলা হত তোমার চরণ হতে ভ্রষ্ট হবার দুঃখে তা মৌন হয়ে আছে। এখানে উপমানেব উল্লেখ নাই, সমানধর্মেব উল্লেখ নাই, কেবল নূপুরের আচরণের দ্বারাই সমানধর্ম সূচিত হচ্ছে। সীতার চরণ নূপুরের প্রেমাস্পদ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে দুঃখে মৌন হয়ে গেছে। জড়বস্তু হৃদয়বান প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন বর্ণনা আরও অনেক বেশী ভাল লাগে।

তার একটা কারণ আছে। প্রথমটিতে উপমা প্রকট রূপে ব্যবহৃত হয়েছে; তাই এখানে মানবহৃদয়ের অনুভূতি জড়বস্তুর উপর আরোপের আভাস মাত্র আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নূপুবেব উপব বিরহী প্রেমিকের আচরণ আরোপ করে, তাকে হৃদয়বৃত্তিভূষিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে তা আরও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অর্থাৎ উপমা এখানে প্রকট না থেকে প্রচ্ছন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই এমন হয়েছে। একে অলংকার শাস্ত্রে সমাসোক্তি বলে। তা

খানিকটা রূপকের মত, কারণ উপমান এখানে প্রাধান্য পায়। কিন্তু উপমান এখানে অনুল্লিখিত, সমানধর্মও অনুল্লিখিত। আচরণের দ্বারা সমানধর্ম সূচিত হয়েছে। এখানে উপমা সর্বাধিক প্রচ্ছন্ন হয়েছে বলে তথ্যের সঙ্গে মানবরসের মিশ্রণ সর্বাধিক হয়েছে।

সুতরাং সমাসোক্তির মধ্যে উপমার সব থেকে সার্থক প্রয়োগ ঘটে থাকে। তাই দেখা যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরা সমাসোক্তি অলংকারের প্রচুর ব্যবহার করে থাকেন। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের রচনা হতে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই আলোচনা শেষ করবার প্রস্তাব করি।

আমরা এখনি কালিদাসের রঘুবংশ হতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। সেখানে উপমা প্রকট ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক বলতে কি রঘুবংশে উপমার প্রকটরূপে ব্যবহারই সাধারণত পাই। কুমারসম্ভবেও সে কথা প্রযোজ্য। সেই জন্যই বোধ হয় কালিদাসের উপমার এত খ্যাতি ছিল। কিন্তু মেঘদূত কাব্যে দেখা যায় কবির উপমা প্রয়োগরীতি রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেখানে তিনি উপমার যা প্রচ্ছন্নতম রূপ সেই সমাসোক্তিরই ব্যবহার করেছেন। মেঘদূতে কবি মেঘকে তো মানবধর্মী করেছেনই, এমন কি নদী, পাহাড়, বন—সবই মানুষের অনুভূতিবিশিষ্ট সজীব প্রাণীর রূপ ধরেছে। বলাকা সেখানে দুর্গম পথের সহযাত্রী, নদী সেখানে মেঘের প্রেয়সী, পর্বত সেখানে আশ্রয়দাতা বন্ধু। এর দৃষ্টান্ত মেঘদূতের ছত্রে ছত্রে মিলবে। তাই তার উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন দেখি না।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্যসাহিত্যে সমাসোক্তির ব্যবহারের অনুরূপ ভাবে প্রচুর উদাহরণ মিলবে। এমন আছে, সমগ্র কাব্যগ্রন্থ সমাসোক্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন 'ঋতুরঙ্গশালা'। এখানে কেবল একটি কবিতা বিশ্লেষণ করে সমাসোক্তির প্রয়োগে তিনি কেমনভাবে সাহিত্যে মানবরস মেশাতেন তা দেখাবার চেষ্টা করব।

কবিতাটি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বোধন'। তার আলোচ্য বিষয় শীতের পরে বসন্তের আবির্ভাব। এখানে তা পরিকল্পিত হয়েছে এমন একটি ভাবের আশ্রয়ে যা শীত ও বসন্তকে একই সূত্রে গ্রথিত করে দেয়। পরিকল্পনাটি এই: যিনি চিরপুরাতন অথচ নিত্যনূতন, সেই 'নিত্যকালের মায়াবী' একটি

খেলা খেলেন। তা হল পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে [illegible] নূতন বেশে সাজিয়ে দেওয়া, যাতে নব বর বেশে তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন। কবির ভাষায় :

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে,
নব বর বেশে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে।

তাই বসন্তে সেই নববরবেশী নিত্যকালের মায়াবীকে স্বাগত জানাতে নিসর্গ রাজ্যে সাজবার তাড়া পড়ে গেল :

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায় করো ত্বরা, করো ত্বরা,
সাজাক পলাশ আরতি পাত্র রক্ত প্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগলভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা।

বসন্তের এই বর্ণনায় সত্য ও কল্পনা ওতঃপ্রোতঃভাবে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। তাই তা পাঠককে শুধু মুগ্ধ করে না, অভিভূত করে। তা সম্ভব হয়েছে সমাসোক্তির প্রয়োগে।

কলকাতার কড়চায় 'রবিবাসর'

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৩ ভাদ্র, ১৩৮৭)

রবিবাসর

সদস্য সংখ্যা মাত্রই ৫২—কিন্তু তারই বাষ্পীয় শক্তি একটি সাহিত্য সংস্থাকে টেনে নিয়ে এসেছে সুবর্ণজয়ন্তীর স্বর্ণিল উৎসবে। পঞ্চাশের পারানি দিয়ে 'রবিবাসর' পা দিয়েছে একান্নর সিঁড়িতে। **পিছনে অতি উজ্জ্বল এক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামনে দীপ্ত ভবিষ্যৎ।** এই উপলক্ষে প্রকাশিত 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ রবিবাসর'-এর বিশেষ সংকলন, ওই সমৃদ্ধ ইতিবৃত্ত যার ভিতর আভাসিত। গত এক যুগ ধরেই অবশ্য এই সংকলন গ্রন্থটি সুসম্পাদিত হয়ে বেরিয়ে আসছে।

রবিবাসরের প্রথম অধিবেশন বসে ৫ আশুতোষ মুখার্জি রোডে সুবোধচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ১৩৩৬ সালে। সুবোধবাবু ছিলেন 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। রবিবাসরের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন। সম্পাদক—নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রবিবাসরের অধিনায়ক। শহরে এলেই চেষ্টা করতেন আসরে যোগ দিতে। সভ্যদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবিবাসরের আর এক দুর্লভ সম্মান—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে এর সদস্য ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ষাট বছর পূর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরেই পাঠ করেন তাঁর আশীর্বাণী। তারপর নিজ হাতে সেটা তুলে দেন অমর কথাশিল্পীর হাতে। প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' গ্রন্থে গ্রথিত প্রবন্ধাবলী এই আসরেই পড়ে শোনান। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পরিচিত বহু নাম—যদুনাথ সরকার, অতুল গুপ্ত, রাজশেখর বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, রঙিন হালদার, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি—কোনও না কোনও ভাবে রবিবাসরের সঙ্গে জড়িত। সঙ্গের ছবিটি জলধর সেনের। এঁকেছিলেন সেকালের বিখ্যাত শিল্পী যতীন সেন মশাই।*

---

* ছবিটি 'রবিবাসর, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা প্রথম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা হতে তুলে ছোট আকারে আনন্দবাজারের কলকাতার কড়চায় এক কলমের মধ্যে ছাপা হয়।—সম্পাদক

বুদ্ধসময়ে সমাজে নারীর স্থান

চিত্রিতা দেবী

বুদ্ধ সময়। অর্থাৎ আড়াই হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষ। তখন অবশ্য জম্বুদ্বীপ নামটারই চল ছিল। গ্রামীন এবং নগর সভ্যতার যদিও তখন খুবই বাড়বাড়ন্ত, তবু 'মহাবন' নামে খ্যাত গভীর অরণ্যানীর কিছু কিছু অংশ তখনো নানাদিকে ছড়িয়ে ছিল। আর সেই সব বনে জঙ্গলে তখনো ছিল জামগাছের প্রাচুর্য। জাম বা জম্বু থেকে নাম জম্বুদ্বীপ।

জংলী আমের চাষ করে তাকে বাগানে রূপান্তরিত করার কাজ অবশ্য তার অনেক দিন আগেই শেষ হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা জায়গায় আমবাগানের উল্লেখ আছে। বৈশালীর নগর-নটী বুদ্ধ উপাসিকা আম্রপালীও আমবাগানে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। বাগানের মালিক একজন ধনী তাকে নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তার রূপ গুণের খ্যাতি শুনে বহু শ্রেষ্ঠী ও রাজার কুমার তাকে বিবাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। গোত্রহীন হওয়াটা তখনকার দিনে এমন কিছু নিন্দনীয় ছিল না। সীতাও তো আলের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। কিন্তু জানকী বলে তার খ্যাতি ঊর্মিলার চেয়ে বেশী।

নারী প্রসঙ্গে আসার আগে আর একবার ভারত প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। ভারতের আকৃতিটা তখনকার পণ্ডিতদের বেশ ভালোরকম জানা ছিল।

দীর্ঘনিকায়ে একটি গল্পে আছে যে পুরাকালে রেণু নামে এক রাজা ছিলেন। তার পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন মহাপণ্ডিত মহাগোবিন্দ। তিনি উত্তরে আয়ত ও দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবীকে সমান সাত ভাগে ভাগ করেছিলেন। শকটমুখ, অর্থাৎ গরুর গাড়ীর সামনের দিকটা যেমন একেবারে সরু হয়ে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারত থেকে শকটমুখ কুমারিকা পর্যন্ত এই মহা-ভূভাগটির পুরোপুরি মানচিত্র না হলেও মোটামুটি চিত্র বুদ্ধযুগে জানা ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে গ্রথিত হলেও ভারতের সমগ্রতার সঙ্গে একটা পরিচয়ও তাদের ছিল।

মহাগোবিন্দ যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তার পত্নীদের বললেন,

'তোমরা এখন ধন-সম্পদ নিয়ে যে যার বাপের বাড়ি চলে যাও, কিংবা অন্য পতি বরণ কর। আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। এটি অবশ্য দীর্ঘনিকায়ের মতেই বহু প্রাচীন কালের কথা। কিন্তু বুদ্ধের সমকালেও মেয়েদের পুনর্বিবাহকে কেউ দোষের ভাবত না। এমনকি গৌতমের গৃহত্যাগের পরে যশোধরার কাছেও অন্যান্য শাক্যপুত্রেরা বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি সে সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পতিব্রতা ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। গৃহে থেকেও তিনি গৌতমের মত একবেলা আহার করতেন এবং পালঙ্কে বিন্যস্ত তুলিকা চিত্রকা-শোভিত পুষ্পসার গন্ধযুক্ত মহার্ঘ শয্যা ত্যাগ করে মাটিতে একটি চাদর বিছিয়ে শুতেন।

যে শাস্ত্র বচনটির আয়ুধ নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের জন্যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, ('নষ্টে মৃতে প্রব্রাজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিবরণে বিধীয়তে) বোধহয় বুদ্ধ সময়ের সমাজে তা বেশ ভাল রকম চালু ছিল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুশো বছর পরে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে অনেক আইন কানুনের কথা লেখা আছে। কি কি কারণে নারী বিবাহবন্ধন থেকে 'মোক্ষ' বা মুক্তি চাইতে পাবে এবং আবার বিবাহ করতে পারে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যায় শুধু মৃত বা প্রব্রাজিত হলেই নয়, স্বামী যদি বহুদিন বিদেশে থাকে তাহলেও স্ত্রী মোক্ষ চাইতে পারে এবং আবার বিবাহ করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর উত্তরাধিকার, স্বামী স্ত্রীব সম্পর্ক সম্বন্ধে কৌটিল্যের মতামত শুধু আধুনিকই নয়, বরং স্ত্রীর দিকেই যেন তার পক্ষপাত বেশী। যেমন দাম্পত্যবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে স্ত্রীর যা শাস্তি প্রাপ্য, স্বামীর প্রাপ্য তার দ্বিগুণ। বিবাহ বিচ্ছেদেও তিনি স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ ভরণপোষণ না করা, সন্তান না হওয়া, বা অন্যান্য বড় বড় অপবাধ ছাড়াও শুধুমাত্র ভালো লাগছে না, এই কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি উভয়ত হয় তবেই কার্যকরী হবে। শুধু একপক্ষের বিরাগের জন্যে বিচ্ছেদ চলবে না।

এই ধরণের নানা ব্যবস্থা সমাজে বহুদিন ধরেই চলে আসছিল এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বলাও হয়েছিল। কৌটিল্য নিজেও বেশ কয়েকজন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন।

অবশ্য আইনে যা থাক, সমাজে এবং জীবনে সব সময় তা প্রতিফলিত

হয় না। অনেক কাণ্ডের পর আজ তো পণ প্রথাকে আইনত অপরাধ বলে ঘোষণা করা হোল। কিন্তু পণপ্রথা কবে বন্ধ হবে কে জানে। বিধবা বিবাহও তো বহুদিন হোল আইনত স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কজন বিধবা বিবাহের সুযোগ পান?

কাজেই দেখতে হবে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সাহিত্যে সত্য রূপে তা কিভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মৌর্য আমলের সাহিত্য বলতে অবশ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্য আমাদের সামনে দর্পণের মত পড়ে আছে যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের সমাজ, জীবন ধর্ম ও রাজনীতি। 'সুত্ত' বিনয় অভিধর্ম প্রভৃতি এবং অসংখ্য জাতক কাহিনী-সম্বলিত মূল বৌদ্ধ সাহিত্যকে বুদ্ধের সমসাময়িক বলে ধরা যেতে পারে। বৈদিক যুগে আমরা বহু নারী ঋষির নাম পাই যারা মন্ত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী ছিলেন বলে মনে হয় না। বুদ্ধ সময়েও আমরা বহু নারীর উল্লেখ পাই যাঁরা তাদের অন্তোপলব্ধির বাণী কাব্যছন্দে অথবা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। এরা প্রায় সকলেই গৃহসম্পদ ছেড়ে প্রব্রজ্যা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। এদের জীবনী ও বাণী থেকেও সে যুগের বহু কথা জানা যায়।

গৃহিণী এবং সন্ন্যাসিনী ছাড়া নারী সমাজের একটি অংশ বারাঙ্গনার জীবিকা গ্রহণ করতেন। বৈদিক যুগের সঙ্গে বৌদ্ধ যুগের এইখানে বেশ বড় রকম প্রভেদ আছে। বৈদিক সূত্রগুলিতে কদাচিৎ বারাঙ্গনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে অজস্র বারাঙ্গনা। বৌদ্ধযুগে বণিকদের ধনের অত্যন্ত প্রাচুর্য এবং ধনীর অত্যন্ত নারী-লোলুপতার ফলেই বোধহয় এত বেশী পণ্যা নারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সে যুগের গণিকাদের বিষয়ে বহু কথা বলার আছে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রভূত গুণশালিনী। সমাজে একদিকে এরা খানিকটা সমাদর পেলেও অন্যদিকে এদের প্রাপ্য ছিল ঘৃণা। কিন্তু তাদের সন্তানেরা সমাজবহির্ভূত হতেন না। বিখ্যাত চিকিৎসক জীবকের মাতা ছিলেন বারাঙ্গনা।

বুদ্ধ এদের ক্ষমা করেছিলেন, বলেছিলেন, অনুতপ্ত হয়ে ধর্মে মন দেবারও অধিকার সকলেরই আছে, এমন কি অঙ্গুলিমালের মত পাপিষ্ঠেরও। প্রথম দিকে অবশ্য বুদ্ধ নারীর প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। মাতা, প্রিয়া ও উপাসিকাদের স্নেহ প্রেম ও ভক্তি তাঁকে নিত্য শতধারায় অভিষিক্ত করলেও নারীর ভিতরকার কামিনীকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই বহুদিন

পর্যন্ত নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার দেননি। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে অবশ্য সেসব বিষয়ে আলোচনার স্থান নেই। আমরা শুধু মোটামুটিভাবে সে যুগের নারী সমাজের বিষয়ে আজ কয়েকটি কথা বলব।

মেয়েরা সেযুগে ষোলো তো বটেই এমন কি বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকতেন। পিতৃগৃহেই তাদের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হোত। ছেলেদের মত বিদ্যার জন্যে তাদের বিদেশে বা গুরুগৃহে যাবার কথা শোনা যায় না। পর্দাপ্রথা তখন ছিল না। কিন্তু "ললিতবিস্তরে" আছে বিবাহের পরে গোপা ঘোমটায় মুখ ঢাকেননি বলে পরিজনেরা নাকি কানাকানি করেছিলেন। গোপা সগর্বে বলেছিলেন, "আমি সত্যবতী ধর্মশীলা, পতিছাড়া কারু দিকে চেয়েও দেখি না। আমার লজ্জা কিসের-যে ঘোমটায় মুখ ঢাকতে যাব।" বোধহয় নববধূদের পক্ষে সূক্ষ্ম ওড়না দিয়ে মাথা ও মুখের কিছু অংশ আবৃত করার রীতি তখনো ছিল।

মেয়েরা সাধারণত অন্তঃপুরচারিণী হলেও বাইরে বেড়াতে যেতেন। প্রেক্ষা-গৃহে নাটকাদি অভিনয় দেখতে যেতেন। দোকানে বাজারে কোথাও যেতে তাদের বাধা ছিল না। ধনী কন্যারা সখী সখা নিয়ে উদ্যান বিহারেও যেতেন। সুরাপানেও তাদের আপত্তি ছিল না। মেয়েদের প্রেমের স্বাধীনতাও ছিল। অনেকের কথা শোনা যায়, যাঁরা গুরুজনের মত অগ্রাহ্য করে অযোগ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। পিতামাতাও শেষ অবধি কন্যাস্নেহে সেইসব বিবাহ মেনে নিয়েছিলেন। বিধবা অথবা পতি-বিরহিতার বিবাহ সমাজ খুসী মনেই মেনে নিত; বিশেষত বিবাহ যদি বংশের মধ্যেই সঙ্ঘটিত হোতো। আবার সহমরণের উল্লেখও এক জায়গায় পেয়েছি। বোধহয় সবকিছুর অনুমোদন সমাজে ছিল, প্রেমের জন্যে দেহত্যাগ অথবা গৃহত্যাগ। আবার অপ্রেম, দারিদ্র্য অথবা যৌবনের তাগিদে পুনর্বিবাহের প্রচলন থাকলেও পুরুষের মত বহুবিবাহের অধিকার নারীর ছিল না অর্থাৎ পোলিগেমি ছিল, কিন্তু পোলিয়েনড্রি নয়।

এছাড়া অন্য যে সব কর্তব্য ও ব্যবহার মেয়েদের পালনীয় বলে মনে করা হোত তা অবশ্য এই সেদিন পর্যন্ত নারীর আদর্শরূপে গণ্য হত। একবার কয়েকটি মেয়ের একই দিনে বিবাহ স্থির হয়েছিল। কন্যাদের পিতা যেই শুনলেন বুদ্ধদেব নগরে এসেছেন তাকে গিয়ে ধরলেন কন্যাদের কিছু উপদেশ দেবার জন্য। বুদ্ধদেব তাঁদের যা উপদেশ দিয়েছিলেন, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা কালে কণ্বমুনি ঐসব কথাই বলেছিলেন। আবার ঐ উপদেশের কয়েকটা যথা "প্রিয় সখীনির

সপত্নীজনের* ইত্যাদি ছাড়া আর সবই এযুগেও মোটামুটি চলে যায়। যেমন মেয়েরা পরিবারের সকলের সেবাযত্ন করবে। বধূরা শ্বশুর শাশুড়ীকে সম্মান করবে, স্বামীর ভাই-বোন সকলের সমাদর করবে, ঘরের কাজে আলস্য করবে না ইত্যাদি।

একটি মেয়ে তার নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তিনি সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন ও সবার শেষে শুতে যেতেন। ভোরবেলা শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে ঘরের কাজ শুরু করতেন। স্বামী স্নান সেরে এলে কঙ্কতিকা (কাঁকই অথবা চিরুণী), অঞ্জন, দর্পণ, মুখাবলেপন বিবিধ অঙ্গরাগ নিয়ে গিয়ে স্বামীকে সাজাতেন। কিঙ্করীর মত স্বামীর সেবা করতেন। আজকের দিনে যেসব আধুনিক ছেলেরা লম্বা চুল রাখতে ও পাউডার লিপস্টিক লাগাতে শুরু করেছেন তাঁরা এই প্রাচীন নজীর দেখে উৎসাহিত হতে পারেন। বিশেষত সুন্দরী স্ত্রী নিজেই যদি maid in waiting-এর ভূমিকা নেয়। এত করেও মেয়েটি কিন্তু স্বামীর মন পায়নি। আসলে অত করলে বোধহয় মন পাওয়া যায় না। ঐ দুঃখিনী মেয়েটির জীবনে বার বার তা প্রমাণ হয়েছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অবশ্য তার জীবনের মধ্যে পূর্বজন্মের কর্মফলের রূপায়ণ দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন।

আবার এও দেখা গেছে স্ত্রীর প্ররোচনায় স্বামী তার নিজের পিতামাতার উপরে অকথ্য অত্যাচার করেছে। এসব ক্ষেত্রে নারীর চরম স্বার্থপরতা ও পুরুষের প্রচণ্ড মূঢ়তার চিত্র ফুটে উঠেছে। এ যুগের সমাজেও কম বেশি এই ধরনের নিষ্ঠুরতা সঙ্ঘটিত হতে দেখা যায়। মানুষ বহু ধর্মকথা ও তত্ত্বকথা শুনেছে, তবু আজো পর্যন্ত চরিত্র সংশোধন করতে পারেনি। অথচ চরিত্র নির্মাণের জন্যই যুগে যুগে ধর্মনায়ক ও চিন্তানায়কদের আবির্ভাব হয়েছিল।

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য যুগের প্রয়োজনে নানাভাবে বদলেছে, তবু মূল ভাবধারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। সামাজিক, পারিবারিক এবং মানবিক কর্তব্যের আদর্শ নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কতকাল ধরে যে ভারতীয় মানসিকতায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কে জানে? তাই সে যুগের সমাজের দিকে তাকালে বহু জিনিষই অত্যন্তই পরিচিত মনে হয়। শুধু তার মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতা ও তাদের যৌবনধর্মের স্বীকৃতি একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

———

বিজ্ঞাপন-সাহিত্য

সমর বসু

[শনিবারের চিঠিতে 'সংবাদ সাহিত্য' নামে একটি বিভাগ ছিল, তাই দেখে আমি 'বিজ্ঞাপন-সাহিত্য' সম্পর্কে নিয়মিত লিখতে সুরু করেছিলাম 'গায়ত্রি' মাসিক পত্রে। রাজশেখর বসুও বিজ্ঞাপন-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন মনে পড়ে। রাজশেখরের তিরোধানের পর 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার অনুরোধে তাদের 'রাজশেখর সংখ্যায়' রাজশেখরের বিজ্ঞাপন সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তারই সংক্ষিপ্ত সার এবারের এই সংকলনে রাজশেখর শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে সহজ ভাষা প্রয়োগের বিষয়ে আর একজন সজাগ শিল্পী ছিলেন ডি. জে. কীমার কোম্পানীর দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে.)। তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কারণ আমিও তাঁর মতই সারা জীবন প্রচার ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলাম। শুধু সিগনেট প্রেসের বিজ্ঞাপনেই নয়, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ এবং ডি. কে-র তৈরী আরও অনেক বিজ্ঞাপনেই তিনি অননুকরণীয় ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন।

বিজ্ঞাপন নিয়ে আমি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলাম যা বনফুলেরও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংবাদপত্রে সি. এম. ডি. এ-র নতুন ধরণের অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী ভাষা নিয়ে বনফুলের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়। তিনি আমায় বললেন—তুমি এই নতুন ধারার বিজ্ঞাপনটির বিষয়েও কিছু লেখ। তখন আমি বিজ্ঞাপন বিষয়ক ভারতবর্ষের একমাত্র পত্রিকা Advertlink-এ C.M.D.A-র বিজ্ঞাপন সম্পর্কে আলোচনা করি। সে লেখাটি ঐ প্রতিষ্ঠান প্রচার অধিকর্তার নজরে পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এবার আমাদের অনুরোধে তিনি নিজেই 'বিজ্ঞাপন সাহিত্য' নিয়ে যে চমৎকার প্রবন্ধটি লিখেছেন সেটি পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি।

—সম্পাদক]

কথাটা কি হবে—বিজ্ঞাপনে সাহিত্য না সাহিত্যে বিজ্ঞাপন? দুটোই হতে পারে। তবে এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় হল বিজ্ঞাপন সাহিত্য।

অত চুলচেরা বিচার না করেও একটা জিনিষ নিশ্চয়ই পরিষ্কার, মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে প্রেরণায়, রুজি-রোজগারের ধান্দায়, আবার কখনও বা বাস্তব জীবনের ঘটনাপঞ্জি লিখে রাখবার ইচ্ছায়। (অনেক আত্মজীবনী শেষোক্ত ভাবে সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রথম দুটি কারণের ব্যাখ্যা না করলেও চলে।)

কথাটা উঠছে কারণ অনেকরকম সাহিত্য যখন বাজারে বেরিয়েছে, যেমন অনুবাদ সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য, সঙ্গীত সাহিত্য, মায় অশ্লীল সাহিত্য, তখন বিজ্ঞাপন সাহিত্য নয় কেন ?

কথাটা আরও উঠেছে সাম্প্রতিককালে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি (সি, এম, ডি, এ), মেট্রো রেল ইত্যাদি কয়েকটি সংস্থার ভিন্ন স্বাদের বিজ্ঞাপনের জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে এই দুটি সংস্থাকে অনেকে পথিকৃত বললেও সি, এম, ডি, এ-র প্রচার অধিকর্তা হিসাবে আমি সসম্মানে এবং সজ্ঞানে সেই বিশেষণ প্রত্যাখ্যান করবো। কারণ যাঁরা সিগনেট প্রেস আমলের বিজ্ঞাপন (শ্রী ডি, কে, গুপ্ত) স্মরণে রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন পাঠককে টানতে সেগুলি কতখানি উপযুক্ত, মনোগ্রাহী এবং মননশীল। কিছুদিন আগেও কলকাতা কর্পোরেশন (শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দারের আমলে) "পথ তুমি কার" ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। এইগুলি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য কি না সে বিচার সাহিত্যিক আর সমালোচকরাই করবেন। যেমন তাঁরা করে থাকেন অন্যান্য ক্ষেত্রে। তবে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলির, (অন্তত সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপন সম্পর্কে) একটা কথাই বলা যায়। সেটা হলো ভাষাটা সাধারণ মানুষের, ভাবটা কলকাতার লোকের পছন্দসই এবং বিজ্ঞাপনের যেটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভাবনার সৃষ্টি, সেটা বিদ্যমান।

আমাদের সাধারণ বিজ্ঞাপন-দাতাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অথবা অবাস্তব কিন্তু লোভনীয় ছবি দিয়ে মনকে টানা এবং অনেক সময় প্রচুর পয়সা খরচ করে প্রচুর জায়গা জুড়ে মানুষের সংস্কারগুলিকে খুঁচিয়ে নিজের নিজের জিনিষ বিক্রি করবার চেষ্টা। সেইজন্য অনেক সময় জুতোর বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয় মাথার চুল থেকে অথবা মহিলাদের বক্ষদেশ থেকে।

তাঁদের জিনিষ বিক্রী করতে হবে, কি ভাবে করবেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাল জানেন কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অত সহজে গড়া যায় না। মিথ্যা

কথা বলে, অতিরঞ্জিত করে বা অবান্তর কথা বলে কোন প্রতিষ্ঠানই চিরস্থায়ী সুনাম কিনতে পারেন না।

সি, এম, ডি, এ-র কাজের একটি সুবিধা হল যে এই প্রতিষ্ঠানের সুনামের চেয়ে, এর কর্মক্ষেত্রের (অর্থাৎ কলকাতা মহানগরীর) সুনাম বা দুর্নাম অনেক বেশী জরুরী। অন্তত আমাদের কাছে।

কাজেই বিজ্ঞাপনের ধারায় কলকাতা সম্বন্ধেই বেশী কথা থাকে, সি, এম, ডি, এ-র সম্বন্ধে নয় অর্থাৎ কলকাতা যদি ভাল হয় তাহলেই সি, এম, ডি, এ-র ভাল। কলকাতার সুনাম যদি হয় তাহলেই সি, এম, ডি, এ-র সুনাম। এইভাবে প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটিয়ে কাজের কথা বলে সি, এম, ডি, এ অনেক সময় অনেক মানুষের সহানুভূতি পেয়েছেন।

আর একটা জিনিষ। লোকে কাগজ কেনেন খবর পড়বার জন্য। বিজ্ঞাপন পড়বার জন্য কেউ কাগজ কেনেন না। কাজেই খবরের আকারে বিজ্ঞাপন যদি প্রকাশ হয় তাহলে লোকে ভুল করেই হোক অথবা জেনেই হোক সেটিকে খবরের মতন করেই পড়েন। কেননা খবর পড়বার জন্যই কাগজ কেনা। অবশ্য পরে যখন তাঁরা দেখেন যে এটা বিজ্ঞাপন, খবর নয়, তখন তাঁদের কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি হলেও সেটা যথেষ্ট বিলম্বে ঘটবে অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি ততক্ষণে তাঁর পড়া হয়ে গেছে। এটা অনুচিত নয় কারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অন্যান্য বিজ্ঞাপনদাতারা যখন অনেকরকম ছল চাতুরীর আশ্রয় নেন, তখন সি, এম, ডি, এ নিজেদের বক্তব্যটাই খবর আকারে প্রকাশ করেন এবং সেটা দোষণীয় নয়।

এর পরে হয়ত ভাষার কথা আসে। কলকাতার লোকের মুখের ভাষা এবং মনের ভাষা প্রায় একই-রকম। তাতে একদিকে যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপ থাকে, অন্যদিকে থাকে রঙ্গ তামাশা আর সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাও কিছু কিছু নিশ্চয়ই থাকে। সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপনের ভাষাও কলকাতার লোকের মুখ এবং মন থেকে নেওয়া। এখানে "প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া" বলা হয় না। বলা হয় "পেচ্ছাব করা"। এখানে বলা হয়নি আপনারা "অনুগ্রহপূর্বক" চিন্তা করবেন। এখানে বলা হয় "একটু ভেবে দেখুন তো"। তাছাড়া কলকাতার লোক যে সি, এম, ডি, এ-কে অথবা অন্য কোন সংস্থাকে মাথায় তুলে নাচবেন এই আশা বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞাপনের কপি লেখা হয়।

আমরা সবাই জানি কলকাতার লোকের কত অসুবিধা। তার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অসুবিধা নিশ্চয়ই কিছু বাড়ে। কাজেই কলকাতার লোকেরা যে

সমালোচনা করেন সেটা মিথ্যা নয়। যেমন সি, এম, ডি, এ-র কাজের ফলে অনেক অসুবিধা হয়, তেমনি সি, এম, ডি, এ-র কাজ দীর্ঘমেয়াদী (১৮ মাসে বছর), যেমন সি, এম, ডি, এ-র কাজের চেয়ে অকাজ বেশী করে। কলকাতার লোকের যে এই ধারণা এগুলি একেবারে অসত্য হলে অন্য কথা ছিল—কিন্তু কিছুটা সত্য বলেই সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপনে প্রথমেই অনেকগুলি জিনিষ সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কাজেই লোকে যখন সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপন পড়েন এবং দেখেন যে তাঁদের যে সমালোচনা সেটা সি, এম, ডি, এ-র কানে ঢুকেছে তখন তাঁদের মনটা একটু নরম হয়। তাঁরা ভাবেন, অন্ততঃ এরা আমাদের কথাটা বুঝেছে। তখন কলকাতার লোকের সঙ্গে সি, এম, ডি, এ-র একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া হয়ে যায় মনের দিক দিয়ে।

তেমনিভাবে সি, এম, ডি, এ যখন কলকাতার নাগরিকদের কিছু কিছু বদ অভ্যাস (রাস্তায় ২৪ ঘণ্টা জঞ্জাল ফেলা, থুথু ফেলা, পেচ্ছাব করা, জলের অপচয় করা ইত্যাদি) নিয়ে মন্তব্য করেন, তখন কলকাতার লোক একটু দরাজ ভাবে সেগুলি স্বীকার করে নেন। কারণ সি, এম, ডি, এ ও অনুরূপভাবে অর্থাৎ দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের ত্রুটি আগেই মেনে নিয়েছেন।

সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপনের আর একটি লক্ষ্য হল ছেলেমেয়েরা। তাঁদের উদ্দেশ্য করে যে সব কথা বলা হয় (এবং তাদের ভাষায় অথবা তাদের আঁকা ছবিতে) সেগুলি পড়ে বহু ছেলেমেয়ে যে কলকাতা সম্বন্ধে আগ্রহী হয় তার প্রমাণ জন সংযোগ দপ্তরের পাওয়া চিঠিগুলি।

সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপন কিন্তু বিজ্ঞাপন-পণ্ডিতদের মতে বিজ্ঞাপনই নয়, আবার ভাষা-পণ্ডিতদের মতে যে ভাষায় এগুলি লেখা হয়, সেগুলি কোন ভাষাই নয়।

কাজেই এটা বিজ্ঞাপন সাহিত্য কি না সে বিচারের ভারটা সমালোচক ও সাহিত্যিকদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এককালে টেকচাঁদ ঠাকুরকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে, কথা শুনবার জন্য আমরাও প্রস্তুত।

নতুন কিছু করা হয়েছে কি না সে প্রসঙ্গ অবান্তর। যা করা হয়েছে তাতে লোকের মনে দাগ কাটছে কি না সেটাই বিচার্য।

সেদিন একটা সমীক্ষায় দেখছিলাম যে সি, এম, ডি, এ উঠে গেলে শতকরা ৬৭টি ভাগ লোক অখুশী হবেন। এটা কম বড় সার্টিফিকেট নয়। বলতে কি বিজ্ঞাপনগুলি "সাহিত্যিক" এই সার্টিফিকেটের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশী।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতারা এই জিনিষটাই ভুলে যাই। চটকদার ছবি বা কথার মাধ্যমে আমরা কি লোকদের ভুল বোঝাচ্ছি? তা যদি হয়, তাহলে বিজ্ঞাপনের থিয়োরী কপচাতে হয়—

"Package is no substitute for product......"

সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপনে যদি সত্য এবং সততা থাকে, তাহলেই যথেষ্ট। অবশ্য কলকাতার মানুষের মুখ আর মনের ভাষা দিয়ে সমকালীন কলকাতার ছবি, দিন আর জীবনপঞ্জী যদি বিজ্ঞাপনে ফুটে ওঠে,—এবং সমালোচকরা যদি মনে করেন যে বিজ্ঞাপনটি সাহিত্যের পর্যায়ে এসে পড়েছে,—তাহলে সেটা উপরি লাভ। আর যদি কেউ মনে করেন, ফড়িং আবার পাখী, বিজ্ঞাপন আবার সাহিত্য, তাহলে সেটাও আমরা মেনে নেবো। তবে ভাষা, ভাব এবং ভাবনা যদি সাহিত্যের উপকরণ হয়, তাহলে······

অজ্ঞাত

আশাপূর্ণা দেবী

মায়ের ঘরের বড় আর্শীটার সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্ত একটা ছোট্ট চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। অথবা বলা যায় আঁচডাবার চেষ্টা করছিল। তার মাথায় চুলের যা চাপ তাতে দাঁত বসাবার মত ধার ওই ক্ষুদে চিরুণীটার নেই। অতএব প্রবল চেষ্টাতেও গায়ে হাত বুলোনোর মত ভেসে যাচ্ছিল।

লোডশেডিং চলছে, সন্ধ্যা আসন্ন, সুজাতা মোমবাতি নিতে ঘরে ঢুকে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওটা কী হচ্ছে? 'তোর' চুলে ঐ চিরুণী? ভেঙে যাবে যে।

সুমন্ত একই ভাবে হাত চালাতে চালাতে, অগ্রাহ্যের গলায় বলল, তোমার চিরুণী নেওয়া হয়নি।

সুজাতা ভুরু কোঁচকালো।

চমৎকার! খুব ম্যানার্স শেখা হচ্ছে।

সুমন্তদের স্কুলে 'ম্যানার্স' সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখা হয়, এবং সুমন্ত নাকি বছর বছর তাতে সার্টিফিকেটও পায়।···কিন্তু স্কুলের ব্যবহার স্কুলে। তাকে যদি বাড়িতেও নিয়ে আসতে হয়, পেরে উঠবে কেন? হাত পা খেলাবার জন্যে 'খোলা মাঠে'র দরকার থাকবে না? বাড়িই তো সেই 'খোলা মাঠ'।

সুমন্ত মায়ের থেকেও অধিকভাবে ভুরু জোড়া কুঁচকে একবার মায়ের দিকে তাকাল, কথা বলল না। সেই একই কাজ করতে লাগল।

আজকাল এক বাহাদুরী হয়েছে সুমন্তর। এগারো ক্লাশে উঠে পর্যন্তই হয়েছে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করে মা বাপকে অবজ্ঞা দেখানো।

বাহাদুরী দেখানো ছাড়া আর কী?

যেন মস্ত একটা লায়েক হয়ে গেছি আমি।

সুজাতা অন্ততঃ তাই ভাবে। কিন্তু শ্রীমন্ত মৃদু হেসে বলে, তুমি আর শাক দিয়ে মাছ ঢেকোনা সুজাতা। 'বাহাদুরী দেখানো' নয়। স্রেফ লায়েক হয়ে ওঠাই। দেখো তোমার ওই পুত্তুরটি ক্রমশঃ কী মূর্তি ধরে।

এ রকম সময় অবশ্য 'তোমার' পুত্তুর বলাই বিধি। তা এ রকম সময় আজকাল প্রায়ই ঘটছে।

সুমন্ত যেন অগ্রাহ্য করবো বলেই অগ্রাহ্য করছে। তাই ছেলের ওই ভুরু কোঁচকানো আর কথা না বলা দেখে গা জ্বলে গেল সুজাতার। এবং হঠাৎ মাতৃ অধিকারের শক্তিটা প্রয়োগ করতেই বোধহয় জোর গলায় বলল, বেরোচ্ছিস কোথায় শুনি ?

বেরোচ্ছে, এটা সাজ সজ্জাতেই মালুম। এ যুগের এরা সদাসর্বদাই 'পেণ্টুলধারী' বটে, এবং সেটা টেরিকট টেরিলিন জাতীয়ই বটে, তথাপি চাকচীক্যেব তারতম্য আছে।

সুমন্ত এখন চিরুণীখানাকে প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলে, ধীরে সুস্থে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কোনো একদিকে নিশ্চয়! কেন? কিছু আনতে হবে ?

এই একটা ব্যাপারে অবশ্য সুমন্ত এখনো এক পায়ে খাড়া। কিছু কেনা-কাটার ব্যাপারে। আট দশ বছব বয়েস থেকে ছেলেকে হরদম দোকানে পাঠিয়ে পাঠিয়ে, আর তাকে সন্তুষ্ট রাখতে 'বাকি পয়সাটা তুই নিয়ে নে'—বলে বলে, ছেলের এই নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছে সুজাতা।

এখন অবশ্য আর বলাবলির প্রশ্ন নেই। বাকিটা সুমন্ত নিজেই নির্দ্বিধায় প্যাণ্টের পকেটেই রেখে দেয় রুমাল চিরুণী ডটপেনদের সঙ্গে। দৈবাৎ সুজাতা 'বাকি পয়সার' হিসেব চাইলে ব্যঙ্গ হাসি হাসে, ও বাবা! তোমার যে দেখছি বেশ উন্নতি হচ্ছে। পাই পয়সাটির পর্যন্ত হিসেব করতে শিখেছ। তবে বাবা এবার থেকে যা দরকার হবে তোমাব ওই তারাপদকে আনতে দিও মা, আমার অতো হিসেব টিসেব রাখা আসে না।

তা না এলেও সুজাতা তো আর সত্যিই নিজস্ব দরকারের জন্যে তারাপদকে ধরতে পারে না। একখানা সাবান কিনতে, তারাপদ কমপক্ষেও পঁচিশটা পয়সা 'কমিশন' রাখে। অতএব সুমই রাখুক।

তবে এখন সুজাতা কঠিন কঠিন গলায় বলল, না! আনতে কিছু হবেনা। জানতে হবে ?

জানতে হবে ? মানে ? কী জানতে হবে ?

মানে, এই সন্ধ্যের মুখে লোড্‌শেডিঙের মধ্যে আর আকাশের মেঘের ঘটার সময়, যাচ্ছিস কোথায় সেটাই জানতে হবে।

সুমন্ত পা-টা একটু ঠুকল।

কেন? আমি কি হাজতের আসামী, যে সব সময় নজরবন্দী রাখবে? এক পা বেরোলে বলে যেতে হবে?

বাঃ! চমৎকার বোলচাল শেখা হচ্ছে দেখছি। তোর বাবা এখনো কোথাও বেরোলে বলে বেরোয় দেখিস না?

বাবা? শ্লেভ্ মেণ্টালিটি।

বলে সুমন্ত তরতরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

কিন্তু মায়ের মত বেহায়া জাত আর কে আছে? তাই সুজাতাও সঙ্গে সঙ্গে দু'চার সিঁড়ি নেমে আসে। ছেলের এতক্ষণকার কথাগুলো 'অমৃতং বালভাষিতং' হিসেবে ধবে। চেঁচিয়ে বলে, বেশী দেবী করবিনা কিন্তু। দারুণ বিষ্টি আসছে বলে রাখছি।

কথার জবাব অবশ্য পায় না।

ঘুরে এসে রাস্তাব ধারের বারান্দাটায় দাঁড়ায় সুজাতা, তাকিয়ে দেখে। এবই মধ্যেই প্রায় মোড পর্যন্ত চলে গেছে সুমন্ত। চটপট্ হেঁটে যাচ্ছে। নেহাৎ হাঁটার ভঙ্গীটা পবিচিত বলেই বোঝা যাচ্ছে, নইলে দূর থেকে আরো চলমান লোকের সঙ্গে এখন আর চেনবার কথা নয়। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে, তাছাডা চন্দ্র সূর্যেব অমোঘ নিয়মেব মত লোড্‌শেডিং তো রয়েইছে।

হাঁটার ওই ভঙ্গীটা থেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে সুজাতা, ছেলেটার গতিভঙ্গীটা ঠিক বাপের মত। এই বয়েসেই বাপের সমান লম্বা হয়ে গেছে।··· দেখে আহ্লাদই হবার কথা, তবু সুজাতার যেন একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস পড়ল। বড তাড়াতাডি বড় হয়ে গেল ছেলেটা।

ঘরে চলে এসে আগাম সমাধান হিসেবে জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবল, বাপের মত আকৃতিটা পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতিটা পাচ্ছে কই?

ভাবল।

যদিও শ্রীমন্তর 'প্রকৃতি'র খুঁৎ ধরতে ধরতে চিরদিনই সুজাতা সমালোচনায় মুখর। কিন্তু সে আর কোন্ স্ত্রীই বা নয়? বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের স্ত্রীও উঠতে বসতেই স্বামীর 'বোকামী' দেখতে পায়। ওটা কিছু না।

সুজাতা মনে মনে তো বোঝে শ্রীমন্তর মধ্যে কত শান্ত সভ্য—নির্বিরোধী ভাব, কত সহানুভূতিশীল মন। কাউকে উঁচু কথাটি বলতে জানেনা।

এইতো নতুন নায়েক হয়ে ওঠার বাহাদুরীতে ছেলে শুধু মাকে কেন,

বাপকেও অবলীলায় 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব দেখিয়ে গৌরববোধ করে। হঠাৎ হঠাৎ ভয় হয় সুজাতার, ফট্ করে না ধাড়ি ছেলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় শ্রীমন্ত। কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেনা কথনো।

বড়জোর স্বগতঃ মন্তব্য করে সরে যায়, 'ভাল ভাল, শিক্ষাদীক্ষা ভালই হচ্ছে। 'ইংলিশ মিডিয়াম'তো।

এই ব্যঙ্গটুকু ছেলের থেকে ছেলের মাকেই।

বছর চারেক বয়েসে ছেলেকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল শ্রীমন্ত। যে স্কুলে নিজে পড়ে বড় হয়েছে।

অনামী-অদামী পাড়ার ইস্কুল বলে সুজাতা একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল, কিন্তু দাবড়ানি পেয়েছিল ওপরওলার কাছে। কারণ তিনি তখনো বেঁচে, এবং দিব্যি ডাঁটো। শুধু ডাঁটো নয়, দাপুটে মহিলা।

তিনি সতেজে বলেছিলেন, কেন? পাড়ার ইস্কুল বলে এতো অছেদ্দা কেন? ওই ইস্কুলে পড়ে 'মন্ত' কি আমার অমানুষ হয়েছে? তোমার ছেলে যদি আমার ছেলের মত হয়, বর্তে যেও বাছা।'

তবু বছর দুই পরে থেকেই সুজাতা 'ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম' করে এমন পাগল হতে থাকলো, যে ভদ্র মহিলা নিজেই বললেন, 'ওরে মন্ত দে বাবা, ছেলেকে ইংরিজি ইস্কুলেই ভর্তি করে দে। বৌমার যখন এতো ভয় ভাবনা বাংলা ইস্কুলে পড়লে ছেলে বিলেত আমেরিকায় যেতে পাবে না, দিল্লী বোম্বাইয়ের চাকরী পাবে না তখন কেন আর বাদ সাধা? শেষে হয়তো পরে তোকেই দুষবে, মা বুড়ির প্ররোচনায় পড়ে, আমার ছেলেটার পরকাল খেয়ে রেখেছ তুমি।

এমনি চোস্ত সতেজ কথাবার্তা ছিল মহিলার। রেখে ঢেকে বলার ধার ধারতেন না। সেই মায়ের আওতায় মানুষ হয়েই হয়তো শ্রীমন্তর প্রকৃতিতে এতো বাধ্যতা, নম্রতা। সেই আওতাতেই তো জীবনটা কাটলো? মহিলা মারা গেছেন তো মাত্র সেদিন। সুমন্ত ক্লাশ নাইনে উঠেছে তথন।

আড়ালে মায়েতে ছেলেতে শ্রীমন্তর 'মাতৃভক্তির' প্রাবল্য নিয়ে হাসাহাসি করেছে কত সময়।

সুজাতা বলতো 'ঠাকুমা' বলেছেন? ও বাবা! মাতৃভক্ত বিদ্যেসাগর ওর আর নড়চড় করতে পারেন?

সুমন্ত হাসতো হি হি করে।

আবার সুমন্ত বলতো, এইরে! সেরেছে! ঠাকুমা হাঁচলো ফ্যাচ্ করে। এক্ষুণি ডাক্তার বাড়ি ছুটবে বাবা।

সুজাতা হেসে গড়াতো।

মায়ের একটু অসুখ করলেই শ্রীমন্তর অস্থিরতা, সত্যি বাড়াবাড়িই মনে হতো। যেন এই এলো বুঝি মায়ের যাত্রা রথ। মা তাতে চড়ে পড়ল বুঝি।

কখনো কখনো সুজাতা ছেলের কাছে দুশ্চিন্তাও প্রকাশ করেছে, মা বাপ তো মানুষের চিরকাল থাকে না। তোর ঠাকুমা গেলে যে তোর বাবা কী করবে!

কিন্তু আশ্চর্য! মায়ের মৃত্যুতে কোনো অধীরতা দেখা গেলনা শ্রীমন্তর মধ্যে। বরং যেন আরো বেশী শান্ত হয়ে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে—যে মানুষ সাতজন্মে পুজো পাঠের দিকে যেত না, সেই মানুষ তদবধি দু'বেলা দু' ঘণ্টা ঠাকুর ঘরে কাটাচ্ছে।

কাটাচ্ছে অবশ্য 'মায়ের ঠাকুর ঘরের-সেবাইৎ' হিসেবেই।

অশৌচান্তের পরদিন থেকেই শ্রীমন্ত সকাল সন্ধ্যে উঠে যায় তিন তলার মায়ের ঠাকুর ঘরে মায়েরই একখানা পুরনো গরদের থান পরে। সেখানে কী করে আর না করে সুজাতা দেখতে যায়না, তবে পুজো করে যখন নেমে আসে, দেখা যায় ঠিক মায়ের মতই কপালে ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ, হাতে 'প্রসাদী' সন্দেশের ছোট্ট থালাটি। কখন যে সন্দেশ কিনে এনে জোগান রাখে কে জানে।

সুমন্ত এক একদিন হেসে হেসে বলে, বাবা নির্ঘাৎ একদিন বোষ্টম হয়ে যাবে মা, দেখো তুমি।

সুজাতা হেসে গড়ায়। বলে, যা বলেছিস।

ছেলের কথায় সায় দেওয়া তো সুজাতার চিরকালের স্বভাব। ওকে নিজের পক্ষে রাখতে হবে তো? না পারলে 'পৃষ্ঠবল' কোথায়? আর নিজপক্ষে পেতে হলে, তোয়াজী নীতি ধরাছাড়া উপায় কী? ভবিষ্যতের ভোটের সংস্থান রাখতে নেতাদের যা নীতি, সেই নীতি সংসারেও বলবৎ!

শ্রীমন্তকে তো সুজাতা কোনোদিনই 'নিজপক্ষ' করে তুলতে পারল না। সেই পরলোকগতা, মরে গিয়েও ছেলেকে নিজের দখলে রেখে দিয়েছেন।...অথচ কী বা বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল মহিলার। পড়তে জানতেন না তা নয়, কিন্তু জীবনে একখানা খবরের কাগজ হাতে করতে দেখা যেতনা। অথচ কৌতুহল ষোলো আনা। সকালে শ্রীমন্ত খবরের কাগজ খানা হাতে নিয়ে বসলেই কাছে এসে চেপে বসে বলতেন, আজ তোদের কাগজের কী খপর রে? বল একটু শুনি।

একেবারে গ্রাম্যই। আচার আচরণ ভাবভঙ্গী।...অথচ শ্রীমন্ত একেবারে মাতৃনামে তটস্থ। সব খবর পড়ে বোঝানো চাই।...অফিস থেকে ফিরেও প্রথমেই মায়ের ঘরে ঢুকে মার তত্ত্বার্তা নিয়ে শহরে নতুন কোনো খবর থাকলে সেটি পেশ করে, তবে নিজের ঘরে ঢোকার অভ্যাস।

সুজাতা বিদ্রূপ কটাক্ষ হেনে বলত মাঝে মাঝে, কী? খবর নেওয়া হল? প্রতিদিন জিগ্যেস করতে হবে, মা, কেমন আছো? আশ্চর্য ফর্মালিটি বাবা!

শ্রীমন্তর রাগ নেই। সেও হেসেই জবাব দিতো, তুমি বুড়ো হলে তোমার ছেলেও করবে জিগ্যেস।

আমার ছেলে অমন গাঁইয়া হবে না।

বলে ঝঙ্কার দিতো সুজাতা।

তা সত্য, সুজাতার ছেলে মোটেই গাঁইয়া হয়নি। সকালবেলা মায়ের বেদম জ্বর দেখে গিয়ে ভুলে মেরে দিয়ে, স্কুল ফেরত বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলে গেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। এবং বাপের কণ্ঠে সামান্য একটু অনুযোগের স্বর শুনেই অবহেলায় উত্তর দিয়েছে, তা আমি তো আর ডাক্তার নই, যে ফিরে এলেই জ্বর কমিয়ে দিতে পারতাম।

শ্রীমন্ত গাঁইয়া বলেই 'মা মা' বাতিক ছিল।

অথচ মা টি পান থেকে চুন খশলে বক্ষে রাখতেন না। বকুনির চোটে বাবার বিয়ে খুড়োর নাচন দেখিযে দিতেন। বুড়ো ছেলেকে বাচ্চাব মত বকাবকি করতেন।

শ্রীমন্তর ছোট বোন খুকুর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। অতএব এই ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে কম দূর নয়। তবু প্রতি সপ্তাহে খুকুর বাড়ি যেতেই হবে, আর বেশ কিছু ভেটও নিয়ে যেতে হবে। কোনো কারণে একটা সপ্তাহ বাদ গেলেই মহিলা অনায়াসে বলে উঠতেন, তোর যে একটা বাপমরা ছোটবোন আছে, সেঠা বোধহয় এবার ভুলতে চেষ্টা করছিস মন্তা? তো-মা-বেঁচে থাকতে তো ভুললে চলবে না।

শুনে সুজাতার রাগে গা নিসপিস করতো। দুটো হক কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করতো: কেন? লোকটার জীবনে কি আর কোনো কাজ থাকতে পারে না?

কিন্তু আশ্চর্য! শ্রীমন্ত রেগে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার বদলে, অপরাধের ভারে যেন নুয়ে পড়তো। আর পরদিনই বোনের প্রিয় খাদ্য বস্তু, গড়িয়াহাটার ডালমুট আমসত্ত শোনপাপড়ি নিয়ে ভবানীপুরে ছুটতো।

শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে যে এখনো সেই প্রতি হপ্তায় 'খুকুর বাড়ি যাওয়াটা' অব্যাহত রেখেছে শ্রীমন্ত।...সুজাতার দিদি বলে, দেখালো বটে তোর বর! সুজাতার অপ্রতিভ হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

একদিন সুজাতা বলে ফেলেছিল, এই তো গেলে সেদিন! যেতে হবে বলে বণ্ডে সই করা আছে না কি?

শ্রীমন্ত কিছু বলেনি। সুজাতার ছেলের মত ভুরুও কোঁচকায়নি। জুতোর ফিতে বেঁধে হাত ধুয়ে চলে গিয়েছিল।

আজও তো অফিস যাবার সময় বলে গেছে খুব সম্ভব খুকুর বাড়ি হয়ে আসবো। দেরী হলে ভা·বে না।...

সুজাতা মনে ঠিক রেখেছিল, 'খুব সম্ভব' মানেই নিশ্চয়।

কিন্তু এসেই গেল ঠিক সময়।

বলল্ বড্ড বৃষ্টি আসছে মনে হলো, তাই আর নামলাম না। টানা-চলেই এলাম।

এল। এসেই যথারীতি হাত মুখ ধুয়ে মায়ের পুবণো গরদ খানা জড়িয়ে সোজা তিনতলায় উঠে গেল।

কতদিন বলেছে সুজাতা, সাবাদিন পরে এসে একটু জিরিয়ে চা টুকু অন্তত গলায় ঢেলে তারপর যেওনা বাপু! সে টুকুতে আর তোমার মার পাথরের গোপাল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবেন না।

শ্রীমন্ত কখনো উত্তর দেয় না। কখনো বলে, কতক্ষণ আর লাগবে? কখনো হেসে বলে, সেটুকুতে মার এই রক্ত মাংসের গোপালটিও গলা শুকিয়ে কাঠ হবেনা।

অতএব আজও যথানিয়মেই উঠে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। যে মেঘটা এতোক্ষণ ধরে পাঁয়তাড়া কষছিল সে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ছে তো পড়ছেই, প্রচণ্ড বেগ বাড়ছে তো বাড়ছেই। ভয়ে যেন বুকটা থরথর করে ওঠে সুজাতার।

কিন্তু ভয়ের কী ছিল? যদি শ্রীমন্তও বাড়ি এসে যেতো।...বাড়ির লোকেরা যদি বাইরে না থাকে, দৈনন্দিনের কাজ যদি সমাধা হয়ে গিয়ে থাকে, এমন বেদম বৃষ্টির মত মজা আর কী আছে? সুজাতার তো খুব মজাই লাগে তেমন হলে।...কিন্তু আসল লোকটিই যে বাইরে। অতএব মজার বদলে সাজাই!

কী আশ্চর্য !

এতো বাজ, এতো বিদ্যুৎ, এতো জল কোথায় জমা ছিল ?…যত বাজের শব্দ হয় সুজাতার প্রাণ হু হু করে ওঠে।…রাগ হয় শ্রীমন্তর ওপর। আচ্ছা নিশ্চিন্ত মানুষ বটে ! দিব্যি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে ? ঠাকুর ঘরের পুরনো ছাতটাও তো ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছে।

আবার এও মনে হচ্ছে শ্রীমন্ত নেমে আসার আগে সুমন্ত এসে গেলেও যেন ভাল হয়। হয়তো বৃষ্টির মাঝখানেই খুঁজতে বেরোবে ছেলেকে। শব্দয়-শব্দ, মনে হচ্ছে যেন আজকেই পৃথিবীর শেষ দিন। এ দুর্যোগ প্রলয়ের সূচনা।

কিন্তু সুজাতার ভয় অমূলক। ছেলেকে খুঁজতে বেরোনোর প্রশ্নই নেই, গরদের থান ছেড়ে ধুতি গেঞ্জি পরতে পরতে শ্রীমন্ত 'অতীত' গলায় বলল, 'বাবু' বুঝি এখনো ফেরেননি ?

সুজাতা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, দেখো না ! যাবার সময় এতো করে বললাম, ভীষণ বৃষ্টি আসছে, দেরী করিসনি। তবু—

শ্রীমন্ত চায়ের টেবিলে এসে বসে ধীরে সুস্থে বলে—কখন বেরিয়েছে ?

সেইতো সন্ধ্যের আগে। এতোটুকু ছেলে এত কিসের আড্ডা ! তুমিও তো কিছু বলনা। মায়ের একশো কথায় যা-কাজ না হয়, বাপের একটা ধমকে তা হয়, বুঝলে ?

সুজাতার স্বর আরো রুষ্ট ক্ষুব্ধ উত্তেজিত।

এখন সুজাতার মনে পড়ে না, ছেলের ছেলেবেলা থেকে, 'ধমক' খাওয়ার উপযুক্ত ব্যাপারগুলোকে সুজাতা তার বাপ ঠাকুমার চোখ থেকে সামলে বেড়িয়েছে। 'হয় কে নয়' বলে আর 'নয়কে হয়' বলে দোষ চাপা দিয়ে দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছে।

শ্রীমন্ত অবশ্য এ অভিযোগের দিকে গেল না, চায়ের কাপটাকেই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠল, ধমক ? তোমার ওই 'হীরো' ছেলেকে আমি দেব ধমক ? সর্বনা-শ !

বলে আবার নিশ্চিন্তভাবে পেয়ালায় চুমুক দিল।

… …. … …

কড় কড় করে আবার বুক কাঁপানো-শব্দ। সুজাতা স্থির থাকতে পারেনা। বোকার মত ছুটে গিয়ে জানালা খুলে দেখতে যায়।

শ্রীমন্ত বলে ওঠে, ওটা কী হচ্ছে? পাগলামী করছো কেন? ঘরটা জলে ভেসে গেল যে!

ওঃ! ঘর ভাসাটাই বড় হল। আচ্ছা নিশ্চিন্ত মানুষ বটে! ছেলেটা রাস্তায় কোথায় কী করছে!

কী আশ্চর্য!

শ্রীমন্ত বলে, তুমি পাগল বলে সবাইতো আর পাগল নয়! এই সময় রাস্তায় কোথায় কী করবে? আছেই কোথাও বন্ধুর বাড়িটাড়ি! আটকে পড়েছে বোঝাই যাচ্ছে!

উঃ কী নিশ্চিন্ত, কী নিশ্চিন্ত।

সুজাতার মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে। আর এখন ইচ্ছে হচ্ছে ভয়ংকর একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরুক সুমন্ত। জব্দ হোক ওই লোকটা। আর তা যদি না হয়, ছেলেকেই নেবে একহাত।

ওকে কি আমি ভয় পাই?

নেহাৎ দুঃখিত হবে বলেই কিছু বলি না।

... ...

রাত বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ বৃষ্টি কমে।

থামে মেঘের ডাক, বিদ্যুৎ চমকানি, বাজের শব্দ।...শুধু ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি যেন জেরটা বজায় রেখে চলে।...

এখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে বাধা নেই। অতঃপর দেখা যায় একখানা রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে। এবং তার মধ্যে থেকে দিব্যি তড়াক করে নেমে পড়ল সুমন্ত। শুকনো গা মাথা। এখন লোডশেডিং নেই, রাস্তার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

... ...

কোথায় ছিল এতোক্ষণ?

কোথাও নয়, এই ঢাকুরিয়াতেই। খানিক দূরে সুধাময়দের বাড়ি।

সুজাতা এতোক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিল, ছেলে যদি ভিজে বিপর্যস্ত হয়ে ফেরে তো দেখিয়ে দেবে শ্রীমন্তকে। আর যদি শুকনো গায়ে মাথায় ফেরে তো দেখে নেবে তাকেই।

কিন্তু কী করে নেবে দেখে? কোন কথার পিঠে?

সুজাতা যখন বললো, এইখানে ছিলি তুই? আর আমি—

তখন ছেলে যদি বলে ওঠে, 'তা' তুমি যদি ভাবতে বসো আমি বাজ পড়ে মারা গেছি, বানের জলে ভেসে গেছি, কষ্ট তো পাবেই। আমি কি কচি খোকা, যে একটু বিষ্টি দেখেই একেবারে পাগল হয়ে গেলে!

তাহলে?

সুজাতার আর বকাব মুখ কোথায়?

তাই শুধু ভারী মুখে বলে—বুঝলাম, কচি খোকা নও, কিন্তু ধাতটি তো কচি খোকার মত। এই যে জোলো হাওয়াটি লাগিয়ে এলে বাবা, এক্ষুণি তো কাসতে শুরু করবে। তারপর সাতদিন গলায় ব্যথা।···বললিতো ভিজিসনি, কই দেখি মাথাটা! যা চুলের রাশ। মুছে দিই ঘসে ঘসে!

সুজাতা একখানা তোয়ালে টেনে নিয়ে ছেলেব মাথায় হাত দিয়ে দেখতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় মাব হাতটা ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে সুমন্ত, আঃ! ভেবেছ কী তুমি? সত্যি খোকা? বাড়াবাড়ির একটা সীমা রাখা উচিত বুঝলে?

ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

জামা না বদলেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

সুজাতা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওই ঝটকা মেরে ঠেলে দেওয়ার জন্যেই যে শুধু সুজাতার হাতটা ঝিনঝিন করছে, তা বুঝতে পাবেনা। মনে হয় ঝিনঝিন করছে মাথাটা। সর্ব শরীরটা।

শ্রীমন্ত একবার ওই স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর ছেলের ঘরের দরজায় এসে একটু হেসে বলে, কী রে? মায়ের ওপর রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়লি?

রাগ আবার কী?

সুমন্ত ওপাশ ফিরে বলল, সুধাময়ের মা ছাড়লেন না, জোর করে ওদের সঙ্গে খেতে বসিয়ে দিলেন, খিচুড়ি ডিমভাজা বেগুনী!

আরে ব্যস! তা হলে তো আজ তোর পোয়া বারো। কোনো ভাল লোকের মুখ দেখে উঠেছিলি বোধহয়।

সরে এল।

বলল, শুনলে তো? খিচুড়ি ডিমভাজা বেগুনী! আর তুমি কি না— যাক! বেচারী আমার! আমাদের সেই রুটি, তরকারি, ডাল নিয়ে বসিগে। রাত তো অনেক হলো।

খাবার টেবিলে এসে বসল শ্রীমন্ত।

এখন লোডশেডিং নেই। দালানের দু দিকে দুটো টিউব লাইটই জ্বলছে। খাবার টেবিলের সামনের দেওয়ালে উঁচুতে শ্রীমন্তর মায়ের যে মস্ত এনলার্জ ফটোখানা টাঙানো রয়েছে তার উপর আলো এসে পড়েছে।

খেতে বসে শ্রীমন্ত যথানিয়মে আগে সেই ছবিটার দিকে নীরব প্রণামের ভঙ্গীতে চোখ ফেলে, তারপর খাবারে হাত দেয়। এটাই নিত্যদিনের পদ্ধতি শ্রীমন্তর দু'বেলার। দেখা দৃশ্য।

তবু আজ কেন কে জানে এই দৃশ্যে সুজাতার মনের মধ্যে দারুণ একটা জ্বালা ধরে যায়, সেই উত্তাপেই বোধহয় ভিতরটা তোলপাড় করে দু'ঝলক গরম জল চোখের কোণ দিয়ে উপছে ওঠে।

ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলে থাকা ওই অতি সাধারণ চেহারার গ্রাম্য-স্বভাব মহিলাটির উপর ভয়ানক একটা ঈর্ষা অনুভব করে সুজাতা। ভেবে পায় না কোন শক্তির বলে দেওয়ালে ঝুলে থেকেও ছেলের সমস্ত হৃদয়টাকে মুঠোর মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায়।

নারায়ণ

[একাঙ্কিকা]

ডঃ মন্মথ রায় এম. এ., ডি. লিট

[১৯১০ সালের পরবর্তীকাল—যখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক। এই সময়ে কোন এক গভীর রাত্রে কলকাতার নির্জন গ্রীয়ার পার্কে তৎকালীন বিপ্লবী নায়ক পুলিন দাস এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহভাজন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার একটি বেঞ্চে বসিয়া কথোপকথনে রত]

পুলিন ॥ আচ্ছা, আমরা যখন এখানে এলাম তোমার কি মনে হয়েছিলো কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে ?

জ্ঞান ॥ না দাদা, সেদিকে আমার খুব লক্ষ্য ছিলো।

পুলিন ॥ হুঁ! আমরা বোধ হয় বেশ একটু আগে এসে পড়েছি।

জ্ঞান ॥ হ্যাঁ। শুধু দেখতে; জায়গাটা নিরাপদ কিনা।

পুলিন ॥ তা বেছে বেছে তুমি এই গ্রীয়ার পার্কে আমাদের আলাপ আলোচনার জায়গা করলে কেন ?

জ্ঞান ॥ তার কারণ এখানে আসাতে স্যারের বিশেষ কোনো কষ্ট হবে না। তাঁর বাসা এর খুব নিকটেই। আমাদের স্যার রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর এই পার্কে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন।

পুলিন ॥ বল কি ? আমি তো শুনেছি তোমাদের পি. সি রায় জানেন শুধু Presidency কলেজের ল্যাবরেটরী আর লাইব্রেরী। বাইরে তাঁকে বড় একটা দেখাই যায় না।

জ্ঞান ॥ কথাটা কতকটা সত্য, কতকটা নয়। ছাত্রদের সঙ্গে ওর মেলামেশা খুবই বেশী। মনে হয় আমরা যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। কর্তা পি. সি. রায়। কি ভালোই না আমাদের বাসেন।

পুলিন ॥ তোমাদের মতো ছাত্র হলে ভালো না বেসে উপায় কি জ্ঞান।

জ্ঞান ॥ পুলিন দা। আপনি দেখছি আমাদের ক্লাসের খবরও কিছু কিছু রাখেন।

পুলিন ॥ দেশে একটা বিপ্লব ঘটাতে চাইছি—আমরা। বৃটিশ শাসন উৎখাৎ করা আবেদন-নিবেদনের কর্ম নয়। সে যারা করছেন করুন, আমরা বিশ্বাস করি বুলেট আর বোমা দিয়ে চুরমার করতে হবে বৃটিশ শাসন। তার জন্যে গোপনে গড়ে তুলতে হবে আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা, আর তার জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক। তাই আমাদের দেশে বিজ্ঞানবিদ্ কারা তার পুরো খবর আমাদের রাখতেই হয় এবং রেখেছি।

জ্ঞান ॥ আমি আমার বন্ধুদের সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, যেমন নীলরতন ধর, জ্ঞান ঘোষ, মেঘনাদ সাহা। জেনে রাখুন শুধু আমার নয়, সকলেরই তীব্র ইচ্ছা দেশের এই মুক্তি সাধনায় অংশ নিতে।

পুলিন ॥ সে খবর আমরা রাখি। বোমা বারুদের একটা সত্যিকারের কারখানা গড়ে তুলতে না পারলে আমরা আর সুবিধা করতে পারছিনা। মাণিকতলাতে মুরারীপুকুরে এ চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু গোটা দেশের প্রয়োজন মেটাতে সে চেষ্টা যে কত দুর্বল ছিলো আজ তা তোমরা সকলেই জানো। একটা বড় রকমের কিছু আমাদের করতে হবে। আর তার একমাত্র ভরসা তোমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কিন্তু কই তিনি তো এখনও এলেন না।

জ্ঞান ॥ তিনি যখন আমাকে কথা দিয়েছেন আসবেন, তিনি আসবেনই পুলিনদা।

পুলিন ॥ সেটা আমি বিশ্বাস করি। অমন খাঁটী লোক দেশে কমই আছেন। একথাও জানি, পরাধীনতার জ্বালা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এই চাকরী করতে গিয়ে। সব চেয়ে বড় কথা তিনি দেশের স্বাধীনতা কামনা করেন মনে-প্রাণে। আমার ভয় কী জানো জ্ঞান?

জ্ঞান ॥ কি পুলিন দা?

পুলিন ॥ স্বাধীনতা কামনা করেন আজ দেশবাসী সকলেই। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই বিশ্বাস সে স্বাধীনতা এনে দেবে, আমাদের কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন করে, ভিক্ষের ঝুলিতে—যেটা আমরা একেবারেই বিশ্বাস করি না। তোমাদের আচার্যদেব যদি মনে করেন ঐ কংগ্রেসের মত ও পথটাই সত্য আর আমাদেরটা মিথ্যে—তয়

আমাদের সেখানেই। তাঁর মতটা কি, তার কি কোনো আভাস পেয়েছো জ্ঞান ?

জ্ঞান ॥ প্রচণ্ড স্বদেশী তিনি।

পুলিন ॥ তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের রাত্রির তপস্যায় যোগ দিতে পারেন, এ রকম আভাস তুমি কি পেয়েছ জ্ঞান ?

জ্ঞান ॥ না দাদা। তবে আমি যে মুহূর্তে তাকে বলেছি, বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করতে চান, মুহূর্তেই তাঁর মুখ চোখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তকাল কি ভাবলেন। নিচু গলায় আমায় বললেন, আনন্দের কথা। তার পরেই দিন ক্ষণ আর স্থান তিনিই বলে দিলেন। দেখলাম পুলিন দাসকে তিনি ভাল ভাবেই জানেন, আর—তা যখন জানেন, পুলিন দাস কি চাইবে তাও তিনি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আর তা বুঝেও যখন আসতে স্বীকার হয়েছেন, আপনি ধরে রাখুন, তাঁকে আপনারা পেয়েছেন।

পুলিন ॥ তুমি কি মনে কর, অতবড় সরকারী চাকুরী তিনি ছেড়ে দেবেন ?

জ্ঞান ॥ আমার তো মনে হচ্ছে দাদা, দেশের ডাকে তিনি সব কিছু ছাড়তে পারেন। কেন বলছি জানেন ? স্যারের ভিতরে স্বদেশের জন্য যে অনুরাগ হয়েছে, সেটা আজকের নয়, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি বি. এস. সি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডি-এস সি ডিগ্রী পান, কিন্তু অত পড়াশোনার চাপেও দেশকে তিনি ভোলেন নি। এডিনবরার যে পরীক্ষার ওপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেই বি. এসসি. পরীক্ষা দেবার সময়েই তিনি বিস্তর গবেষণা করে—রচনা করেছিলেন 'India Before and After the Mutiny'।

পুলিন ॥ জানি। সে প্রবন্ধ আমরা পড়েছি। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা। ছত্রে ছত্রে তাঁর স্বদেশানুরাগ ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু ওহে জ্ঞান মজুমদার, একটা জ্ঞান বোধহয় তোমার নেই।

জ্ঞান ॥ কি দাদা ?

পুলিন ॥ তখন ছিলেন তিনি ছাত্র। বে-পরোয়া। এখন তিনি অতবড়

সরকারী অধ্যাপক। বেঙ্গল-কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা, Mercurous Nitrite-এর বিখ্যাত আবিষ্কর্তা, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক C. I. E. উপাধিতে বিভূষিত, ডারহাম ইউনিভার্সিটির অনারারি ডি এস্ সি।

জ্ঞান॥ আপনি থামুন পুলিন দা। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার স্যারের সম্বন্ধে সবকিছু জানেন, শুধু জানেন না যে, যেটা তিনি কর্তব্য মনে করবেন তা তিনি করবেনই। আটকাতে পারবে না তাঁকে বৃত্তি বা উপাধি, কোন সম্মান বা স্বার্থ।

পুলিন। ঐ কে এদিকে আস্‌ছেন!

জ্ঞান॥ (দূরের আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া) না, না, স্যার নন। কিন্তু সাবধান!

পুলিন। স্পাই?

জ্ঞান। অসম্ভব নয়...কি গরম পড়েছে আজ দেখেছেন? প্রাণ আইঢাই করছে।

[আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক। তা যা বলেছেন। পাগল করে দেবার মতন গরম। ঘরে তিষ্ঠুতে না পেরে চলে এলাম পার্কে। এখানে তবু একটু হাওয়া আছে।

জ্ঞান॥ তা আছে বটে, কিন্তু এ পার্কটায় বিপদ এই, গরমকালে এখানে মাঝে মাঝে সাপ বেরিয়ে পড়ে। এই তো আমি আস্‌তেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি নাকি ঐ গাছপালাগুলোর কাছেই সাপেরই না যেন কিসের একটা আওয়াজ শুনে পালিয়ে গেলেন।

আগন্তুক॥ তা' আপনারা যখন রয়েছেন, তবে তো মশাই আপনারা সাহসী লোক। সেই সাহসেই আমিও আপনাদের পাশে একটু বসি। তাতে আপনাদেরও লাভ। আপনাদের হাতে লাঠি নেই, আমার হাতে আছে। (পুলিন দাসের পাশে একরূপ জোর করিয়াই বসিল।)

জ্ঞান। (চটিয়া গিয়া) আপনার মতলবটা কি?

আগন্তুক॥ সেটা আপনি বুঝবেন না স্যার। বুঝবেন ইনি (পুলিন দাসকে নিম্নস্বরে) জল।

পুলিন। হ্যাঁ, জল। সাফ না ঘোলা?

আগন্তুক ॥ সাপ।

পুলিন ॥ (আগন্তুককে) তুমি বাইরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকো। কোন ঘোড়া দেখলেই খবর দিয়ে যেও।

আগন্তুক ॥ (উঠিয়া জ্ঞানকে) আচ্ছা চলি, নমস্কার! তা' আপনারা হাওয়া খান, আমিও হাওয়া হই!

(আগন্তুক চলিয়া গেল)

জ্ঞান ॥ দলের? পাহারা বুঝি!

পুলিন ॥ চুপ! দেখতো উনি কিনা!

জ্ঞান ॥ হ্যাঁ দাদা। স্যার এসে গেছেন।

[প্রফুল্লচন্দ্র ইহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞান ও পুলিন দাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রফুল্লচন্দ্র পুলিন দাসের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ তাঁহাকে একটি ঘুঁষি মারিলেন]

জ্ঞান ॥ (ক্ষণব্যস্ত হইয়া পুলিন দাসকে) না; না, ওটা ওঁর স্নেহ।

পুলিন ॥ জানি। তোমার ভয় নাই জ্ঞান। উল্টো ঘুঁষি আমি মারবো না।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ শুনেছি লাঠি খেলার মাষ্টার। না, শরীরটা বেশ মজবুত। আমাকে লাঠি খেলা শেখাতে পারো হে? কিন্তু তোমার লাঠি কই? দেখছি না তো?

পুলিন ॥ লাঠিটা আর একজনের হাতে রয়েছে, পার্কের বাইরে।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ ও, হ্যাঁ। একটা লোককে দেখলাম। লাঠি উঁচিয়ে কি যেন দেখছিলো।

পুলিন ॥ একটা সাপ-টাপ খুঁজছে বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ সাদা সাপ?

পুলিন ॥ (হাসিয়া) যা বলেছেন স্যার। সাংঘাতিক। লাঠিতে মরে না।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ বোমা-বুলেটেই বা কটা মরছে?

পুলিন ॥ যে পরিমাণ বোমা-বুলেট দরকার, তা আমরা পাচ্ছি না স্যার! একটা কারখানা দরকার।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কেন, কারখানা তো তোমরা করেছিলে!

পুলিন ॥ কিন্তু যাঁরা করেছেন, তাঁদের আগ্রহটা বেশি, জ্ঞানটা কম। তাই ফলটা তেমন ফলছে না।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ হুঁ।

পুলিন ॥ এখন আপনিই ভরসা।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ ফ্রান্সের কথা মনে পড়ছে। বিপ্লবীরা হেরে যাচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার কার্নো আবিষ্কার করে বসলো বুাহ রচনার একটি নতুন প্রণালী। রাজার সৈন্যদের গতিরোধ হলো।

জ্ঞান ॥ আপনার মুখে এত শুনেছি স্যার, ফ্রান্সের শত্রুরা ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করবার জন্যে বিদেশ থেকে শোরার আমদানী করলো—

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ (জ্ঞানকে একটা ঘুঁষি মারিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর মনে আছে দেখছি। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকরা গোবর, চোনা, মলমূত্র এসব থেকে তৈরী করলো শোরা, রক্ষা পেল ফ্রান্স।

পুলিন ॥ কাজেই বৈজ্ঞানিকরাই আজ আমাদের ভরসা।

প্রফুল্লচন্দ্র। হুঁ! মহাভারতের সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। কৃষ্ণের সেই জিজ্ঞাসা—নারায়ণ চাও না, নারায়ণী সৈন্য চাও? নারায়ণকে যদি চাও নতুন সৈন্য তৈরী হবে না। খুব ভালো করে বুঝে উত্তর দাও পুলিন।

পুলিন। হু, আমরা সৈন্যই চাই। নারায়ণ ল্যাবরেটারিতে থাকুন। তৈরী করুন নতুন নতুন মেঘনাদ, দেশকে দিন নতুন নতুন জ্ঞান।

প্রফুল্লচন্দ্র। (পুলিন দাসকে এক ঘুষি মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বেশ, এ ভার আমি নিলাম। (জ্ঞানকে আর এক ঘুষি মারিয়া) কিরে, বোমা তৈরী করতে পারবি?

জ্ঞান ॥ হাতে কলমে এখনো করিনি, কিন্তু Theoryটা পড়েছি।

প্রফুল্লচন্দ্র। কোথায়? কোন বইয়ে?

জ্ঞান ॥ কেন, Nitro Explosives বইখানা—

প্রফুল্লচন্দ্র। এ বই তুই কোথায় পেলি? এ বই তো বাজারে পাওয়া যায় না! প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীতে একটা আছে বটে!

জ্ঞান ॥ সেটা আমি পড়তে এনেছি। আমার কাছেই আছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কবে এনেছিস?

জ্ঞান। মাস তিনেক আগে।

প্রফুল্লচন্দ্র। (বিস্ময়ে) মাস তিনেক আগে? এখনো তুই ফেরৎ দিসনি?

জ্ঞান ॥ বাজারে এটা পাওয়া যায় না। খুব Rare বই স্যার, তাই—

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ এ বই কালই ফেরৎ দিবি।

জ্ঞান ॥ (নীরব রহিল)

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কি ভাবছিস ? কথা বলছিস না যে ? তোর মতলবটা কি ? বাঃ তবু চুপ। গ্যাডাফাই ?

জ্ঞান ॥ (মাথা চুলকাইতে লাগিল)

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ না, না, চুরি চামারি করে, ফাঁকি দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের পথেও চাই সাধুতা। বিবেকানন্দ বলেছেন, চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। ঠিক বলেছেন। চোরেরা চুরি করে, ডাকাতরা ডাকাতি করে কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা সাধু। (পুলিনকে) তোমরা যদি আমার এই কথা মানো, আমি আছি। যদি না মানো, আমি নেই। আচ্ছা, চলি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।]

পুলিন ॥ বইটা কালই ফেরৎ দিও হে !

জ্ঞান ॥ প্রাণ গেলেও তা পারবো না। আপনি ভাববেন না। যে কাজ-পাগলা লোক, বইয়ের কথা—উনি কালই ভুলে যাবেন।

পুলিন ॥ দিনটা আমার সার্থক। ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

জ্ঞান ॥ ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

অপ্রকাশিত পত্র

(ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তকে লিখিত)

রাজশেখর বসুর পত্র

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা

প্রীতিভাজনেষু ৭ জুলাই ১৯৪৮

কালীকিঙ্কর বাবু, আপনার প্রেরিত মীরা কবিতা যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল, মাপ করবেন।

আমি কবিতার সমঝদার নই, তবু আপনার 'মীরা' আমার ভাল লেগেছে। আশা করি আপনার হাত থেকে এই রকম লেখা আরও অনেক বের হবে।

শুভার্থী

রাজশেখর বসু

কবি মোহিতলাল মজুমদারের পত্র

কৈলাশচন্দ্র ঘোষ রোড,

বরিষা পোঃ ২৪ পরগণা

১৮.৬. ১৯৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অনেকদিন আর চিঠিপত্র দেওয়া নেই। আমিও প্রায় দুই মাস যাবৎ নূতন কাজটি নিয়ে (বঙ্গদর্শন সম্পাদনা) কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়েছি। তার উপরে এবারে পুরানো Bronchitis-টা বড় বেড়েছে। কয়দিন প্রায় শয্যা নিয়েছিলাম। এখন একটু ভালো, কিন্তু বড় দুর্বল।

আজ আপনাকে মনে পড়ল একটা বিপদে পড়ে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্যিক আর কাউকে মনে পড়ছে না, সম্ভবত নেই—অন্ততঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাই আপনাকেই কয়টা শাস্ত্রীয় reference-এর জন্ম ধরছি। ব্যাপার এই-যে, আমি একটি অতিশয় অনধিকার চর্চ্চায় অনেক দিন থেকে প্রবৃত্ত আছি। ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' আমি edit করছি। কাজটা কিছুদিন বন্ধ হয়েছিল, Text ছাপা হয়ে গেছে, এখন টীকা-অংশ বাকি আছে, তাও এক রকম করে শেষ করেছি। প্রেস বড় তাগাদা দিচ্ছে। আমি

দুইজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে ইতিপূর্বে ধরেছিলাম ঐ reference-এর জন্য, কারণ chapter and verse নির্দেশ করে দিলে ভাল হয়। আমার তো সে শক্তি নেই। যা আমার বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কুলোয় সেই রকম একটা commentary খাড়া করেছি। কিন্তু কয়েকটা reference কিছুতেই ঠিক করতে পারছিনে। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তবেই উদ্ধার হই। কিন্তু একটু শীঘ্র চাই। পারবেন কি? এই কয়টি হলেই হবে—

(১) "কৌষিতকী গ্রন্থে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন—'মামেব বিজানীহি'। প্রতর্দ্দনের ভ্রম হইল।" এইখানে মূলের একটু reference দিলে ভাল হয়—খুব সংক্ষেপে।

(২) স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—মূল রচনাটি কি এবং কোথায়?

(৩) কেবলং শুদ্ধং অভয়ং অকারং অব্রণং অস্নাবিরং অপাপপুণ্যবিদ্ধং ইত্যাদি—ইহা কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে? বিশেষণগুলি বৈদান্তিক 'আমি'-র। 'অস্নাবিরং' অর্থ কি?

(৪) 'আত্মাপ্রত্যক্' এখানে 'প্রত্যক্' শব্দের অর্থ কি হইবে?

(৫) 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' ইহার context সংক্ষেপে কি হইবে? শ্বেতকেতুর উপাখ্যান বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য দুই উপনিষদেই আছে। এই বাক্য ছান্দোগ্য হইতে উদ্ধৃত হয়। chapter ও verse চাই।

(৬) "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—ইহার মূল কি?

(৭) "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইহারও chapter এবং verse চাই।

এই কয়টিতে ঠেকিয়াছি, তার কারণ এ সকল বিষয়ে কোন পাণ্ডিত্যই নাই। এখন আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। মুস্কিল আসান করিলে বড়ই উপকার হয়।

আশা করি আপনি ও পরিবারবর্গ কুশলে আছেন। কলিকাতার তাণ্ডব এখন একটু কমিয়াছে শুনিতেছি; যদিও এবারকার এই অতিশয় অতর্কিত আক্রমণে আমার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছে, হয়ত পরে অনেক দুঃসংবাদ পাইব।

শ্রীমান সরোজভায়ার* খবর কি? 'বর্তমান'** দ্বিতীয় সংখ্যা এইবার বোধহয় বাহির হইবে বা হইয়াছে। আমি আর কোন সংবাদ পাইনি। তাঁহাকে

* ঔপন্যাসিক-সরোজকুমার রায়চৌধুরী

** সরোজবাবু ঐ সময় 'বর্তমান' নামে একটি মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন।

বলিবেন, আমার প্রবন্ধের শেষ অংশ তৈয়ারী আছে। সুবিধামত কাহারও হাতে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

আজ এইখানেই শেষ করি। আপনাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে বড়ই অধীর হইয়াছি। আমি যে কিরূপ নির্জ্জনবাসে আছি তাহা আপনারা মনে করিলেও শিহরিয়া উঠিবেন।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮ ওল্ড পোস্ট অফিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১
(Kailash Chandra Ghose Road
Barisha P. O. 24 Pgs.)
29. 8. 47

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার শেষ কার্ডখানি পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। ঐ reference-টা না পাওয়ায় মনটা বড় খুঁত খুঁত করিতেছিল। গুরুর কৃপায় আপনি আমায় উদ্ধার করিয়াছেন *

ইতিমধ্যে আমার একখানি প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্য বিচার' নামে বাহির হইয়াছে। আপনাকে একখণ্ড পাঠাইতে বলিয়াছি। আশা করি শীঘ্র পাইবেন বা পাইয়াছেন। ঐ বইখানির সকল প্রবন্ধ আপনি যদি সময় করিয়া পাঠ করেন তবে অতিশয় সুখী হইব। আশা করি আপনার মত পণ্ডিত ও রসিক ব্যক্তির সুখপাঠ্য হইবে।

এবারকার 'বর্ত্তমানে' আপনার 'ঝর্ণা' শব্দে ও ছন্দের নিক্কণে বড়ই শ্রুতি-সুখকর হইয়াছে। এবার আপনার ভাষা অতিশয় বিশদ এবং ছন্দ ও মিল অতিশয় happy হইয়াছে। আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

'বঙ্গদর্শনে' আমি কবিতা ছাপিব না। যে কয়জন প্রবীণ কবি আছেন তাঁহাদের কবিতাও যদি আমার কোন কারণে খুব ভালো লাগে তবেই ছাপিব, নতুবা নয়। আমি কবিতার অভাব অন্য উপায়ে পূরণ করিবার উপায় করিয়াছি তাহা বোধহয় বুঝিতে চাহেন। আপনি 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা নিশ্চয় পাইয়াছেন। কিন্তু ভাল প্রবন্ধের অভাব আছে, তাহাও কেবল পণ্ডিতের লেখা হইলে হইবে না, আমার প্রয়োজন মত পণ্ডিতেরা লিখিয়া দিবেন এই নিয়ম করিয়াছি। যিনি যে শাস্ত্রে পণ্ডিত তিনি সেই শাস্ত্র সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের বোধগম্য এবং সরস করিয়া লিখিয়া দিলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এক কথায় পাণ্ডিত্য বা নিছক academic interest, অথবা scholastic গবেষণা থাকিবে না। আপনি এত বিষয়ে পণ্ডিত, আপনি আমার 'বঙ্গদর্শনের' একটা বিশেষ বিভাগে আপনার চিন্তাশীলতা, রসগ্রাহিতা ও বহুপাঠিতার পরিচয় দিন্ না? আপনি একটা কাজ করিলে বড় ভাল হয়— কালিদাসের কাব্যগুলির রসনিবেদন, আধুনিক পদ্ধতিতে যদি করেন তবে একটা খুব বড় কাজ হয়। প্রথমেই 'কুমারসম্ভব' ধরুন। এ বিষয়ে সাক্ষাতে আলাপ করিব। তৎপূর্বে আপনার মত জানা চাই। মনে রাখিবেন, কালিদাসকে আধুনিক সাহিত্যবিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তাহার কাব্যের সর্বকালীনতা প্রমাণ করিতে হইবে। কেমন? কাজটি খুব বড় নয়?

বড় ব্যস্ত আছি—অসুস্থও তেমনই। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

* মোহিতলাল তাঁর সম্পাদিত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় ডাঃ সেনগুপ্তের সহায়তার কথা সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করেছিলেন।—স

(ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পত্র)

বভম

কাঁঠালবাড়ি, দ্বারভাঙ্গা
২২. ৬. ১৯৫১

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন পূর্বে 'শেষের গান' বইটি পাঠিয়েছিলেন। ছোট বই, তার ওপর আমি আপনার কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক, সুতরাং পড়া অনেক দিনই হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাপ্তিস্বীকার করাটুকুও হয়নি।

সেই অপরাধটুকু স্বীকার করে চিঠি দিচ্ছি। মধু খেয়েছি, কিন্তু মৌমাছির গুণ কখনও গেয়েছি বলে মনে পড়ে না, এও সেই অভ্যাসই।

আপনার কবিতাগুলি নূতন পুরাতনের মাঝখানটিতে রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাই এত মিষ্ট লাগে আমার। আপনি ছন্দে বিশ্বাসী, আপনার হাতে তার গতিও স্বচ্ছন্দ, form-এর দিক দিয়ে তাই আমাব বড় ভালো লাগে আপনার কবিতা। ভাবের দিক দিয়ে অনেক স্থানে মনে হয় আপনি গুলবাগিচায় ওমর খৈয়ামের পাশে বসে আলাপ জমিয়েছেন।

আপনি সিদ্ধ কবি, আর বাগ্‌বিস্তার করলাম না।

আশা করি কুশলে আছেন। দীর্ঘ আলস্যের অপরাধ বহন করে চিঠিটা যে পৌঁছাল এ আশ্বাসটুকু আমার দরকার; সুতরাং জানাবেন।

নমস্কারান্তে আপনাদের
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র)

Prabodhchandra Sen M.A.
Rabindra Professor of Bengali
Visva-Bharati

SANTINIKETAN P.o.
BENGAL
8. 6. 49

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পত্রখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আপনার পূর্ব প্রবন্ধের 'ত্রুটি' দেখিয়ে দেখছি খুব ভালো কাজই করেছিলাম। কেননা, তার বিনিময়ে পেলাম আপনার কাব্য-উপহার এবং তৎসঙ্গে আপনার সৌহার্দ্য। 'রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী', 'ছন্দের মূল্য' এবং 'শেষের গান', তিনটিই পড়ে ফেলেছি প্রাপ্তিমাত্র। পড়ে বুঝলাম আপনি সত্যই রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য। মজার কথা এই যে, আমিও এক প্রবন্ধে (বিচিত্রা ১৩৩৭) নিজেকে রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য বলেই পরিচয় দিয়েছিলাম। 'চার অধ্যায়' পড়ে আপনার হৃদয়ের একটা স্বচ্ছ পরিচয় পেলাম। 'ছন্দের মূল্য' খুব ভালো লেগেছে। 'ছন্দের মূল্য' এবং 'শেষের গান' আমার গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে সঞ্চিত রাখলাম। 'রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী' বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে গচ্ছিত রাখলাম, আপনার পূর্বপ্রবন্ধটিকেও তাই করেছি। রবীন্দ্রভবনে এই জাতীয় সব রচনাই সংগ্রহ করে রাখা হয় যাতে অনেকে পড়তে পারেন এবং প্রয়োজন মতো কাজেও লাগাতে পারেন। আপনার তাতে সম্মতি আছে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত আপনার ভালো লেগেছে এবং এ বিষয়ে আপনার ধারণাকে সহায়তা করতে পেরেছে জেনে সুখী হলাম। National Anthem কি হওয়া উচিত সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; জনগণমন সম্বন্ধে অপবাদ মোচনই আমার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আমি তৃপ্ত হব। উপহার পাঠাবার নির্দেশ আমিই দিয়েছিলাম। আপনার হস্তগত হয়েছে কিনা তাই জানতে চেয়েছিলাম। আপনার হাতে পৌঁচেছে জেনে সুখী হলাম। আমার 'ছন্দ পরিভাষা' (পূর্বাশা ১৩৫৫ মাঘ) আপনি পড়লে সুখী হবেন, কেননা আপনার রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনার স্মৃতির প্রশংসা না করে পারলাম না। তবে "প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে" নয়—চৌদ্দ বছর আগে (১৯৩৫) আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বিকাশবাবু সঙ্গে ছিলেন। রাঁচিতে আমার ভাই থাকেন, তাঁর

কাছে গিয়েছিলাম। আপনি এত কথা মনে রাখবেন ভাবতে পারি নি। তাই পূর্বপত্রে সে কথার উল্লেখ করিনি, যদিও আপনার কথা আমার বেশ মনে ছিল। আপনার দুইখানি কাব্যগ্রন্থও আমার কাছে ছিল। একটি 'সাঁঝের প্রদীপ' এবং আরেকটির নামটা ভুলে গিয়েছি। তবে একথা মনে আছে যে ওটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।* বই দুটি এখন আর নেই; স্থানপরিবর্তন ইত্যাদি হাঙ্গামায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে ওই বই দুটি থেকেই আপনার কবিসত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং তারপর থেকেই আপনার লেখা পেলেই পড়ি। অবশ্য আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের পূর্বেই আপনার লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে আপনার ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। এখনও কি ১৮১ নং ধর্মতলা স্ট্রীটেই আপনার চ্যাম্বার? এবার যখন নূতন করে পরিচয় হল, আশা করি এবার আর ছেদ পড়বে না। আপনি তো কখনও এখানে (শান্তিনিকেতনে) আসেননি, একবার বেড়িয়ে যান না। এলে খুব সুখী হব। ইতি

প্রীতিবদ্ধ

প্রবোধচন্দ্র সেন

অনুলেখ—আপনার দেশ তো বর্ধমানে। বর্ধমানে মাঝে মাঝে আসেন কি? বর্ধমান থেকে শান্তিনিকেতন তো খুব কাছেই। একবার এলে বিশেষ আনন্দিত হব।

---

* ডাঃ সেনগুপ্তের বিখ্যাত কাব্য মন্দিরের চাবি' ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে 'মন্দিরের চাবি'-র উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বর্তমানে ঐ কাব্যের বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ চলছে।—

ওঁ সবিতুর্বরেণ্যং

ডঃ কৃষ্ণকামিনী মুখোপাধ্যায়

রসায়ন বিভাগ প্রধানা—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইদানীং সৌরশক্তি বিশেষ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে তার মহিমার ব্যাখ্যা সোচ্চারে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জগতে। সূর্যের স্তুতিগান চলে এসেছে আদি কাল থেকে ধর্মের এক অভিন্ন অঙ্গ রূপে। কোনারকের সূর্য মন্দির তার সুন্দর অনুভূতি। প্রথম মানব সূর্যের অপরিসীম শক্তির কাছে নিজের মাথা নত করেছিল গায়ত্রী মন্ত্রে 'ওঁ ভূর্ভুবস্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যং···'

মানুষ দেখেছে দিনের পর দিন সূর্যের মহিমা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় প্রাণীমাত্রেরই দিনচর্যা এবং সূর্যাস্তে তা নিবৃত্তি পায়, আবার দিন আরম্ভ হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে। শারীরিক রীতি নিয়মও এই চক্রকে মানিয়ে চলে। মানুষ বুঝেছে, সবারই কারণ, শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য—'নূনং জনাঃ সূর্য্যেন প্রসূতা।' তাই প্রাচীন ভারতের মনীষীরা বলে গেছেন—

ভবদ্ ভূতস্য ভব্যস্য, জঙ্গমস্থাবরস্য চ।
অস্যৈকে সূর্য্যমেবৈকম্ প্রভবং প্রলয়ং বিদুঃ॥

অর্থাৎ যাহা আছে, যাহা ছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে হবে, যাহা চলমান অথবা যাহা স্থির—কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে সূর্যই হচ্ছে এই সকলের উৎপত্তি এবং ধ্বংসের কারণ।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পৃথিবীর জন্ম ধার্য হয়েছে প্রায় পাঁচশত কোটি বৎসর পূর্বে। আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিরাও সেই মতবাদে উপনীত হয়েছিলেন মনন চিন্তন দ্বারা। প্রথম জীব, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু একক কোষমাত্র—তার আবির্ভাব হয়েছিল অনেক পরে যখন পৃথিবীর পরিবেশ জীবনকে পোষণ করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। অনুরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল আস্তে আস্তে ক্রমানুক্রমিক ভাবে সূর্য-রশ্মির সাহায্যে। জীবন ধারণের অন্যতম উপাদান অক্সিজেনেরও প্রাদুর্ভাবের কারণও সেই জ্যোতিরই শক্তি।

বিজ্ঞানও সূর্যকে আদিশক্তিরূপে দেখেছে। গাছপালা সৌরশক্তি আহরণ

করে তৈরী করে আমাদের খাদ্য সামগ্রী এবং অক্সিজেন। বলতে গেলে সব প্রাণীই, হোক সে আমিষাহারী অথবা নিরামিষাশী, গাছপালার উপরই নির্ভর করে খাদ্যের জন্য। জীবনধারণের প্রধান উপকরণগুলি তৈরী হচ্ছে গাছের সবুজ পাতায়। গাছের সবুজ পাতাই হোলো প্রকৃতির রসায়নশালা। সেইখানেই তৈরী হচ্ছে ফুল ও ফলের নানা রূপ, নানা রঙ ও নানা গন্ধ। কী বিচিত্র সৃষ্টি! আশ্চর্য হতে হয় যে কি করে জল-বাতাস-মাটি থেকে উপাদান নিয়ে সূর্যের আলোর সাহায্যে সংশ্লেষণ হয়ে চলেছে নানাবিধ রাসায়নিক অণু-পরমাণু, যারা পরোক্ষ ভাবে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে—জীবনে এনে দিচ্ছে আনন্দ ও সৌন্দর্য, রসনা তৃপ্তি করছে ফলের আস্বাদে, শক্তি যোগাচ্ছে কাজকর্ম করার জীবিকা নির্বাহের।

ইন্ধনের সামগ্রী, যথা খনিজ কয়লা, গ্যাস, পেট্রোলিয়ম—সবই গাছের অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর রূপান্তর। এরা ধরে রেখেছে সূর্যের অপরিমিত শক্তি যা দিনের পর দিন পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবিরাম এসে পড়ছে। এই শক্তি দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি, কলকারখানা চালাচ্ছি এবং আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম এবং অভাব পূরণ করছি। কাজ করার শক্তিকে অশ্বশক্তির মাপকাঠিতে মাপা হয়। এই অশ্বশক্তির উৎস হচ্ছে সূর্যশক্তি, কারণ অশ্বের খাদ্য তৈরী হচ্ছে প্রকৃতির প্রয়োগশালায় সূর্যশক্তির সাহায্যে। তাই সূর্যদেবতাকে রূপায়িত করা হয় সপ্ত অশ্বযুক্ত রথের সারথীর রূপে, যার অপূর্ব তেজ ও অসীম ক্ষমতা।

বৈদিক যুগের ঋষিরাও একসময় সূর্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। পরে উপনিষদের ঋষিরা সেই সূর্যকেই বলেছেন 'হে সূর্য তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্য দেবতাকে দেখি।' ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

> হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫
> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
> সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
> যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

হে পূষণ তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি, আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

নূতন যুগের বাণী রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—"আবরণ খোলো হে মানব;

আপন উদার রূপ প্রকাশ করো।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন (পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী ১৯২৪)—

"সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই সে উৎসরূপে রয়েছে এই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল তো পরিকীর্ণ হয়েছিলো ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায়, ভাবনায়, বেদনায়, রাগে-অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। এই যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে যে চিন্তা ভাষা ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চিন্ময় রূপ নয়। যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঁকার ধ্বনির মত সংহত হয়ে আছে!

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে জয় হোক্। বলছে, অপাবৃণু,-ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা খোলাই ফুলফলে বিকাশ। অপাবৃণু এই প্রার্থনারই নির্ঝর ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিয়ে বাহুতুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু—তোমার-হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিস্বরূপ দেখে নিই। তোমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক্।'

রবীন্দ্রনাথের এই লেখার মধ্যে পাই উপনিষদের অপূর্ব ব্যাখ্যা, পাই গভীর চিন্তাধারা এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের সুন্দর সমন্বয়।

তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে অথবা মানুষ তার কলকারখানার সাহায্যে যা কিছু সৃষ্টি করে সব কাজেরই শক্তি আসছে সূর্য থেকে—আলোক এবং তাপরূপে। সূর্যের জ্যোতিশক্তিই রূপান্তরিত হচ্ছে এই পৃথিবীর সঞ্চিত এবং সক্রিয় যাবতীয় জীব ও জড় শক্তিতে। সূর্য হচ্ছে তাই শক্তির একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে—সূর্যের এই অফুরন্ত শক্তি আসছে কোথা থেকে? বিজ্ঞান বলছে এই শক্তির উৎস হচ্ছে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেটা অবিরাম চলেছে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তার গ্যাসীয় অভ্যন্তরে। সেখানে জড় ও শক্তির রূপান্তর ঘটছে—ক্রমাগত চারটি হাইড্রোজেনের পরমাণু মিলে একটা হিলিয়মের পরমাণুর সৃষ্টি করছে। চারটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভর একটা হিলিয়মের পরমাণুর ভর থেকে কিঞ্চিত পরিমাণে বেশী। অর্থাৎ হিলিয়ম তৈরী হবার সময় বৎ সামান্য জড পদার্থ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিনষ্ট ঠিক হচ্ছে না—হচ্ছে রূপান্তরিত—জড় বস্তু থেকে শক্তিতে। জড ও শক্তির এই রূপান্তরের সিদ্ধান্ত প্রথম প্রচার করেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন্ তার সুবিদিত আপেক্ষিকতা তত্ত্বে (theory of relativity)। এই সিদ্ধান্ত দিয়ে গণনা করে বলতে পারা যায় যে কত জড় পদার্থের বিধ্বংসে কত শক্তি উৎপন্ন হবে। অঙ্ক কসলে জানা যায় যে এক গ্রাম জড় পদার্থ দুই হাজার কোটি কিলো ক্যালরী পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ একটা মটরের আকারের কয়লার টুকরোকে যদি শক্তিতে পরিণত করা হয় তবে ঐ শক্তির সাহায্যে ইঞ্জিন চালিয়ে একটি বড় রকম জাহাজ কল্‌কাতা থেকে জাপান বন্দর পর্যন্ত অনায়াসে পাড়ি দিতে পারে। তাতেই বোঝা যায় যে হাইড্রোজেন—হিলিয়মের রূপান্তরের শক্তিই হচ্ছে সূর্যের উত্তাপ এবং আলোর অফুরন্ত উৎস। এই তাপ এবং এই আলোক প্রায় চোদ্দ কোটি অষ্টআশি লক্ষ কিলোমিটারের দূরত্ব পার হয়ে আসছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তিন কোটি কিলোমিটর প্রতি সেকেণ্ডের গতি বেগে। নানা বাধা বিঘ্ন পার হয়ে অতি সামান্য অংশই পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। কিন্তু এই সামান্য অংশই সারা পৃথিবীর জনমানবের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং ইন্ধন যোগাচ্ছে—আলোক সক্রিয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যা অবিরাম চলেছে পাতায় পাতায় প্রকৃতির রসায়নশালায়।

এতদিন আমরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করে চলেছিলাম বহুদিনের সঞ্চিত জড়শক্তি, খনিজ কয়লা, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়মের রূপে, আমাদের সুখ সুবিধার পরিবেশ তৈরী করার জন্য। বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে ফলিত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। অনুমান করা হয়েছে যে যে হারে ইন্ধনের ব্যবহার চলেছে, নানা কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, খনিজ ইন্ধনের ভাণ্ডার এক শত বৎসরের বেশী চলবে না। এই সঞ্চিত ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে তখন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার আশঙ্কা আছে। যান্ত্রিক সভ্যতাতো এই তালে এগিয়ে যেতে পারবেই

না, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। কারণ আমরা এই সভ্যতার তালে তাল রাখতে গিয়ে, পরিবেশকে দূষিত করে একদম পালটে ফেলছি—প্রকৃতির সাম্য অবস্থা থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে। সূর্যশক্তিকে কেন্দ্র করে যে প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে—যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই ছন্দে বাঁধা ছিল—যার সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মধ্যে এক সঙ্কলন ছিল-যেখানে গাছপালা জীবজন্তু সবই একই সূত্রে গাঁথা, একই স্রোতের ধারা বলে গণ্য ছিল—সেখানে মানুষের বে-হিসেবী কার্যকলাপে এক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। তাই দরকার হয়ে উঠেছে সূর্যশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার যাতে মানুষ আবার ফিরে আসতে পারে প্রকৃতির কোলে। এখন ভাবতে হচ্ছে যে সূর্যের এই অপরিসীম শক্তিকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গণ্ডীতে নিয়ে এসে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তাই এখন গভীর ভাবে গবেষণা চলেছে সূর্যশক্তিকে রূপান্তরিত করার জন্য। সিলিকন সোলার সেল (Silicon solar cell)-এর কথা অনেকে শুনে থাকতে পারেন। শূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি অবিরাম চলেছে, মানুষকে নিয়ে চাঁদে যাচ্ছে এবং সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তার যান্ত্রিক সভ্যতা। সেই সভ্যতাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র এই solar cells-এর সাহায্যে। এরা সূর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে শক্তি আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে শূন্যে। আরও অনেক গবেষণা চলছে সৌরশক্তিকে নানা ভাবে উপযোগী করে তোলার জন্য। শেষ পর্যন্ত সূর্যই এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবে আমাদের এবং ভবিষ্যতে মানবজাতির কল্যাণে সহায়ক হবে। মনে হচ্ছে আবার—ভেসে আসবে প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসের তরঙ্গে সেই অতীতের শাশ্বত বাণী—

'...ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং...।

শেষ চাওয়া

বেলা দেবী

তোমার কাছে এসেছিলাম—তু'হাত পেতে বলেছিলাম
দাও গো কিছু তুঃখ আমার বড়ো
বলেছিলাম—আমায় সুখী করো
আমি সুখ চাই সুখ চাই
তুমি হেসে বলেছিলে—তাই হবে ; তাই, তাই।

তোমার কাছে এসেছিলাম—আবার আমি বলেছিলাম
দাও গো কিছু দৈন্য আমার বড়ো
আমায় বিত্তশালী করো
আমি অর্থ বিত্ত চাই
তুমি হেসে বলেছিলে—তাই হবে ; তাই, তাই।

চাওয়া পাওয়ার শেষ কি আছে ?—তাই
আবার দাঁড়াই তোমার তুয়ার পাশে
কামনা শোণিতে আমার বাসনা নিঃশ্বাসে
বলেছিলাম—আরও আরাম চাই
তুমি হেসে বলেছিলে—তাই হবে ; তাই তাই।

তোমার কাছে এসেছিলাম—তু'হাত পেতে বলেছিলাম
খ্যাতির সৌরভ, গৌরব দাও আরও
ইচ্ছে করলে কি না তুমি পারো !
আমি আরও অনেক চাই
তুমি হেসে বলেছিলে—তাই হবে ; তাই, তাই।

যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, হায় তবু আজ বলি
শূন্য কেন, শূন্য কেন আমার এ অঞ্জলি।
সব আরাম যে বাসি হলো সব সুখ আজ বাসি
কিসের অভাব কিসের অভাব মন কেন উদাসী ?
অনেক চেয়েছিলাম শুধু তোমাকে চাইনি
অনেক কিছু পেলাম শুধু তোমাকে পাইনি।
এবার আমি এসেছিলাম—তোমায় চাইবো ভেবেছিলাম
পাই না খুঁজে, বন্ধ তোমার দ্বার
চোখের জলে বসে আছি নিয়ে আমার সকল অহঙ্কার
ভাবছি—কখন খুলবে দুয়ার
বলবো—আমি এবার তোমায় চাই
যার পরে আর চাওয়ার কিছু নাই।
ভাবছি কখন বলবে তুমি—তাই হবে , তাই তাই ॥

কবি কৃষ্ণ মিত্র স্মরণে

কৃষ্ণের আহ্বানে আজি কৃষ্ণ মিত্র নিত্য ধাম গত
কণ্ঠ চ্যুত শেফালিকা বিষাদিনী ম্লান মর্মাহত।
একটি উজ্জ্বল রশ্মি প্রত্যাহৃত সবিতৃ মণ্ডলে
রিক্ত রবিবাসরের সিক্ত বক্ষ বেদনাশ্রু জলে।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র

শান্তিনিকেতন 731-235

২৬।১২।১৯৮০, শুক্রবার

স্নেহভাজনেষু,

সন্তোষ, তোমার ১৮।১২ তারিখের চিঠি পেয়েছি ২৪।১২ তারিখে।—

আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান আমার একান্ত প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হলাম। তার এই মৃত্যুকে একান্ত আকস্মিক বলা যায় না। এভাবে হঠাৎ তার জীবনসমাপ্তি ঘটতে পারে তা সেও জানত। এখানে রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের ঠিক আগেই যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনই তার আশঙ্কার কথা আমাকে জানিয়ে গিয়েছিল। তখন তার মনের নিঃশঙ্ক শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে যেমন অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের কর্তব্য করে যাচ্ছিল তাতে আমার মন তার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন নির্ভীকতার সঙ্গে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েই সে জীবনকে স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে রেখেছিল। তার পরিচয় পেয়ে মনে হয়েছিল তার জীবন সার্থক হয়েছে—জীবনকে সার্থক করার জন্য দীর্ঘায়ু হওয়া আবশ্যক নয়, অল্প বয়সেও জীবনকে অমৃতময় করে তোলা যায়. এই শিক্ষার আদর্শ আমি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি তার মধ্যে। তার এই অকাল মৃত্যুতে গভীর বেদনা বোধ করেছি তাকে হারালাম বলে, কিন্তু তার জীবন নিষ্ফল হয়নি—এই সান্ত্বনার আশ্রয়ই সে রেখে গেছে আমাদের সকলের জন্য। তার মহৎ জীবন ও মহৎ মৃত্যুর স্মৃতি আমাদের সকলের মনে সঞ্চিত হয়ে থাকবে পরম মূল্যময় রত্নের মতো। এই শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতিই এখন আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা সঞ্চার করুক, এই কামনা করি।

তা সত্ত্বেও আমি আমার শিউলি মা-কে চিঠি লিখতে সাহস করি না। তাঁর মনের অবস্থা অনুমান করতে পারি। মনের এই অবস্থায় বাইরের সান্ত্বনা নিস্ফল। সে সান্ত্বনা পেতে হয় নিজের অন্তর থেকেই। শিউলি মা-র মনের অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। সে অচিরেই নিজের মনের শক্তিতেই জীবন ও মৃত্যুর সার্থকতা ও তার পরম মূল্য কোথায় তা উপলব্ধি করতে পারবে—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে যখন অন্তরের স্থিতি লাভ করবে তাকে আমার এই চিঠিখানি পড়তে দিও।

আজ কোনো কাজের কথা লিখতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। পরে লিখব। স্নেহ জেন।

—প্র সেন

নিত্য অশ্রু

ছিলে বন্ধু, ছিলে সাথী

আজ অনন্ত পথের দিশারী,

চিরদিন হাসিয়েছ,

আজ দিই নিত্য অশ্রু বারি।

—সন্তোষকুমার দে

স্মরণ সভা, ২০শে পৌষ, ১৩৮৭

কবি কৃষ্ণ মিত্র স্মরণে

শিবদাস চক্রবর্ত্তী

তোমাকে দেখেছি কবি, কবিতার আনন্দ-আসরে
নানা পত্র-পত্রিকায়, আমাদের এ রবিবাসরে।
তোমাকে দেখেছি, কবি, কাছে বসে মিত্রের মতন
কীর্তিতে প্রসন্ন চিত্ত উষ্ণ মমতার প্রস্রবণ।

সে-দেখা মনের বনে স্মৃতি হয়ে সুরভি বিলায়,
সে-মুখ কল্পনা পটে জেগে উঠে পলকে মিলায়,
ত্রুটি যদি থাকে কিছু, সে প্রসঙ্গ আলাপে কী কাজ?
মৃত্যুর আলোকে দেখি তোমাকে নতুন করে আজ।

এ লোকে অগ্রজ ছিলে, ও লোকেও জন্ম নিলে আগে,
অনুজের নমস্কার ও লোকেও যেন ভালো লাগে।

পরলোকে কবি কৃষ্ণ মিত্র

সন্তোষকুমার দে

রবিবাসরের একনিষ্ঠ সেবক এবং সুপরিচিত কোষাধ্যক্ষ কবি কৃষ্ণ মিত্র গত ২রা পৌষ ১৩৮৭ (১৭.১২.১৯৮০) বেলা দুটায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি পত্নী শিউলি মিত্র এবং তিন বিবাহিত কন্যা ও অগণিত আত্মীয় বন্ধু ও অনুরাগী রেখে গেছেন। ১৪ই পৌষ তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। সেখানে রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষের পক্ষ হতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে সম্পাদক মাল্যদান করেন এবং শ্রাদ্ধবাসরে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি পঠিত হয়। ২০শে পৌষ সদস্য সুনীল কুমার দত্তের গৃহে বালিগঞ্জে একটি স্মৃতিসভায় সম্পাদক কবির জীবনকথা বিবৃত করেন এবং প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষ নরেন্দ্র দেব, বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত আর আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের বাণী পাঠ করেন। স্বরচিত কবিতায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সর্বাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী। প্রয়াত কবির "লগ্ন" কাব্যখানি হতে একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—সুনীল কুমার দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, অক্রুব সুধীরকুমার মিত্র, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং কবির সহপাঠী বন্ধু পরিমল দাশগুপ্ত। স্মৃতিচারণ করেন সুনীলকুমার দত্ত, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়। সর্বাধ্যক্ষ বলেন—কবি কৃষ্ণ মিত্র দুটি পৃথক হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। দৈহিক হৃদয় তাঁর পীড়িত থাকলেও অপর হৃদয়বত্তার গুণে তিনি পরম প্রসন্নতা ও অন্তরের উদারতার অধিকারী হয়েছিলেন। এই স্মরণ সভায় অনেকগুলি শোক সঙ্গীত পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন শ্রীমতী জয়তী দত্ত।

১৯১৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে কৃষ্ণ মিত্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মাতা সরোজিনী দেবী উভয়েই স্বর্গত। তিনি দৌলতপুর কলেজে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের ছাত্র থাকা কালীনই তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় এম,এ পড়ার সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। এম, এ পাশ করবার পর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে তিনি গবেষণা করেন বঙ্গীয়বাসবের প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্রের সঙ্গে তিনি 'বিদ্যাপতি ও পদামৃত মাধুরী' সম্পাদন করেন। তবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব "সদ্ভাব শতকের" কবি তাঁর স্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অপ্রকাশিত কাব্য "রাবণ বধ" সুসম্পাদন করে প্রকাশ করা। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সমগ্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি আচার্যগণ কৃষ্ণ মিত্রকে এত স্নেহ করতেন যে তাঁর সারা জীবনের বাসস্থান ১।১বি জয়নারায়ণ চন্দ্র লেনের ত্রিতলেও তাঁরা পদধূলি দিয়েছেন।

কর্মজীবনে তিনি রেলওয়ের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের জন্য ১৯৬৬ সালে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি রেল থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের

মানুষের সঙ্গে তাঁর সমান হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য্য।

১৯৩৩ সালে দৌলতপুর কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে তাঁর সহপাঠী থাকা কালীন আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি। এই সুদীর্ঘ ৪৭ বৎসর জীবনের নানা উত্থান পতনের মধ্যেও তাঁর সঙ্গে সে নিবিড় বন্ধুত্ব অটুট ছিল। আমারই আহ্বানে তিনি রবিবাসরে যোগদান করেছিলেন এবং নিতান্ত অসুস্থ না হলে প্রতিটি অধিবেশনে যোগ দিয়ে তাঁর লেখা নতুন নতুন কবিতা পাঠ করতেন। কবি দিব্যেন্দু লাহার মৃত্যুর পর তিনি রবিবাসরের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং সে কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সুনিপুণভাবে করতেন। কাশীতে থিয়োজফিকাল সোসাইটিতে আমাদের সদস্য রামজীবন ভট্টাচার্য রবিবাসর আহ্বান করলে তিনি সদস্যদের রেলে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করেন। বর্দ্ধমানে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জন্মশতবার্ষিকীর বিশেষ সভা তিনিই আহ্বান করেন এবং অতি চমৎকার ভাবে সে সভাতেও সবাই যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে বর্দ্ধমানে যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁর একটি রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, এই সঙ্গে সেটি মুদ্রিত হল। রবিবাসরের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ রবিবাসর আহ্বান করলে তিনিই শান্তিনিকেনে পূর্বাহ্নে গিয়ে সকল ব্যবস্থা করে আসেন এবং ট্রেনে যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজে শান্তিনিকেতনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। তবু তাঁর পত্নী পরম যত্নশীলা শ্রীমতী শেফালী মিত্র হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সদস্যদের রেলে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে আসেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি রবিবাসরের প্রতিনিধি হিসাবে পদক এবং সম্মানার্ঘ্য গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ এই গ্রন্থের অন্যত্র দিয়েছি।

ব্যক্তি জীবনে কবি ছিলেন পরম অমায়িক, বন্ধু বৎসল ও সতত পরো-পকারী। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও অপরের উপকারের জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অপর পক্ষে পরমত সহিষ্ণুতা তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর জীবনের পরিধি ছিল সারা ভারতব্যাপী। পরিচিত বন্ধু বান্ধব ছিলেন সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর দৃষ্টি ছিল অনেক উদার ও সুদূর প্রসারী তাই তিনি কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন অবাঙালী এক উন্নতমনা যুবকের

সঙ্গে, তিনি আজ সেনা বিভাগে উচ্চপদে আসীন। তাঁর অপর দুই জামাতাই পদস্থ এনজিনিয়ার।

সব শেষে বলি তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা। আমি এমন পরিবার আর দেখিনি যেখানে গৃহিণী সচিব ও সখীই শুধু নন, স্বামীর সকল কাজের প্রেরণা, সকল কাজে ছায়ার মত অনুগামিনী। তাই আমরা অনেক অনুষ্ঠানে কবির সঙ্গে কবিপত্নীকেও দেখেছি। তিনি সদাই আদর্শ গৃহিণী, তাঁর বিষয়ে আচার্য প্রবোধ চন্দ্র যে কথা বলেছেন এই সংখ্যায় অন্যত্র তা মুদ্রিত হল। ঈশ্বর তাঁকে এই প্রচণ্ড আঘাত সইবার শক্তি দিন এই শুধু প্রার্থনা করি।

কবি ছিলেন ভগবদ্ বিশ্বাসী এবং একজন নীরব সাধক। পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই পরম শান্তি লাভ করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

কবির রচিত গ্রন্থাদি—কাব্য 'লগ্ন'। আরও একখানি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদিত গ্রন্থ—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "রাবণ বধ" এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে—"বিদ্যাপতি ও পদামৃত মাধুরী"। গবেষণাগ্রন্থ—Western Hindi Dialect in Lower Bengal. তিনি দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগেও কিছুদিন সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

দিল্লীর সর্বভারতীয় সমাবেশে রবিবাসর সম্বর্ধিত

এ বৎসর ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে নয়া দিল্লীর কোপার-নিকাস মার্গে ভারতীয় বিদ্যাভবনের নিকট বিখ্যাত সভাগৃহ 'কামানি হল'-এ ক্রিটিক সার্কেল অব ইণ্ডিয়ার এক সভায় সারা ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক প্রভৃতিকে যে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় তার মধ্যে সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে একমাত্র 'রবিবাসর'-কে অভিজ্ঞানপত্র, পদক ও একটি জাতীয় পক্ষী ময়ুরের রৌপমূর্তি উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস, এবং বর্তমানে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় বিচারপতি এস রঙ্গরাজন।

সমবেত সঙ্গীত দিয়ে সভাব উদ্বোধনের পর চারণ কবি পান্নালাল মাইতি মঙ্গলাচরণ কবেন এবং ক্রিটিক সার্কেল অব ইণ্ডিযাব পক্ষে সভাপতি শ্রীঅমিয় দত্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅমর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন।

সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান রবিবাসবকে সম্মাননা জানিয়ে প্রধান অতিথি বলেন, রবিবাসরকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আমবা নিজেবাই সম্মানিত বোধ করছি। রবিবাসরেব পক্ষ হতে কোষাধ্যক্ষ কবি কৃষ্ণ মিত্র অভিজ্ঞানপত্রাদি গ্রহণ করেন। অপর সদস্য শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দত্তও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত মিত্রকে বিশেষ সমাদর জ্ঞাপন করে তাঁদের সঙ্গে পৃথক ছবিও তোলেন। শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর ভাষণে রবিবাসবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করে তার বর্তমান কার্যাবলীও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, রবিবাসবের এই সর্বভারতীয় সম্মান লাভে সদস্যগণ আনন্দিত, ভারত সরকারেব সাহিত্য আকাদামিও বহুদিন আগেই রবিবাসরকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং রবিবাসরের বহু বিশিষ্ট সদস্য সাহিত্য আকাদামির সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন। রবিবাসরের ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর, জরাসন্ধ এবং ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য আকাদামির সদস্য ছিলেন, এখনও রবিবাসরের সদস্য স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক মনোজ বসু সাহিত্য আকাদামির সদস্য।

রবিবাসর

রেজিস্টার্ড নং এস্ ১১৯৭৩

(১৯৭৩।৭৪)

স্থাপিত—১৩৩৬ অধিনায়ক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সর্বাধ্যক্ষ—রায় জলধর সেন বাহাদুর

কার্যালয়—১৪৬ কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-২৮

মুখ্যত রবিবারেই অধিবেশন বসে বলে সভার নাম—'রবিবাসর'। তবে এই নামের অন্য সাংকেতিক সংজ্ঞাও করা যায—যাহার আক্ষরিক ব্যুৎপত্তি নিম্নরূপ :

র—রম্য রস্য রচনা রসায়না

বি—বিচার বিশ্লেষণা বিনোদনা

বা—বাগীশাবাহনা

স—সতীর্থ সভাজনা

র—রসনা রসাস্বাদনা

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী :

সদস্য সংখ্যা ৫২ জনে সীমাবদ্ধ। নতুন সদস্য হইতে হইলে কোন সদস্য প্রস্তাব ও কেহ সমর্থন করিবেন। বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ টাকা বৎসরের প্রথম মাসে অগ্রিম দেয়। সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে সভা ডাকিতে হইবে। আহ্বানকারী যে বৎসর সভা আহ্বান করিবেন সেই বৎসরের চাঁদা রেহাই পাইবেন। সদস্য তাঁহার সুবিধামত আহ্বানের তারিখ বৎসরের প্রথম তিনমাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাইবেন। আহ্বানের তারিখ পরিবর্তন করিতে হইলে সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন। পদত্যাগ করিতে হইলে লিখিতভাবে সম্পাদককে জানাইতে হইবে। এক বৎসরের অধিক চাঁদা বাকি পড়িলে বা পর পর ছয়টি অধিবেশনে খবর না দিয়া অনুপস্থিত থাকিলে সদস্য তালিকা হইতে নাম অপসারিত করা যাইতে পারিবে। বৎসরে অন্যূন দশটি অধিবেশনে যোগদান করা বাঞ্ছনীয়। রবিবাসরের স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য বা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত সদস্যকে সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিনচতুর্থাংশ ভোটে অপসারিত করা যাইবে।

সদস্যদের তালিকা ইত্যাদি সম্পাদক রক্ষা করিবেন।

সদস্যগণের মনোনীত সর্বাধ্যক্ষ কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি। সর্বাধ্যক্ষের নির্দেশমত সম্পাদক সকল কার্য নির্বাহ করিবেন। সর্বাধ্যক্ষ সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পাদক কোন প্রবীণ সদস্যকে সভার পরিচালনা ভার দিতে পারেন।

রবিবাসরের মনোনীত সম্পাদক সর্বাধ্যক্ষের নির্দেশমত রবিবাসরের সকল সাধারণ কাজ নির্বাহ করিবেন এবং রবিবাসরের পক্ষে সর্ববিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করিবেন, সকল চিঠিপত্র ও দলিলাদিও স্বাক্ষর দিবার অধিকার সম্পাদকের থাকিবে। সর্বাধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষমতাও সম্পাদকের থাকিবে।

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সকল হিসাবপত্র রাখিবেন এবং বৎসরান্তে হিসাব পরীক্ষা করাইবেন। কোন সদস্য হিসাব দেখিতে চাহিলে সম্পাদককে লিখিতভাবে জানাইবেন। ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সর্বাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোন দুইজন লেনদেন করিতে পারিবেন। অনধিক একশত টাকা অফিসে নগদ রাখা চলিবে।

সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের মনোনীত অনধিক সাতজন সদস্য নিয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে তাহাতে সর্বাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন। অন্যূন তিনজনে কোরাম হইবে।

বৈশাখ হইতে চৈত্র বর্ষ গণনা হইবে। বৎসরান্তে তিন মাসের মধ্যে সাধারণ সভা ডাকিতে হইবে বা বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময়েও ডাকা যাইবে। সাধারণ সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ—ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (সর্বাধ্যক্ষ), শ্রীসন্তোষকুমার দে (সম্পাদক), শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত) এবং ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী (কোষাধ্যক্ষ)।

রবিবাসর সদস্য তালিকা

১৩৮৮

স্বর্গত অধিনায়ক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয় কার্যালয়—১৪৬ কবি নবীন সেন রোড, কলি-২৮ (৫৭-৪৪৩৮)

ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম. এ., ডি-লিট, এম.বি.বি. এস্, ডি.টি.এম, এফ.সি.জি.পি.

সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর—৭০৩, লেক টাউন, কলি-৫৫ (৫৭-৪৩৪৪)

প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩৫ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলি-৩৬ (৫২-৮৬৫৫)

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
৫-এ, ইন্দ্রাণী পার্ক, টালিগঞ্জ, কলি-৩৩ (৪৬-৩৮২১/৩৫-৩৭৮৫)

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম. এ. ডি.ফিল্
১০৩ঈ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলি-১৯ (৪৬-৩২৪৯)

অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন এম. এ.
৯৯/১এ, টালিগঞ্জ রোড, কলি-৩৩ (৪৬-৩০৫৫)

সুরেন নিয়োগী সম্পাদক : সংহতি
২০৩।২বি, বিধান সরণী, কলি-৬ (৩৪-৫৪৭৮)

প্রভাতকুমার হালদার
৭-এ, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কলি-২৬ (৫১-১৬০৫)

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম. এ. বি-এল, ভূতপূর্ব এম.পি,
প্রাক্তন সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা,
২৪-এ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৬ (৬৫-৩৪৯৮)

সুধীরকুমার মিত্র বি. এ. বিদ্যাভূষণ বিদ্যাবিনোদ
মিত্রাণী, ৩ কালী লেন, কলি-২৫

লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেণ্ট : একাডেমি অব ফাইন আর্টস্
৭ হো চি মিন স্ট্রীট, কলি-৮২ (৪৫-৫৪৬৪)

সন্তোষকুমার দে সম্পাদক : রবিবাসর
১৪৬ কবি নবীন সেন রোড, কলি-২৮ (৫৭-৪৪৩৮)

নন্দকিশোর ঘোষ বার-অ্যাট্-ল
১২৭-এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলি-২৬ (৪৭-১৩৫৫)

ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. পি-এইচ-ডি, এল-এল-বি
২৩ কবির রোড, কলি-২৯

অশোককুমার সরকার বি. এস্-সি., এফ-সি-এ., 'পদ্মভূষণ'
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা
৩০ মদনমোহনতলা ষ্ট্রীট, কলি-৫ (৫৫-৫০১৬)

অনিলকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদক : 'সুখবর'
সুরেন্দ্র সমবায় আবাস, পূর্ব ব্লক, ফ্লাট ১১, ২৩৮ মাণিকতলা মেইন রোড
কলি-৫৪ (৩৫-৫৬৫৬)

মনোমোহন ঘোষ বি. এ. (চিত্রগুপ্ত)
বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক এ/১, ফ্লাট-২, ৬৪-এ বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭

কুমারেশ ঘোষ বি. কম., সম্পাদক—'যষ্টিমধু'
২৮।৩ আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪ (৩৫-২২৫৩)

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক এম. এ., সম্পাদক—'সাহিত্যতীর্থ'
৬৭, পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট, কলি-৬ (৫৫-২২১০)

অজিতকৃষ্ণ বসু এম. এ, (অকৃব)
২১, রসা রোড ঈস্ট ফাস্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলি-৩৩

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকঙ্কণ
৩৫, ব্যারিস্টার পি. মিত্র রোড, আলমবাজার, কলি-৩৫

অধ্যক্ষ সৌরীন্দ্রকুমার দে এম. এ, বি. এল
১৫৩-এ, শরৎ বসু রোড, কলি-২৬ (৪৮-৭০৯৩)

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী 'পদ্মশ্রী'
১৭ কানুনগো পার্ক, রাজা সুবোধমল্লিক রোড,
বৈষ্ণবঘাটা, পোঃ গড়িয়া, কলি-৮৪ (৭২-৪৬৬৪)

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. ('জরাসন্ধ')
ব্লক ও, পি—৬৩৯, নিউ আলিপুর, কলি-৫৩ (৪৫-৪৭৪৭)

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ., 'ভারতীরঞ্জন' প্রাক্তন সম্পাদক—'ভারতবর্ষ'
পোঃ কামারহাটি, গ্রাম—আগরপাড়া, ২৪ পরগণা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কমল কুটির ৩।১৪এ,বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, কলি-৩৪ (৭৭-৪১৯৭)

ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., ডি. লিট

১৭ তেলিপাড়া লেন, কলি-৪ (৫৫-৬৩৭৫)

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস (রিটায়ার্ড', ডি. লিট,

প্রাক্তন উপাচার্য—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

'পুষ্পরাগ', ১ বালিগঞ্জ টেরাস, কলি-১৯ (৪৬-১৪৯৭)

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি-এইচ-ডি

৩২, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, কলি-৩৪ (৭৭-২৫৪৭)

নাট্যকার ডঃ মন্মথ রায় এম. এ., ডি. লিট

২২৯-সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ (৩৫-৯৯৭৭)

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ.

১২৯।এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস্, কলি-১৯ (৪৬-০০০৫)

অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

২৫ রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলি-৬ (৩৫-৭৮৭৮)

শ্রীমতী বেলা দেবী

২৯ যোগীপাড়া লেন, কলি-৬ (৫৫-৮১০৩)

শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী এম. এ.

৫২-এ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, ফ্লাট ২৬, কলি-১৯ (৪৭-০২৭৭)

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এম. এ., পি. এইচ-ডি

"অন্নপূর্ণা" (ত্রিতলে), ৪৯।৭০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড

'রামধুন পার্ক' টালিগঞ্জ, কলি-৩৩

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. পি-এইচ-ডি

বিভাগীয় প্রধান—বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪।২, ভট্টাচার্য পাড়া লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৪ (৬৭-৪৩০১)

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

২-জি কার্তিক বসু লেন, কলি-৫ (৫৫-৭৩৮২)

নন্দদুলাল সাহা এম. এ.

১০ সাউথ এণ্ড পার্ক, কলি-২৯ (৪৬-১১৮০)

অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ., বি. এল
বিত্তাসাগর নিকেতন, এফ ১ বিধান নগর, কলি-৬৪ (৩৬-৫২৫৭)

ডঃ শিবদাস চক্রবর্ত্তী এম. এ., ডি.ফিল্. কোষাধ্যক্ষ—রবিবাসর
পি ১২৪।১।এ ব্লক, লেকটাউন, কলি-৫৫ (৫৭-৪১১৭)

রামজীবন ভট্টাচার্য এম. এ.
৩৭ বাঙ্গুর এভেনিউ, এ ব্লক, কলি-৫৫ (৫৭-২৫৯৮)

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত এম. এ., ডবলু-বি-সি-এস (রিটায়ার্ড)
নিরুপম বসন্ত, ৯ এম-আইজি হাউসিং এস্টেট, সোদপুর, ২৪ পরগণা
(৫৮-১৪৬৪)

ডঃ রমা চৌধুরী এম. এ., পি-এইচ-ডি, এম. এ. এস্
প্রাক্তন উপাচার্য—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্তালয়
৩ ফেডারেশান স্ট্রীট, কলি-৯ (৩৫-১৯৯৫)

হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এস-সি, এল্-এল্ বি
প্রাক্তন মন্ত্রী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পি—৫৫৭, ব্লক এন্, নিউ আলিপুব, কলি-৫৩ (৪৫-২৩৬৫)

জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এম. এ., বি, এল্ (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি)
পি ২১১, বি ব্লক, লেকটাউন কলি-৫৫ (৫৭-২৭৫১)

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এম. এ. পি-এইচ-ডি., 'পদ্মভূষণ'
প্রাক্তন উপাচার্য—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিত্তালয়
১২৫ রাসবিহারী এভেনিউ, কলি-২০ (৪৬-৪৫৫৮)

মনোজ বসু
পি/৫৬০, লেক রোড এক্সটেনশন স্কীম ৪৭, কলি-১৯ (৪৬-১৩৫৪)

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. এস. সি.
প্রাক্তন উপাচার্য—কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়
৩৩২, যোধপুর পার্ক, ফ্লাট নং ৯, কলি-৬৮ (৪৬-৩৯৭৪)

ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী এম. এ., পি এইচ ডি
চক্রতীর্থ ১৭।ডি।১এ রাণী ব্রাঞ্চ রোড পাইকপাড়া কলি-২ (৫২-২১৫৮)

সুনীলকুমার দত্ত এম. এ.
১৩১-এ রাসবিহারী এভিনিউ কলি-২৯ (৪৬-০৪১৬)

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য এম.এ., পিএইচ-ডি
উপাচার্য : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১।১ মহারাজা ঠাকুর রোড কলি-৩১ (৪৬-৭১৭৫)

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
ইংরাজীর অধ্যাপক—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
'কৃষ্ণ ভবন', ৭৫, লেক টাউন, বি ব্লক, কলি-৮৯ (৫৭-৩৯১৯)

ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় বি. এ., এম. বি., এম. এস্ (ওয়াশিংটন)
৮৪ রসা রোড সাউথ, ইস্ট সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৩৩ (৪৬-১২৪৮)

শ্রীমতী বিভা সরকার বি. এ.
৫৭।৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯ (৪৬-৩৪৭৬)

কবি সুধানন্দ স্মরণে

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সদস্য, কবি, প্রাবন্ধিক ও ভূপর্যটক, আবহাওয়া বিদূষণ প্রতিরক্ষা এবং জল প্রকল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এনজিনিয়ার সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ মাঘ (৩১।১।৮১) পরলোক গমন করেছেন। রবিবাসরের তিনি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন এবং দেশে বিদেশে বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালী সম্প্রদায়ে রবিবাসরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পৃথিবীর নানাদেশের সমাধিস্তম্ভের শিলালেখগুলির বাংলা পদ্যানুবাদ এবং খলিল জিব্রানের কাব্য বাংলায় অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্তি। পূর্ত বিদ্যাবিষয়ে তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলিও অমূল্য। তাঁর কাব্য ও গান সুমধুর।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

—রবিবাসরের সদস্যবৃন্দ

রবিবাসর—১৩৮৭ সালের কার্যবিবরণী

১। ১৪ই বৈশাখ (27. 4. 80) আহ্বায়ক—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বেহালা। প্রবন্ধ পাঠ—পল্লী সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ—সুনীলকুমার দত্ত, বুদ্ধপূর্ণিমা—ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। গান—ডঃ উৎপলা গোস্বামী।

২। ২৮শে বৈশাখ (11. 5. 80) রবীন্দ্রজন্মোৎসব। আ—চিত্রিতা দেবী, বালিগঞ্জ। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পাঠ—সম্পাদক। পুলিনবিহারী সেনকে রবিবাসরের কেশবচন্দ্র গুপ্ত সম্মানার্ঘ্যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য অম্লান দত্তের পত্র পাঠ। ভাষণ—ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশি, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সম্পাদক কর্তৃক মানপত্র পাঠ। সর্বাধ্যক্ষ মহোদয় গ্রন্থাদি উপহার দেন। পুলিনবাবুর প্রত্যভিভাষণ। গান—আরতি দত্ত, মধুশ্রী দত্ত।

৩। ১১ই জ্যৈষ্ঠ (25. 5. 80) আ—হবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নিউ আলিপুর। মহর্ষি রমন সঙ্গীতালেখ্য। গান—অরুন্ধতী রায় চৌধুরী, পাঠ—আহ্বায়ক মহর্ষি রমনের কবিতা—ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (8. 6. 80) আ—ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, পাইকপাড়া। প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্য—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটগল্প—(মুখোস) সম্পাদক। গাথা—পঞ্চানন চক্রবর্তী।

৫। ৮ আষাঢ় (22. 6. 80) রবিবাসর গ্রন্থ উৎসর্গ। আ—জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, লেকটাউন। সর্বাধ্যক্ষ মহোদয় পুষ্পস্তবক সহ রবিবাসর দ্বাদশ খণ্ড আনন্দ বাজার পত্রিকা সম্পাদক অশোককুমার সরকারের হাতে উৎসর্গ করেন। দিলীপকুমার রায়ের নামে কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্রিটিক সার্কেল অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রবিবাসরকে দিল্লীতে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব সম্পাদক সভায় ঘোষণা করেন। প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার এবং আকাশবাণীর নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ করা হয়। গান—জয়শ্রী চক্রবর্তী।

৬। ১৫ই আষাঢ় (26. 6. 80) বঙ্কিম জন্মোৎসব। আ—চপলাকান্ত ভট্টাচার্য—হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম—ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, গান—জলি মল্লিক।

৭। ৪ঠা শ্রাবণ (20. 7. 80) বনফুলের জন্মোৎসব। বনফুল ভবন, লেক টাউন। আ—কৃষ্ণ মিত্র। বনফুল অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী। বনফুলের

নিজকণ্ঠে আবৃত্তি পাঠের টেপ বাজানো হয়। প্রবন্ধ—রবিবাসরে বনফুল—সম্পাদক। বনফুলের উপন্যাসের কাঠামো—সুনীলকুমার দত্ত। কথাসাহিত্যে বনফুল—অক্রুব। পরিমল গোস্বামী ও বনফুল—হিমানিশ গোস্বামী। অনেক কবি স্বরচিত কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

৮। ১১ই শ্রাবণ (27. 7. 80) আ—মনোজ বসু, বালিগঞ্জ। বক্তা—ডঃ অমলেন্দু বসু (আধুনিক বাংলা উপন্যাস) আলোচনায় ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। বিনয় ঘোষ ও উত্তমকুমারের স্মৃতিতর্পণ।

৯। ২৫শে শ্রাবণ (10. 8. 80) আ—নন্দদুলাল সাহা, সাউথ এণ্ড পার্ক। প্রবন্ধ—সাহিত্যে উপমা—ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট গল্প—প্রভাতকুমার হালদার। চক্ষু ব্যাঙ্ক—মনোরঞ্জন মজুমদার। ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি-তর্পণ। গান—সবিতা দে।

১০। ৭ই ভাদ্র (24. 8. 80) আ—ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, বালিগঞ্জ। ছোট গল্প—(ওনারা) মনোজ বসু। প্রবন্ধ—ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ)।

১১। ২১শে ভাদ্র (7. 9. 80) আ—ডঃ মন্মথ রায়, গোরাচাঁদ রোড। ছোট গল্প (অজ্ঞাত)—আশাপূর্ণা দেবী। জরাসন্ধের পত্র পাঠ। গ্রন্থ প্রকাশ—'জীবন সোহাগ' (কাব্য)—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। শিবরাম চক্রবর্তীর স্মৃতি তর্পণ। গান—অনিন্দিতা সেনগুপ্ত।

১২। ৪ঠা আশ্বিন (21. 9, 80) আ—লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবন। দিল্লীতে রবিবাসরের সংবর্দ্ধনার বিবরণ—কৃষ্ণ মিত্র। ফিল্ম প্রদর্শন।

১৩। ১৮ই আশ্বিন (5. 10. 80) আ—সর্বাধ্যক্ষ মহোদয়, লেকটাউন। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন দেশিকোত্তম উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ। প্রবন্ধ—সবিতুর্বরেণ্যং—ডঃ কৃষ্ণকামিনী মুখোপাধ্যায়।

১৪। ১৬ই কার্তিক (2. 11. 80) বিজয়া উৎসব। আ—ডঃ রমা চৌধুরী, ফেডারেশান ষ্ট্রীট। প্রবন্ধ—ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজয়া) যাদুপ্রসঙ্গ—অক্রুব। যাদু প্রদর্শন—দীপক রায়। কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ।

১৫। ২রা অগ্রহায়ণ (23. 11. 80) আ—অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, সোদপুর।

প্রবন্ধ—জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক (সরোজিনী নাইডুর কবিতা) গান—সুচরিতা গুপ্ত, ঋদ্ধিণ মিত্র, সুদেষ্ণা রায়, হাসি মুখোপাধ্যায়।

১৬। ১৬ই অগ্রহায়ণ (7. 12. 80) আ—ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গোল পার্ক। ক্ষিতিমোহন সেন জন্মশতবার্ষিকী পালন। ছোট গল্প—কুমারেশ ঘোষ। প্রবন্ধ—ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (অসমিয়া সংস্কৃতি)। বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও সুদেষ্ণা সরস্বতীর স্মৃতি তর্পণ।

১৭। ২৩শে অগ্রহায়ণ (14. 12. 80) কুমুদরঞ্জন স্মরণসভা। আ—জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, লেকটাউন। 'ওগো মাঝি' গান রেকর্ডে শুনিয়ে উদ্বোধন, কুমুদরঞ্জনের দুষ্প্রাপ্য ছোট গল্প 'রোজা' এবং কবিতা 'হৃদয় বন্ধু' পাঠ।

স্মৃতিচারণ—শ্রীমতী অর্চনা পুরী। অপ্রকাশিত কাব্য 'প্রভাস' বিষয়ে—আহ্বায়কের প্রবন্ধ। শ্রদ্ধাঞ্জলি—ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু কবি স্বরচিত কবিতায় শ্রদ্ধানিবেদন করেন। 'সোমনাথ' সম্বন্ধে আলোচনা—অশোক কুমার সরকার। গান—জয়শ্রী চক্রবর্তী।

১৮। ২০শে পৌষ (4.1.81) কবি কৃষ্ণ মিত্রের স্মরণসভা। আ—সুনীল দত্ত, বালিগঞ্জ। কৃষ্ণ মিত্র, নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং ত্রিপুরাশঙ্কর সেন স্মৃতিতর্পণ। কৃষ্ণ মিত্রের 'লগ্ন' কাব্য হতে কবিতা আবৃত্তি করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সদস্যগণ।

১৯। ৪ঠা মাঘ (18.1.81) আ—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অপর্ণা দেবীর স্মৃতিতর্পণ, প্রবন্ধ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় মেঘদূত)। রম্য রচনা—নারায়ণ সান্যাল (ভারতীয় স্থাপত্যে শেরশাহ), গান—সুখেন্দু দাসগুপ্ত, দেবী মল্লিক, তরুণ বসু।

২০। ১৮ মাঘ (1. 2. 81) আ—অরুব, নিউ আলিপুর। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ। বাংলায় যাদু সাহিত্যের প্রকাশক ডি. মেহরাকে সম্বর্ধনা। অগ্নি যুগের যাদুকর রয় দি মিসটিকের জন্মোৎসব। প্রবন্ধ—সম্পাদক, মাধুরী সিংহ চৌধুরী ও অতীন রায়। যাদু প্রদর্শন--হিমাংশু চৌধুরী, কে, এন সেনগুপ্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক রায়, মৃণাল রায়, সু-ভন। গান—মালা সিংহ চৌধুরী।

২১। ২৫শে মাঘ (8.2 81) মাইকেল জয়ন্তী। আ—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, পাথুরিয়া ঘাটা। বক্তা—মনোজ বসু। মধুসূদন বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের কবিতা পাঠ। মধুসূদনের কবিতা পাঠ। প্রবন্ধ—ডাঃ শিবদাস চক্রবর্তী (মধুসূদন ও তাহার উত্তরাধিকার) গান—শিউলি সেনগুপ্ত।

২২। ৩রা ফাল্গুন (15.2.81) আ—অজিতকৃষ্ণ বসু, লেক টাউন। সদস্যগণ নিজেদের জানা বা দেখা অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা বলেন, তা টেপ করা হয়। বলেন—সর্বাধ্যক্ষ, সম্পাদক, অশোককুমার সরকার, রামজীবন ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, সুধীরকুমার মিত্র, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, অঞ্জলি বসু, বেলা দেবী, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ও অরুব। যাদু দেখান দীপক রায়। গান—স্বয়ং সর্বাধ্যক্ষ মহোদয়।

২৩। ১০ই ফাল্গুন (22.2 81) আ—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, টালিগঞ্জ। রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা। বক্তা—চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও সম্পাদক। রবিবাসরের প্রথম বর্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাদি প্রদর্শন। গান—সুনীতা মুখোপাধ্যায়, অস্তরা ভট্টাচার্য।

২৪। ১লা চৈত্র (15.3.81) আ—রামজীবন ভট্টাচার্য, বাঙ্গুর। প্রবন্ধ——ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী (মোহিতলাল)।

২৫। ১৫ই চৈত্র (29.3.81) আ—শিবদাস চক্রবর্তী, রামমোহন রায় রোড, নগেন্দ্র মঠ। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের স্মরণ-উৎসব। আলোচনা—ডঃ মন্মথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি।

২৬। ২২শে চৈত্র (5.4.81) আ—জ্যোতির্ময়ী দেবী, গড়িয়াহাট রোড। প্রবন্ধ—ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিষয়—ভাষা শিক্ষার বয়স ও সময়। মনোজ বসু, ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, চিত্রিতা দেবী, অধ্যাপক সোমেন বসু, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শৈবাল গুপ্ত ও সর্বাধ্যক্ষ মহোদয় প্রভৃতি আলোচনায় অংশ নেন।

২৭। ২৯শে চৈত্র (12.4.81) আ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া। কবি সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা। প্রধান বক্তা—'শংকর', প্রবন্ধ—আহ্বায়ক।

প্রায় প্রতি অধিবেশনেই সর্বাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর মূল্যবান ভাষণে সভা প্রাণবন্ত করেছেন এবং 'ষষ্টিমধু' সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ অনবদ্য রসরচনা এবং কবি সদস্যগণ স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন। অশোককুমার সরকার, সুধীরকুমার মিত্র ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। কবি প্রাবন্ধিক অমলকৃষ্ণ গুপ্ত সর্বাধিক সংখ্যক সভায় উপস্থিত থেকে মূল্যবান রচনা পাঠ করেছেন।

সর্বজনপ্রিয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ও রবিবাসরের প্রাক্তন সম্পাদক সমাজসেবক, রাষ্ট্রনেতা, 'ভারতীরঞ্জন' ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বন্ধুবর,—

মালাকর রূপে তুমি নানা পুষ্প ফুটালে নিষ্ঠায়
সবার সশ্রদ্ধ প্রীতি স্বতই আকৃষ্ট হল তায়
তিগ্ম তপস্যায় তব।
কে না করে সাদব সম্মান
তুমি যে সবার বন্ধু, ভুলিয়াছ মান-অভিমান
অবন্ধুরও বন্ধুরতা। তুমি সাহিত্যের পুরোহিত
সৃষ্টিনিষ্ট স্রষ্টাদের সৃষ্টিধর সাধিয়াছ হিত
স্বভাবসৌজন্য বশে। ধাতু তব পরস্মৈপদী
আপনার স্নেহসার, দুই কূলে বিতরিয়া নদী
সজীবতা শ্যামলতা সফলতা ধারা বরষিয়া
ফিরে চাহ নাই, শুধু চলিয়াছ প্লাবিয়া সিঞ্চিয়া
জনে জনপদে গ্রামে।
অজ্ঞানান্ধে দিয়া চক্ষুদান
দানরিক্ত চক্ষুদুটি হৃতশক্তি হৃতবিত্ত প্রাণ
নিঃস্ব বদান্যের মত।
ছিলে কর্ণধার সাহিত্যের,
'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষের'
দিব্য দৌবারিক রূপে, রক্ষা করিয়াছ ভারতীরে,
শাসিয়াছ দুঃশাসনে, রুষ্ট করি দুষ্ট বিদেশীরে
জাগায়েছ জনগণে।
কত শিক্ষা-সেবা প্রতিষ্ঠান,
'কলিকাতা সাহিত্যিকা' আদি করে তব স্তবগান,
'সাহিত্য সমিতি' তথা 'বঙ্গের সাহিত্য সম্মিলনী'
'রবিবাসরের' সভা সেবিয়াছ হইয়া অগ্রণী।

তবু তুমি স্ববিনয়ে দীন, রাত্রিদিন তন্দ্রাহীন
বাণীতীর্থ পথে পথে, পথিকের সাথী ক্লান্তিহীন।
স্বদেশ বাৎসল্যসিক্ত প্রাণ
ভারতবর্ষের দীপ অকম্পিত শিখা জ্যোতিষ্মান
বিলায়েছ আলোক অম্লান।

★ ★ ★

আজি তব তিরোধানে সে আলোক নির্বাপিত হলে
ভারতীর শুভ্র বাস কালো হল চোখের কাজলে॥

—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২৯শে চৈত্র (১৩৮৭) রবিবার ভোরে খবর পেলাম আগরপাড়ায় নিজ বাসভবনে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও পরম শ্রদ্ধেয় স্বদেশ সেবক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শেষ রাত্রে পরলোক গমন করেছেন। রবিবাসরের পক্ষ হতে তাঁর মরদেহে মালদান করা হল।

রবিবাসরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী। শুধু সদস্য হিসাবেই নয়, সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসুর বৎসরাধিককাল বোম্বাই প্রবাসের সময়ে ফণীন্দ্রনাথ সুনিপুণ ভাবেই রবিবাসরের সম্পাদকের দায়িত্বও বহন করেছিলেন।

তাঁর বাসস্থান আগরপাড়া, মহকুমা ব্যারাকপুর, এমনকি সমগ্র ২৪ পরগণা জেলার যেখানে যা কিছু রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান হত সব কিছুর সঙ্গেই তিনি জড়িত থাকতেন। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তিনি একবার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবনে তিনি বহু সভাসমিতি হতে সম্বর্ধিত হয়েছেন। রবিবাসর হতেও তাঁকে শুধু সম্বর্ধনাই জানানো হয়নি, রবিবাসর কেশবচন্দ্র স্মারক পুরস্কার দিয়েও তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। সরকার থেকেও তিনি সাম্মানিক বৃত্তি পেতেন।

এখন থেকে প্রায় ৪১ বৎসর পূর্বে ১৩৪৭ সালের ৩০ ভাদ্র ফণীন্দ্রনাথকে এক সাহিত্যিক সংবর্ধনা দেওয়ার কথাটা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে, উপলক্ষ ছিল নবদ্বীপের বিবুধ সভা থেকে তাঁকে 'ভারতীরঞ্জন' উপাধি দান। সেই সভায় আমি একটি কবিতা লিখে ছেপে বিতরণ করেছিলাম—সৌভাগ্যবশত তার একখানি আজও আমার সংগ্রহে আছে। আজ ফণীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি।

'ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ, 'বসুমতী'-ব্যাপ্তকীর্তি জন
ভারতীর বরপুত্র, তাই তুমি 'ভারতীরঞ্জন'।
এ নব কল্যাণ উক্তি, জননীর স্ফুট আশীর্বাদ
অক্লান্ত সেবার মূল্যে অফুরন্ত অমৃত-প্রসাদ।

সাহিত্যের মূল্য মিলে অর্থে নহে, সশ্রদ্ধ স্বীকারে,
তাই অতীতের কত নৈমিষ অরণ্যে বারে বারে
দিগ্‌দেশ হতে এসে বিবিধ বিবুধ ঋষিগণ
করেছে ঘোষণা কারো যত্নে কৃত অমৃত সৃজন।

সে মহিমা সাড়া দিল আমাদের মুগ্ধ হৃষ্ট চিতে
তোমার সম্মানে রচা 'বিবুধ সভা'র স্বীকৃতিতে।

তাঁর মৃত্যুর পরদিন (২৯শে চৈত্র ১৩৮৭) হাওড়ায় অনুষ্ঠিত রবিবাসরে ফণীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রবিবাসরের বর্তমান সংখ্যার সদস্য তালিকা এই দুর্ঘটনার আগেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর নামটি সদস্য তালিকায় রয়ে গেছে। এই গ্রন্থের 'নিবেদন'-টিও পূর্বেই ছাপা হয়েছিল বলে তাতেও আমরা ফণীন্দ্রনাথের তিরোধানের কথা উল্লেখ করতে পারি নি, এজন্য আমরা দুঃখিত। —সন্তোষকুমার দে

কলকাতা একটি প্রতিশ্রুতি

বিংশ শতাব্দীর শেষ যামে শেষ সলতেটুকু না জ্বেলে না হয় একটা প্রার্থনাই রাখলাম। এই কলকাতা শহরটার জন্য শুভ কামনার প্রার্থনা।

শহুরে সমস্যা নিয়ে অবিশ্বাসীরা তর্ক-বিতর্ক করুন বা কবিরা লিখুন। শহর কলকাতার উচ্চবিত্তদের জন্য থাকুক আরও উচ্চাশা, কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের জন্য যেন রুটিও থাকে।

বিদেশী পর্যটকদের কাছে এখনও কলকাতার একটা বিবাট মোহ আছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ধ্বংসের চিহ্ন, নোংরা, জঞ্জাল আর ভাঙ্গচুর রাস্তা ছাড়া শহরের আর কি আছে দেখার মত? এ ছবিও পর্যটকেরা ক্যামেরায় ধরে রাখেন। এটাই কি কলকাতাব আসল ছবি? এ দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দবকাব।

কি বিদেশী পর্যটক, নগর পবিকল্পনাবিদ, ঐতিহাসিক বা গবেষণাকারী, সকলের কাছে শহরের আকর্ষণ অনেক, কারণ কলকাতা শুধু শিক্ষাই দেয় না, বুঝিবা শিক্ষার ত্রুটিকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কলকাতার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। শোষণেব বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের গৌরবময় দৃষ্টান্ত। এখানে জীবনযুদ্ধ যেন ইতিহাস।

আজ কিছু নতুন কথা ভাবতে হবে। শুধু শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে নয়, প্রশস্তি গেয়ে নয়, সমাজের দুর্বল মানুষেব কাছে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ তুলে ধরতে হবে। পরিকল্পনা নিতে হবে নতুন নতুন উপনগরীর—যেখানে এরা সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারেন। সেই প্রচেষ্টাই আজ চলছে। এর অংশীদার সি. এম. ডি. এ, আমি, আপনি সবাই।

আরো জানতে হলে লিখুন জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ.), ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭।

আমরা কথা দিচ্ছি, জবাব পাবেন।

"জাতির সেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা"

এ রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ প্রচেষ্টায় এই সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি অংশতঃ এই সংস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিতরিত হচ্ছে।

প্রতিটি জেলায় অন্যূন একটি ক'রে শিল্প-নিকেতন গঠন করার কাজে এই সংস্থা ব্রতী হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাতটি শিল্প-নিকেতন সচল হয়েছে এবং আরও চারটির কাজ সমাপ্তির মুখে। আমরা আশা করছি অনতিবিলম্বে আরও অন্ততঃ আটটি শিল্প-নিকেতনের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করতে পারব।

ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিপণন সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা বিভিন্ন প্রচেষ্টা করছি। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির চেষ্টাও চলছে।

প্রত্যেকটি জেলায় আমরা এক বা একাধিক শিল্প-প্রকল্প রূপায়ণ করতে চলেছি। এই সব শিল্প-সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্যাদি মূলতঃ ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হবে।

আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত। সকলের প্রচেষ্টায় আমাদের প্রয়াস উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে অগ্রসর হবে এ আশা রাখি।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৪র্থ তল)

কলিকাতা-৭০০০১৩

Select the Best
Renowned throughout the country for flawless reproduction
for printing and process blocks
RP
The Radiant Process
calcutta

THE CULTURE
OF A NATION
IS WHAT
WELDS ITS
PEOPLE
TOGETHER
IOL
Indian Oxygen Limited

ঠাকুমা থেকে শুরু করে
ছোট্ট সোনামনিকে, ভালো রাখে সবাইকে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
অ্যাকোয়া টাইকোটিস
বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যাকোয়া
টাইকোটিস — ঘনীভূত যোয়ানের আরক।
বদহজমে দ্রুত কাজ করে। নিমেষে
আরাম দেয়।
৬০ বছরেরও
বেশি
ঘরে ঘরে
জনপ্রিয়
বেঙ্গল কেমিক্যাল
(ভারত সরকার পরিচালিত)
NAA-BC-84

'...তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি'
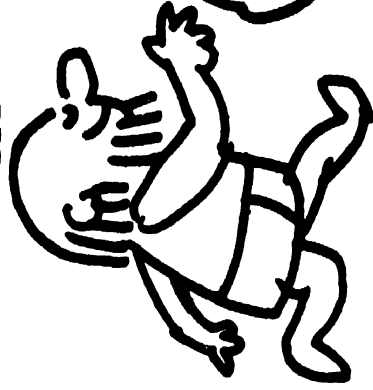
সেই কবে ইতিহাসের ঊষালোকে আদিম যুগের মানুষ আবিষ্কার করলো চক্রের রহস্য—সুরু হলো সভ্যতার জয়যাত্রা। হাজার-হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো। তারপর একদিন জন বয়েড্ ডানলপ আবিষ্কার করলেন হাওয়া-ভরা নিউম্যাটিক টায়ার—চক্রের জয়যাত্রা এবার দ্রুততর হলো। বিজ্ঞানের এই বিচিত্র আশীর্বাদকে ভারতবর্ষে প্রথম নিয়ে এল ডানলপ। তারপর থেকেই প্রগতি মিছিলের পুরোধায় রয়েছে ডানলপ ইণ্ডিয়া।

প্রগতির পথিকৃৎ
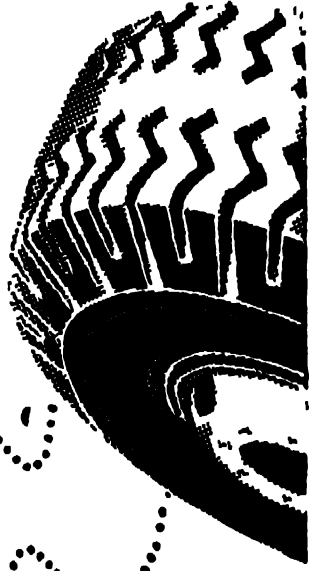
DPRC-79 BEN
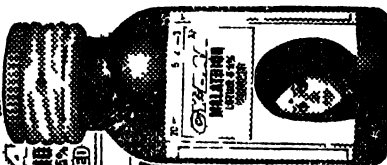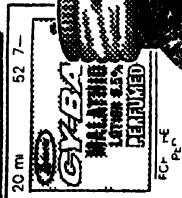
LICE?
NEW!
CY-BAN*
LOTION
Gets rid of lice overnight!
• Safe
• Effective
• Non-greasy
• Pleasantly perfumed
CY-BA
PERFUMED
Lederle
* Registered trade mark of American Cyanamid Company
Sista's-CY-90-J/78